Contents

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৯তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

মার্চ ২০১৬

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৬ সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

১৯তম বর্ষ	৬ষ্ঠ সংখ্যা
জুমাদাল উলা-জুমাঃ আখেরাহ	১৪৩৭ হিঃ
ফাল্গুন-চৈত্র	১৪২২ বাং
মার্চ	২০১৬ ইং

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

Contents

বাংলা একাডেমীর বইমেলা

প্রতি বছর ফেব্রুয়ারী মাসব্যাপী বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে সরকারীভাবে বইমেলা হয়ে থাকে। বইমেলায় এবার ৪০০-এর বেশী প্রকাশনা সংস্থা এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে। গতবারের বইমেলায় চার হাযারের বেশী বই প্রকাশিত হয়েছিল। ধরে নেওয়া যায় যে, এবারেও তার চেয়ে কম নয়। কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের কল্যাণে প্রতিটি বই অত্যন্ত আকর্ষণীয় কভারে ও উন্নতমানের কাগজে বের হয়। কিন্তু বইয়ের ভিতরে কি থাকে, তার হিসাব কে নিবে? প্রাবন্ধিক সৈয়দ আবুল মকসুদ এবারের বইমেলা প্রসঙ্গে তাঁর সরেযমীন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। যেমন অন্যান্যবারের ন্যায় এবারও বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিকদের নিয়ে একটি গোল টেবিল বৈঠক করেন। সেখানে তিনি আলোচনার শুরুতেই বই সমূহের 'মান' নিয়ে কথা বলেন এবং অবশেষে সেটাই আলোচনার মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে। লেখক যা লিখলেন, নির্বিচারে বিনা সম্পাদনায় সেটা ছাপা হয়ে বই আকারে বেরিয়ে গেল, তাতে ভাষা ও সাহিত্য উপকৃত হয় না। অথচ সাম্প্রতিক সময়ে সেটাই হচ্ছে। তাতে বইয়ের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু সাহিত্য সমৃদ্ধ হচ্ছে না।

মহিপরিচালক আরেকটি প্রসঙ্গ তোলেন, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর তা হ'ল দেশে ও প্রবাসে অনেক সচ্ছল সৌখিন লেখক আছেন, যারা প্রাকাশকদের হাতে পাণ্ডুলিপিসহ প্রকাশের খরচ বাবদ একটা মোটা অংক ধরিয়ে দেন। এমনকি কম্পিউটার টাইপ করা পেনড্রাইভ দিয়ে দেন। প্রকাশক বিনা যাচাইয়ে হুবহু সেটা ছাপিয়ে প্রকাশ করে দেন। তিনি জানেনও না, তিনি কি প্রকাশ করলেন। দেখা গেল বিষয়বস্তুর সাথে রচনার মিল নেই। বানান ভুল, অশুদ্ধ বাক্য ও মুদ্রণ প্রমাদে ভরা ঐসব বই এজেন্ট ও বিক্রেতাদের মাধ্যমে সারা দেশে চলে গেল। ঐসব বই কেউ না কিনলেও প্রকাশকের লস নেই। কেননা লেখক তাকে আগেই পুষিয়ে দিয়েছেন। এর দ্বারা লেখকের একটা মানসিক শান্তি এই যে, তিনি এখন লেখক ও সাহিত্যিকদের তালিকাভুক্ত হ'লেন। লোকেরা তার পরিচয় জানল। এভাবে বইয়ের সংখ্যা যত বাড়বে, তার নাম তত ছড়াবে। ব্যস, আর কি চাই! নবীন লেখকেরা অন্যের টাকায় বই প্রকাশ করবেন। এটা দোষের নয়। কিন্তু কথা হ'ল, বইটির সাহিত্যিক মান কেমন, তার সামাজিক গুরুত্ব কতটুকু সেটা যাচাই করা। তাই যেকোন বই প্রকাশের আগে পাণ্ডুলিপিটি যোগ্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে দিয়ে সম্পাদনা করে নিলে কিছুটা মান সম্পন্ন হয়। যারা 'মর্যাদা' কামনা করে, তারা তার লেখাটি বারবার যাচাই করেন, নিজে ও অন্যকে দিয়ে। এরপরেও প্রকাশ করতে ভয় পান। আর যারা 'নাম' চায়, তাদের তো এসবের বালাই নেই। এমনকি বাংলা ভিশনে নাকি একটা নাটক চলছে, যেখানে দেখানো হয়েছে যে, প্রেস মালিক জনৈক ডাক্তার একজন অর্থকষ্টে পতিত দরিদ্র কবির নিকটে তার কবি হওয়ার বাসনা প্রকাশ করলেন। কবি বললেন, আপনি তো কবিতা লিখতে পারেন না। তাহ'লে কিভাবে কবি হবেন? জবাবে তিনি বললেন, কেন আপনার কবিতার বইয়ের উপর আমার নাম বসিয়ে দিলেই আমি কবি হয়ে যাব। প্রয়োজনে আপনাকে কিছু...। এটি নাটকের কথা হ'লেও অনেকটা বাস্তব। কেননা আমরা দেখছি ইন্টারনেট থেকে অন্যের লেখা চুরি করে নিজের লেখা বলে চালিয়ে দিচ্ছেন অনেক লেখক। মূল লেখকের নামটুকু পর্যন্ত নেন না। ফলে প্রকৃত মেধা সম্পন্ন ও প্রতিভাবানরা এইসব আগাছা-পরগাছা কবি ও লেখকদের জঙ্গলে হারিয়ে যাচ্ছেন।

যেকোন লেখা মানসম্পন্ন হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। যেমন (১) ভাষা প্রাঞ্জল ও সাবলীল হওয়া। অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, সেটা সহজভাবে প্রকাশ করা। যাতে শ্রোতা শুনেই তা হৃদয়ঙ্গম করে নেয়। যেমন যদি বলা হয়, হে মাঝি! নৌকাটা দ্রুত ঘাটে আনো, তাহ'লে মাঝি সেটা বুঝবে। কিন্তু যদি বলি, হে কর্ণধার! তরী ত্বরা তীরে ভিড়াও। তাহ'লে সে বুঝবে না। নৌকাও ঘাটে ভিড়বে না।

(২) বক্তব্য সংক্ষিপ্ত ও পরিষ্কার অর্থবোধক হ'তে হবে। যেন পাঠক তা শুনেই বুঝতে পারে। নইলে অর্থহীন বক্তব্য কখনো সাহিত্য হবে না। যেমন এবারে একুশের বইমেলায় একটা কবিতার বই বেরিয়েছে, যেখানের কিছু পংক্তি নিম্নরূপ :

'আকাশের ঘাসের নদীতে/খেলা করে শিশুর স্তন/নর্দমায় সোনা ঝরে শস্যের মতো, /কালো বিছানায় সুগন্ধ গোবর/চামচিকা মহাকালের গর্তে অক্সিজেন নাড়াচাড়া করে' *(দৈনিক প্রথম আলো ১৬.০২.২০১৬)*। এ ধরনের কবিতার বই কে পড়বে? স্বয়ং লেখকও এর অর্থ জানেন না।

(৩) বানান ও ভাষা শুদ্ধ হ'তে হবে। নইলে শুরুতেই ভুল ধরা পড়লে পাঠক আর ভিতরে ঢুকতে চাইবে না। যেমন গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, আমার হাতে পড়েছে এমন অনেক বইয়ের টাইটেল বা শিরোনামাই অশুদ্ধ ও অর্থহীন। তিনি বলেন, দু'জন লেখককে তাদের বইয়ের শিরোনামের মানে জিজ্ঞেস করায় তারা চুপ করে থাকেন'। বলা বাহুল্য এগুলি আদৌ কোন সাহিত্য নয়।

(৪) লেখা অলংকারপূর্ণ হ'তে হবে। দেহে অলংকার পরলে যেমন তার শোভা বৃদ্ধি পায়, ভাষায় অলংকার থাকলে তেমনি তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। অলংকারহীন দেহের যেমন কোন আকর্ষণ থাকেনা, অলংকারহীন ভাষার তেমনি কোন আবেদন থাকে না। যেমন জনসভায় কোন ভাষণে যদি বলা হয়, হে নর ও মাদীরা! এর দ্বারা হয়ত উদ্দেশ্য হাছিল হবে, কিন্তু সেটা অলংকারশূন্য হওয়ায় কেউ কথাটি গ্রহণ করবে না। বরং সেখানে আপনাকে অলংকার দিয়ে বলতে হবে, সম্মানিত ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণ!

(৫) ভাষা মার্জিত ও সদুদ্দেশ্যপূর্ণ হ'তে হবে। যাতে পাঠকের সুকুমার বৃত্তিগুলি সচকিত হয়ে ওঠে। কেননা 'সাহিত্য' অর্থই হ'ল, 'চিন্তাধারা ও কল্পনার সুবিন্যস্ত ও সুপরিকল্পিত লিখিত রূপ'। মুখে অনেক কথাই বলা যায়। কিন্তু লিখিতভাবে যাচ্ছে তাই বলা যায় না। বললে সেটা খেস্তিখেউড় হয়, সাহিত্য হয় না। কিন্তু আজকাল সেটাই হচ্ছে। যেমন এবারের বইমেলায় প্রায় অর্ধশত বই উল্টে-পাল্টে দেখে একটি জাতীয় দৈনিকের সহকারী সম্পাদক লিখেছেন, হাতে গণা কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশের রচনার সঙ্গে পরীক্ষায় খাতায় লেখা গরুর রচনার তেমন পার্থক্য করা কঠিন। কিন্তু যারা কবি ও লেখক হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত তাদের কতজনের সৃষ্টি পাঠযোগ্য? এমন একজনের ৩৭টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত একটি বইয়ের প্রথম কবিতাটি হুবহু এমন 'গুরুশিক্ষা : কবিতার ম্যাসুফেক্সারিং ক্লাব : 'আমি তোমারে কাব্য শিখামু আর/ক- তে কলাবিদ্যা/খ- তে খুনসুটি/গ- তে...। অতঃপর বিয়ের বিয়া.... কবিতায়, মহিলা : ভাইরে যা দেখছেন টাইটফিট, তবে ভিতরে ঝুলে গেছে/.. সর্বশেষ কবিতাটি গল্পের মতো করে লেখা, 'বুক নয় তোমার ওড়নার ভেতর দিয়ে পৌঁছে যাব, ভেতরের ভেতর...। দেশের একজন প্রতিষ্ঠিত কবির কবিতার যদি এই হাল হয়, তাহ'লে... *(দৈনিক ইনকিলাব ১৮.০২.২০১৬)*। সম্পাদক এখানেই থেমে গেছেন।

[সম্পাদকীয় বাকী অংশ ৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

মাল ও মর্যাদার লোভ দ্বীনের জন্য নেকড়ে স্বরূপ

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ الأَنْصَارِىِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِى غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ-

হযরত কা‘ব বিন মালেক আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, দু’টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছাগপালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া অত বেশী ধ্বংসকর নয়, যত না বেশী মাল ও মর্যাদার লোভ মানুষের দ্বীনের জন্য ধ্বংসকর।[১] জাবের (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে غَابَ عَنْهَا رِعَاؤُهَا ‘যখন ছাগপালের রাখাল অনুপস্থিত থাকে।[২] রাবী হ’লেন, তাবূক যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকা সেই বিখ্যাত তিনজন ধনাঢ্য ও নেতৃস্থানীয় ছাহাবীর অন্যতম যারা যথার্থ কোন অজুহাত ছাড়াই জিহাদে গমন থেকে বিরত ছিলেন। পরে তারা ভুল স্বীকার করে তওবা করেন, যা পঞ্চাশ দিন পরে কবুল হয় এবং তাদের ক্ষমা করে আয়াত নাযিল হয় *(তওবা ৯/১১৮)*।

আলোচ্য হাদীছটি দুনিয়ার লোভে দ্বীন নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেওয়া অত্যন্ত মূল্যবান একটি দৃষ্টান্ত। রাতের বেলা রাখালবিহীন ছাগলের খোয়াড়ে ঢুকে দু’টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ যেভাবে ইচ্ছামত ছাগল মেরে চিরে নাস্ত নাবূদ করে। যার হামলা থেকে কোন ছাগলই রেহাই পায় না। অনুরূপভাবে অর্থ-সম্পদ এবং নাম-যশ ও পদের লোভ মুমিনের ঈমানকে নির্বাপিত করে দেয় ও দ্বীনকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

হাদীছে মাল ও মর্যাদার লোভের কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেকটিই দুই প্রকার : বৈধ ও অবৈধ।

১. সম্পদের লোভ :

এটা প্রথমতঃ দুই প্রকার। (ক) বৈধ পথে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ অর্জনের লোভ করা ও তার জন্য জীবনপাত করা। যেমন উপরোক্ত হাদীছটির প্রেক্ষাপট যা আছেম বিন ‘আদী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, আমি ও আমার ভাই খায়বরের গণীমত সমূহের ১০০টি অংশ খরীদ করি। কথাটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কানে গেলে তিনি অত্র মন্তব্য করেন যা আলোচ্য হাদীছে বলা হয়েছে *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/৪৫৯)*। অতএব বৈধভাবে হ’লেও অধিক মাল অর্জনের লোভ করা যাবে না। কেননা তাতে কেবল সময় ও শ্রমের অপচয় হবে এবং আল্লাহ্র দেওয়া আয়ুষ্কালকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা হ’তে বিরত থাকতে সে বাধ্য হবে। তাকে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, প্রত্যেক বান্দার জন্য আল্লাহ রিযিক বণ্টন করে দিয়েছেন। যা থেকে কমবেশী করা হবে না। অতএব পরিমিত ও প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার পর আরও বেশী পাওয়ার আকাংখাকে দমন করতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ- حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ- ‘অধিক পাওয়ার আকাংখা তোমাদের (পরকাল থেকে) গাফেল রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানে উপনীত হও’ *(তাকাছুর ১০২/১-২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো‘আ করতেন, اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا ‘হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদের পরিবারকে পরিমিত রিযিক দান কর’।[৩]

অতএব হে লোভী! যখন তুমি মালের পেছনে জীবন শেষ করলে, তখন আখেরাতের জন্য তুমি কখন সময় দিবে? অথচ আল্লাহ বলেন, يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِى أَمْلأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَلأْتُ صَدْرَكَ شُغْلاً وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ ‘হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য অবসর হও। তাহ’লে আমি তোমার অন্তর প্রাচুর্য দিয়ে ভরে দিব এবং তোমার অভাব দূর করে দিব। আর যদি তা না কর তাহ’লে তোমার দু’হাত ব্যস্ততা দিয়ে ভরে দিব এবং তোমার অভাব দূর করব না’।[৪] কবি বলেন,

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الْفَقْرَ مِنْ فَقْرِ الْغِنَى + وَلَكِنْ فَقْرُ الدِّيْنِ مِنْ أَعْظَمِ الْفَقْرِ

‘সচ্ছলতা হারানোকে দরিদ্রতা ভেবো না। বরং দ্বীন হারানোই হ’ল সবচেয়ে বড় দরিদ্রতা’।[৫] নিঃসন্দেহে মালের লোভ সকল শত্রুর চেয়ে বড় শত্রু। যা মানুষকে সর্বদা ব্যস্ত রাখে। অথচ তা তার নিজের কোন কাজে লাগে না। যা তাকে আখেরাতের কাজ থেকে বিরত রাখে। অথচ যেটা ছিল তার নিজের জন্য। কেননা অতিরিক্ত যে মাল জমা করার জন্য সে দিন-রাত দৌড়ঝাঁপ করছে, তা সবই সে ফেলে যাবে। কিছুই সাথে নিতে পারবে না, তার নিজস্ব নেক আমলটুকু ব্যতীত। অথচ সে আমল করার মত ফুরছত তার নেই।

কবি হুসাইন বিন আব্দুর রহমান বলেন,

الْمَالُ عِنْدَكَ مَخْزُونٌ لِوَارِثِهِ + مَا الْمَالُ مَالُكَ اِلاَّ يَوْمَ تُنْفِقُهُ

‘মাল তোমার কাছে জমা থাকে তার ওয়ারিছদের জন্য। আর ঐ মাল তোমার নয়, যতক্ষণ না তুমি তা (আল্লাহ্র পথে)

১. তিরমিযী হা/২৩৭৬; মিশকাত হা/৫১৮১।
২. বায়হাক্বী, শু‘আব হা/১০২৬৮।
৩. বুখারী হা/৬৪৬০; মুসলিম হা/১০৫৫; মিশকাত হা/৫১৬৪।
৪. ইবনু মাজাহ হা/৪১০৭; আহমাদ হা/৮৬৮১; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩১৬৬; মিশকাত হা/৫১৭২।
৫. ইবনু রজব হাম্বলী (৭৩৬-৭৯৫ হিঃ), মাজমূ‘ রাসায়েল ৬৫ পৃ.।

ব্যয় করবে'।[৬] অতএব লোভ হ'ল দু'প্রকারের। ক্ষতিকর লোভ (حرص فاجع)। যা তাকে আখেরাত থেকে ফিরিয়ে দুনিয়ার কাজে লিপ্ত রাখে। আর কল্যাণকর লোভ (حرص نافع), যা তাকে আল্লাহ্র আনুগত্যের কাজে আকৃষ্ট করে ও সেদিকেই ব্যস্ত রাখে।

(খ) দ্বিতীয় প্রকার মালের লোভ হ'ল, যা অবৈধ ও হারাম পথে উপার্জনে প্ররোচিত করে। এটাকে الشُّحّ বা কৃপণতা বলে। যা নিন্দিত। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 'যে ব্যক্তি হৃদয়ের কৃপণতা থেকে বাঁচল, সে সফলকাম হ'ল' (হাশর ৫৯/৯)। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا- 'তোমরা কৃপণতা হ'তে বেঁচে থাক। কেননা কৃপণতা তোমাদের পূর্বেকার লোকদের ধ্বংস করেছে। এ বস্তু তাদের বলেছে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে, তখন সে তা করেছে। তাদের বখীলী করার নির্দেশ দিয়েছে, তখন সে তা করেছে। তাদের পাপ করার নির্দেশ দিয়েছে, তখন সে তা করেছে'।[৭] জাবের (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ '...এ বস্তু তাদেরকে রক্ত প্রবাহিত করতে প্ররোচিত করে (তখন তারা সেটা করে) এবং তারা হারামকে হালাল করে'।[৮]

একদল বিদ্বান বলেন, الشُّحّ বা কৃপণতা হ'ল الحرص الشديد 'কঠিন লোভ'। যা তাকে বৈধ অধিকার ছাড়াই তা নিতে প্ররোচিত করে। যেমন অন্যের মাল অবৈধ ভাবে নেওয়া, অন্যের অধিকারে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা। অন্যের ইযযতের উপর হামলা করা ইত্যাদি। মূলতঃ এর অর্থ হ'ল شَرَهُ النَّفْسِ বা প্রচণ্ড লোভ, যা আল্লাহকৃত হারামের প্রতি তাকে প্রলুব্ধ করে। সে তখন তার হালাল মাল, হালাল স্ত্রী বা অন্যান্য বৈধ বস্তুতে তুষ্ট থাকতে পারে না। সে অন্যের অধিকার হরণে হামলে পড়ে। ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত বিশ্বের সর্বত্র আজকের শক্তিমানরা এ কাজ অহরহ করে চলেছে।

এক্ষণে الْبُخْلُ বা বখীলী হ'ল, নিজের হাতে যেটা আছে, সেটা না দেওয়া। পক্ষান্তরে الشُّحُّ বা কৃপণতা হ'ল, যুলুম ও শত্রুতার মাধ্যমে অন্যের মাল বা অন্য কিছু গ্রাস করা। এজন্য একে বলা হয়, সকল পাপের শীর্ষ (رأس المعاصى كلها)। এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) ও অন্যান্য সালাফগণ (ইবনু রাজাব ৭০ পৃ.)। এখান থেকেই হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যেখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, لاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيمَانُ فِى جَوْفِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ 'মুমিনের হৃদয়ে কৃপণতা ও ঈমান একত্রিত হ'তে পারে না'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, فِى قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا 'কোন বান্দার অন্তরে'।[৯] কখনো কখনো কৃপণতা ও বখীলী একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু উভয় শব্দের উৎপত্তিগত মৌলিক পার্থক্য সেটাই, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

অতএব যখন সম্পদের লোভ মানুষকে কৃপণতার স্তরে নামিয়ে দেয়, তখন তার দ্বীন ও ঈমান তলানিতে চলে যায়। সে ঈমানের কোন স্তরেই আর থাকে না। পশুর সঙ্গে তার কোন পার্থক্য থাকে না।

২. মর্যাদার লোভ :

এটি সম্পদের লোভের চাইতে ভয়ংকর। কেননা এটির জন্য মানুষ তার মাল-সম্পদ পানির মত ব্যয় করে। এর জন্য হেন কাজ নেই, যা সে করতে পারে না। এটি দু'ভাগে বিভক্ত।

(ক) নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও সম্পদ লাভের মাধ্যমে মর্যাদা অর্জন করা : এটি অত্যন্ত ক্ষতিকর বস্তু। যা মানুষকে আখেরাতের মর্যাদা ও কল্যাণ হ'তে বঞ্চিত করে। এর মাধ্যমে সে দুনিয়াতে সর্বোচ্চ ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করে। আল্লাহ বলেন, تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ- 'আখেরাতের এই গৃহ (অর্থাৎ জান্নাত) আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি ঐসব মুমিনের জন্য, যারা দুনিয়াতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেনা এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। আর শুভ পরিণাম হ'ল কেবল আল্লাহভীরুদের জন্য' (ক্বাছাছ ২৮/৮৩)।

বস্তুতঃ এমন লোক কমই আছে যারা নেতৃত্ব লাভের মাধ্যমে দুনিয়াবী মর্যাদা কামনা করে না। সেকারণেই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আব্দুর রহমান বিন সামুরাকে বলেন, لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا- 'তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিয়ো না। কেননা যদি তুমি সেটা চাওয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত হও, তাহ'লে তোমাকে তার দিকে সোপর্দ করা হবে। আর যদি না চেয়ে পাও, তাহ'লে তুমি সাহায্যপ্রাপ্ত হবে'।[১০] হযরত আবু হুরায়রা

৬. খতীব বাগদাদী, কিতাবুল বুখালা ২২২ পৃ.।
৭. আবুদাঊদ হা/১৬৯৮।
৮. মুসলিম হা/২৫৭৮; মিশকাত হা/১৮৬৫।
৯. আহমাদ হা/৯৬৯১; *নাসাঈ হা/৩১১১*; মিশকাত হা/৩৮২৮।
১০. বুখারী হা/৬৬২২; মুসলিম হা/১৬৫২; মিশকাত হা/৩৬৮০।

(রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ 'তোমরা সত্বর নেতৃত্বের লোভী হয়ে পড়বে। অথচ সেটি ক্বিয়ামতের দিন লজ্জার কারণ হবে। অতএব কতইনা সুন্দর দুগ্ধ দায়িনী ও কতই না মন্দ দুগ্ধ বিচ্ছিন্নকারিনী'।[১১]

এখানে পদমর্যাদাকে দুগ্ধদায়িনী এবং পদ হারানোকে দুগ্ধ বিচ্ছিন্নকারিনী মায়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে। দুই অবস্থাতেই মা যেমন আনন্দ পায়, তেমনি কষ্ট পায়। অনুরূপভাবে পদমর্যাদা লাভ যেমন দুনিয়াতে আনন্দের বিষয়, তেমনি আখেরাতে অনুতাপের বিষয়। কেননা পদমর্যাদার যথাযথ হক বুঝিয়ে দেওয়া সেদিন খুবই কষ্টকর হবে। যা নিঃসন্দেহে লজ্জাকর। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তির এমন কাজে প্রার্থী হওয়া সঙ্গত নয়, যার পরিণাম লজ্জা ও অনুতাপ ছাড়া কিছুই নয়।

হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)-এর সাথী দু'জন যখন রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে প্রশাসনিক পদ প্রার্থনা করল, তখন তিনি তাদের বললেন, إِنَّا لاَ نُوَلِّى هَذَا مَنْ سَأَلَهُ، وَلاَ مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ، وفى رواية : مَنْ أَرَادَهُ 'আমরা আমাদের কাজে এমন কাউকে নিযুক্ত করি না, যে পদ চেয়ে নেয়। যে তার লোভ করে বা তার আকাংখা করে'।[১২]

বস্তুতঃ নেতৃত্ব ও পদমর্যাদার লোভ মানুষকে তা প্রাপ্তির পূর্বে যেমন ফিৎনায় নিক্ষেপ করে, প্রাপ্তির পরে সে তার চাইতে বেশী ফিৎনায় নিপতিত হয়। কেননা পদপ্রার্থী হওয়ায় সে তা অর্জনের জন্য আগ্রাসী হয়ে ওঠে এবং জান-মাল-ইয্যত সবকিছু বিলিয়ে দেয়। আর পদ প্রাপ্তির পর সে একদিকে অহংকারী হয়। অন্যদিকে যথাযথ হক আদায়ে ব্যর্থ হওয়ার গ্লানিতে সে অন্তর্জ্বালায় জ্বলতে থাকে। সেই সাথে আখেরাতে জওয়াবদিহিতার ভয়ে ভীত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ বলেছেন, الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِى وَالْعَظَمَةُ إِزَارِى فَمَنْ نَازَعَنِى وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِى النَّارِ 'অহংকার আমার চাদর, বড়ত্ব আমার পাজামা। যে ব্যক্তি আমার উক্ত দুই বস্তু টানাটানি করবে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব'।[১৩] এ কারণে পূর্ববর্তী কাযীগণ নিজেদের 'ক্বাযীউল কুযাত' (قاضي القضاة) 'কাযীদের সেরা' বলতেন না। এযুগেও সঊদী বাদশাহগণ 'জালালাতুল মালিক' লকব ছেড়ে নিজেদের জন্য 'খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন' (দুই পবিত্র হারামের খাদেম) উপাধি গ্রহণ করেছেন।

বিগত যুগের জনৈক কাযী স্বপ্নে দেখেন যে, জনৈক ব্যক্তি তাকে বলছেন, তুমি বিচারপতি। আর আল্লাহ বিচারপতি। এতে ভয়ে তিনি জেগে ওঠেন ও পরদিনই ঐ পদ ত্যাগ করেন *(ইবনু রাজাব ৭৫ পৃ.)*।

আল্লাহ বলেন, لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 'যেসব লোকেরা তাদের মিথ্যাচারে খুশী হয় এবং তারা যা করেনি, এমন কাজে প্রশংসা পেতে চায়, তুমি ভেব না যে, তারা শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক আযাব' *(আলে ইমরান ৩/১৮৮)*। এ আয়াত নাযিল হয়েছিল ঐসব লোকদের উদ্দেশ্যে, যারা লোকদের নিকট থেকে নিজের জন্য প্রশংসা কামনা করে এবং প্রশংসা না করলে নাখোশ হয় ও তাকে শাস্তি দেয়। অথচ সকল প্রশংসার হকদার হ'লেন কেবলমাত্র আল্লাহ। তিনিই বান্দাকে যোগ্যতা ও গুণ-ক্ষমতা দান করে থাকেন।

সেকারণ একবার খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (৯৯-১০১ হি.) ফরমান জারি করেন, لا تحمدُوا عَلَى ذلك كُلِّه إلاَّ لله، فَإِنَّهُ لوْ وَكَلَنِي إِلَى نفسِي كنتُ كغيري 'তোমরা আমার কোন কাজের জন্য প্রশংসা করো না। কেননা সকল প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। তিনি যদি (নাখোশ হয়ে) আমাকে আমার প্রতি সমর্পণ করে দেন, তাহ'লে আমি অন্যের মত হয়ে যাব'।[১৪]

একজন বিধবা মহিলার ব্যাপারে তাঁর একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, উক্ত মহিলা তাঁর নিকটে তার ইয়াতীম কন্যাদের জন্য সরকারী ভাতার আবেদন করে। ফলে তিনি দু'জনের জন্য ভাতা নির্ধারণ করেন। তাতে মহিলা *আলহামদুলিল্লাহ* বলে। তখন তিনি তৃতীয় মেয়েটির জন্য ভাতা বরাদ্দ করেন। তাতে মহিলা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়। তখন তিনি বলেন, আমরা তোমার কন্যাদের জন্য ভাতা বরাদ্দ করলাম এজন্য যে, তুমি যথার্থ সত্তার প্রতি প্রশংসা জ্ঞাপন করেছ। এক্ষণে ঐ তিনজন কন্যাকে আদেশ দাও, তারা যেন ৪র্থ কন্যাটির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, আনুগত্য সম্পূর্ণরূপে কেবল আল্লাহ্‌র জন্য। আর তিনি আল্লাহ্‌র হুকুম বাস্তবায়নকারী মাত্র। অতএব সকল সম্মান ও প্রশংসা কেবল তাঁরই প্রাপ্য' *(ইবনু রাজাব ৭৬ পৃ.)*।

কিন্তু একাজ খুবই কঠিন। কেননা ন্যায় বিচার কায়েম করতে গেলে সমাজ তার উপরে ক্ষেপে যাবে। আর সেজন্যেই নবী-রাসূলগণ ও তাদের সাথীরা দুনিয়াতে এত নির্যাতিত

---

১১. বুখারী হা/৭১৪৮; মিশকাত হা/৩৬৮১।

১২. বুখারী হা/৭১৪৯, ২২৬১; মুসলিম হা/১৭৩৩; মিশকাত হা/৩৬৮৩।

১৩. আবুদাঊদ হা/৪০৯০; মিশকাত হা/৫১১০; মিশকাতে 'মুসলিম' লেখা হয়েছে। কিন্তু মুসলিমের রেওয়ায়াতে (হা/২৬২০) কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে।

১৪. আবু নু'আইম ইছফাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া ৫/২৯২।

হয়েছেন। আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দিতে গিয়ে তারা যেমন নির্যাতিত হয়েছেন, আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধসমূহ বাস্তবায়ন করতে গিয়েও তেমনি তারা নির্যাতিত হয়েছেন। এতে তারা ধৈর্য ধারণ করেছেন এবং খুশী থেকেছেন। কেননা প্রিয়ভাজনরা সর্বদা তার প্রিয় সত্তার সন্তুষ্টির উপর খুশী থাকে। বিপদাপদ দিয়ে তিনি তার প্রিয় বান্দাকে পরীক্ষা করেন। যেমন খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয যখন হক জারি করতে ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হন, তখন তার পুত্র আব্দুল মালেক বলেন, হে আব্বা! আমি বরং চাই আমার ও আপনার জন্য আল্লাহ্র পথে কড়াই গরম করি'।

এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, নিজেরা নির্যাতন ভোগ করি। কিন্তু মানুষ আল্লাহ্র বিধান মেনে সুখে থাক।

নবীগণ ও তাদের দ্বীনদার সাথীদের উপর নির্যাতন করে সর্বদা দুনিয়াদার ও অজ্ঞ মানুষেরা। যাদের সংখ্যা সর্বদাই অধিক। যারা তাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গলের খবর রাখে না। স্বার্থান্ধ নেতাদের চাকচিক্যপূর্ণ কথা শুনে ও নগদ দুনিয়া পাওয়ার লোভে তারা নবীগণকে মিথ্যা ধারণা করে ও তাদের হক দাওয়াতকে স্তব্ধ করার জন্য সকল শক্তি নিয়োগ করে। যাতে সাধারণ মানুষ ভীত হয় ও প্রতারিত হয়। একারণেই আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে সাবধান করে বলেন, وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ، وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ– 'তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। তাঁর বাণীর পরিবর্তনকারী কেউ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ'। 'অতএব যদি তুমি জনপদের অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চল, তাহ'লে ওরা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং তারা তো কেবল অনুমান ভিত্তিক কথা বলে' *(আন'আম ৬/১১৫-১১৬)*।

(খ) দ্বীনী কাজের মাধ্যমে মানুষের উপরে মর্যাদা ও বড়ত্ব কামনা করা : এটা দু'ভাবে হয়ে থাকে।

এক- দ্বীনের বিনিময়ে মাল উপার্জন করা। এটি সম্পদের লোভের চাইতে অনেক বেশী মন্দ ও অনেক বেশী ক্ষতিকর। কেননা ইলম, আমল ও যুহ্দের মাধ্যমে আখেরাত সন্ধান করা হয় ও আল্লাহ্র নৈকট্য তালাশ করা হয়। অথচ তা না করে যদি এর উদ্দেশ্য সম্পদ হাছিল করা হয়, তাহ'লে সেটি তার জন্য জাহান্নামের কারণ হবে। কেননা তার নিকটে আখেরাতের পাথেয় থাকা সত্ত্বেও সে সেটিকে দুনিয়া হাছিলের পিছনে ব্যয় করেছে। আর এটি হারাম পন্থায় মাল উপার্জনের মধ্যে পড়ে। এভাবে মালের লোভ ও দুনিয়াবী স্বার্থ মানুষের দ্বীনকে ধ্বংস করে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا أَوْ يُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا 'তোমরা গাঢ় অন্ধকার রাত্রির অংশ সদৃশ ফিৎনাসমূহে পতিত হওয়ার পূর্বেই দ্রুত সৎকর্মসমূহের দিকে ধাবিত হও। যখন ব্যক্তি সকালে ঘুম থেকে উঠবে মুমিন অবস্থায় ও সন্ধ্যা করবে কাফির অবস্থায়। আর সন্ধ্যা করবে মুমিন অবস্থায় ও সকালে উঠবে কাফির অবস্থায়। সে দুনিয়ার বিনিময়ে তার দ্বীনকে বিক্রি করবে'।[১৫] এখানে দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীন বিক্রয় করাকে কুফরী বলা হয়েছে। যা মারাত্মক কবীরা গোনাহ। অত্র হাদীছে 'কাফির' অর্থ আল্লাহকে অস্বীকারকারী 'কাফির' নয়। যা মুমিনকে ঈমানের গণ্ডী থেকে বের করে দেয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষা করল যার মাধ্যমে আল্লাহ্র চেহারা অন্বেষণ করা হয়, অথচ সে তা শিক্ষা করে দুনিয়াবী সম্পদ অর্জন করার জন্য, সে ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না'।[১৬]

এর অর্থ এটা নয় যে, দ্বীনী ইলম শিখলে সম্পদ অর্জন করা যাবে না। বরং এর অর্থ হ'ল দ্বীনকে অক্ষুণ্ণ রেখে বৈধ সম্পদ অর্জন করা। সম্পদ যেন লক্ষ্য না হয় যে, দ্বীন বিক্রি করে হলেও তা অর্জন করতে হবে। আর 'ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধি লাভ করা' অর্থ দুনিয়াতেই তার নিদর্শন প্রকাশ পাওয়া। আর তা হ'ল আল্লাহকে চেনা, তাকে ভালোবাসা ও তার সাক্ষাতের আকাংখী হওয়া। প্রতিটি কাজে তার ভয় ও আনুগত্য প্রকাশ পাওয়া। সর্বদা তাকে স্মরণ করা ও সর্বাবস্থায় তার উপর ভরসা করা। শ্রুতি ও প্রদর্শনী থেকে দূরে থাকা। নিরহংকার ও বিনয়ী হওয়া। আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসা ও আল্লাহ্র জন্য বিচ্ছেদ-এর নীতি অবলম্বন করা। যার ইলম তাকে এসব জান্নাতী গুণাবলী অর্জনে সক্ষম করে, সে বেঁচে থাকতেই দুনিয়ার জান্নাতে প্রবেশ করে। অতঃপর মৃত্যুর পর সে আখেরাতের জান্নাতের সুগন্ধি লাভে ধন্য হয়। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে যে আলেম দ্বীনের এই সুগন্ধি লাভ করেনি, আখেরাতেও সে জান্নাতের সুগন্ধি পাবে না। এজন্য রাসূল (ছাঃ) দো'আ করতেন, اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا 'হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঐ ইলম থেকে যা কোন ফায়েদা দেয় না। ঐ অন্তর থেকে যা তোমার ভয়ে ভীত হয় না। ঐ আত্মা থেকে যা তৃপ্ত হয় না এবং ঐ দো'আ থেকে যা কবুল হয় না'।[১৭]

---

১৫. মুসলিম হা/১১৮; মিশকাত হা/৫৩৮৩ 'ফিৎনাসমূহ' অধ্যায়।
১৬. আবুদাঊদ হা/৩৬৬৪; ইবনু মাজাহ হা/২৫২; মিশকাত হা/২২৭।
১৭. মুসলিম হা/২৭২২; মিশকাত হা/২৪৬০।

Contents

দুই- ইলম, আমল ও দুনিয়া ত্যাগের মাধ্যমে মানুষের উপর নেতৃত্ব করা ও শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করা। যাতে মানুষ তাকে বড় আলেম মনে করে এবং সবাই তার দিকে তাকায়। এগুলির পরিণাম জাহান্নাম ছাড়া কিছুই নয়। আখেরাতের হাতিয়ার দিয়ে যা অর্জন করা হয় এবং যা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও গর্হিত কর্ম, মাল ও ক্ষমতার মাধ্যমে আখেরাত ধ্বংস করার চাইতে। হযরত কা'ব বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ 'যে ব্যক্তি ইলম শিখে এজন্য যে, তার দ্বারা সে আলেমদের সঙ্গে মুকাবিলা করবে অথবা বোকাদের সঙ্গে ঝগড়া করবে অথবা লোকদের চেহারা তার দিকে ফিরিয়ে নিবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন'।[১৮]

এইসব আলেমরা তাদের অমূল্য ইলমকে দুনিয়ার ন্যায় নিকৃষ্ট গোবরের বিনিময়ে বিক্রি করে, যা আখেরাতে কোন কাজে লাগে না। আলেমদের চাইতে আরও নিকৃষ্ট হ'ল ঐসব লোকেরা, যারা নিজেদেরকে পরহেযগার ও দুনিয়াত্যাগী হিসাবে দেখায়। অথচ সে আসলেই একজন দুনিয়াদার। এটি হ'ল সবচেয়ে বড় প্রতারণা। যা দিয়ে সে মানুষকে ধোঁকা দেয়। এখানে আবু সুলায়মান দারেনীর (১৪০-২১৫ হিঃ)-এর মত অনেক সালাফ ঐ ব্যক্তিকে দোষারোপ করতেন, যে ব্যক্তি মাথায় 'আবা' পরিধান করে। অথচ তার অন্তরে রয়েছে দুনিয়াবী প্রবৃত্তি।

দূর অতীতে এইসব দুষ্টমতি আলেমদের একজনের ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন একদিন বাগদাদের রুছাফাহ (الرصافة) জামে মসজিদে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি.) ও ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন (১৫৮-২৩৩ হি.) ছালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় জামা'আত শেষে একজন উঠে দাঁড়ালেন এবং সবাইকে হাদীছ শুনাতে লাগলেন। এভাবে তিনি প্রায় ২০ পৃষ্ঠা পাঠ করেন। যার মধ্যে এক স্থানে তিনি বলেন, আহমাদ বিন হাম্বল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন আমাদের বলেছেন, তারা আব্দুর রাযযাকের নিকট থেকে, তিনি ক্বাতাদাহ্‌র নিকট থেকে ও তিনি আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يُخْلَقُ مِنْ كُلِّ كَلِمَةٍ مِنْهَا طَائِرٌ مِنْقَارُهُ مِنْ ذَهَبٍ وَرِيشُهُ مَرْجَانٌ 'যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, আল্লাহ তার প্রতিটি শব্দ থেকে একটি করে পাখি সৃষ্টি করবেন। যাদের ঠোঁট হবে স্বর্ণের এবং পালক হবে 'মারজান' (প্রবাল) পাথরের'।[১৯]

এ হাদীছ শুনে আহমাদ ও ইয়াহইয়া একে অপরকে জিজ্ঞেস করেন এবং তারা প্রত্যেকে বলেন, আমরা ইতিপূর্বে কখনো এটি শুনিনি। তখন ইমাম ইয়াহইয়া তাকে ইঙ্গিতে ডাকলেন। লোকটি পুরস্কার পাবে মনে করে দ্রুত তাঁর কাছে এল। অতঃপর ইয়াহইয়া তাকে বললেন, কে আপনাকে এ হাদীছ শুনিয়েছেন? লোকটি বলল, ইমাম আহমাদ ও ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন। জবাবে তিনি বললেন, আমি ইয়াহইয়া এবং ইনি আহমাদ। আমি কখনো এমন কথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোন হাদীছের মধ্যে শুনেনি। যদি এরূপ থেকে থাকে, তবে অবশ্যই সেটা অন্য কারু কাছ থেকে হবে। তখন ঐ বক্তা আলেম বলল, আমি সর্বদা শুনে আসছি যে, ইয়াহইয়া বিন মাঈন একজন আহমক। আমি কখনো সেটা যাচাই করিনি এই মুহূর্তে ছাড়া। ইয়াহইয়া বললেন, কিভাবে? সে বলল, দুনিয়াতে আপনারা দু'জন ব্যতীত আর কি কোন ইয়াহইয়া ও আহমাদ বিন হাম্বল নেই? আমি ১৭ জন ইয়াহইয়া ও আহমাদ থেকে হাদীছ লিখেছি'।[২০]

এভাবে অধিকাংশ বক্তা আল্লাহকে ভয় করে না। তাদের বক্তৃতার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে শ্রোতাদের মন জয় করা ও তাদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করা। আল্লাহ ও রাসূল ও ছাহাবীগণের নামে তারা বিনা দ্বিধায় যা ইচ্ছা বলে যায়। যেমন বাগদাদের এক তাফসীর মাহফিলে জনৈক বক্তা সূরা বনু ইস্রাঈলের ৭৯ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নিজ আরশে বসাবেন। তা শুনে মানুষ খুশীতে কেঁদে বুক ভাসায়। কথাটি ইমাম ইবনু জারীর ত্বাবারীর (২২৪-৩১০ হি.) কানে গেলে তিনি ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হন এবং স্বীয় বাসগৃহের দরজায় লিখে দেন, سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ لَهُ أَنِيْسٌ + وَلاَ لَهُ عَلَى عَرْشِهِ جَلِيْسٌ 'মহা পবিত্র সেই সত্তা যার কোন একান্ত সাথী নেই এবং তাঁর আরশে তাঁর সাথে বসবার কেউ নেই'। এটা পড়ে বাগদাদের আম জনতা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তার দরজায় পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। অবশেষে দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং কপাট ছাড়িয়ে পাথরের ঢিবি উপরে উঠে যায়।[২১]

এমনি করে দুনিয়াত্যাগী নামে পরিচিত পীর-মাশায়েখ ও অলি-আউলিয়াদের মাধ্যমে মানুষ প্রতারিত হয়। তাদের দ্বীনদারী দেখে মানুষ তাদেরকেই বড় মনে করে ও তাদের দরবারে গিয়ে ভিড় করে। এরূপ একজন ব্যক্তি ছিলেন বাগদাদের গোলাম খলীল (মৃ. ২৭৫ হি.) নামের একজন ব্যক্তি। যিনি ছিলেন দুনিয়াত্যাগী নীরব সাধক। যিনি সর্বদা ছালাত ও ইবাদতে রত থাকতেন। মানুষ তার প্রতি ছিল অত্যন্ত আসক্ত। শয়তান এই সুযোগটাই কাজে লাগিয়েছিল

---

১৮. তিরমিযী হা/২৬৫৪, সনদ হাসান; মিশকাত হা/২২৫।
১৯. ইবনুল জাওযী, কিতাবুল মাওযূ'আত ১/৪৬ পৃঃ।
২০. যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ১/৪৭; আবু যাহু, আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন ৩৪২ পৃঃ।
২১. মুছত্বফা আস-সুবাঈ (১৯১৫-১৯৬৪ খ্রি.), আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ৮৬-৮৭ পৃঃ।

এবং তাকে দিয়ে হাদীছ জাল করানোর কাজ নিয়েছিল। তিনি বলতেন, আমি এগুলো করি মানুষের হৃদয় গলানোর জন্য। হাদীছ জালকারী এই দরবেশ যেদিন মারা গেলেন, সেদিন তার শোকে বাগদাদের সকল দোকান-পাট বন্ধ হয়ে যায় *(আস-সুন্নাহ ৮৭ পৃঃ)*।

এইভাবে আরেক দল আলেম রাজা-বাদশা ও ধনিক শ্রেণীকে খুশী করার জন্য তাদের ইলম ব্যয় করে ও মিথ্যা হাদীছ বর্ণনা করে। যেমন গিয়াছ বিন ইবরাহীম নামে বাগদাদের এক বিখ্যাত আলেম একদা খলীফা মাহদী (১৫৮-১৬৯ হি.)-এর কাছে যান। যখন তিনি কবুতর নিয়ে খেলছিলেন। এটা দেখে ঐ আলেম হাদীছ বর্ণনা করলেন لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِى نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ 'তীর অথবা উট বা ঘোড়া ব্যতীত অন্য কিছুর মধ্যে প্রতিযোগিতা নেই।[22] কিন্তু এই সাথে তিনি বাড়িয়ে বললেন, أَوْ جَنَاحٍ 'অথবা কবুতরবাযী' *(যঈফাহ হা/২২১)*। যাতে খলীফা সেটা শুনে খুশী হন। খলীফা তাকে ১০ হাযার দিরহাম উপঢৌকন দিলেন। অতঃপর তিনি চলে গেলে খলীফা বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই তুমি রাসূল (ছাঃ)-এর উপর একজন মিথ্যারোপকারী (كَذَّابٌ) মাত্র। অতঃপর তিনি তার কবুতরটি যবহ করার নির্দেশ দিলেন *(আস-সুন্নাহ ৮৮ পৃঃ)*। এযুগে যেসব নেতারা শান্তির নামে পায়রা উড়িয়ে দেন, তারা বিষয়টি খেয়াল করুন।

এমনিভাবে প্রবৃত্তি পূজারী ও স্বেচ্ছাচারী আলেমরা যুগে যুগে ইসলামের ক্ষতিসাধন করেছে এবং নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মুমিনদের দ্বীন ও ঈমান নিয়ে খেলা করেছে। যদি ঐদিন খলীফা মাহদী ঐ ব্যক্তিকে কোন উপঢৌকন না দিতেন এবং নিরীহ কবুতরটিকে যবহ না করে ঐ মিথ্যুকটিকে শাস্তি দিতেন, তাহ'লে হাদীছ জাল করার দুঃসাহস কেউ দেখাত না। যেমন পরবর্তী খলীফা তার পুত্র হারূনুর রশীদ (১৭০-১৯১ হি.)-এর সময় তাঁরই জনৈক বিচারপতি কাযী আবুল বাখতারী এসে তাঁকে হাদীছ শুনিয়ে বলেন যে, كَانَ يُطَيِّرُ الْحَمَامَ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিত কবুতর উড়াতেন'। বিদ্বান খলীফা বিষয়টি বুঝে ফেলেন এবং তাকে ধমক দিয়ে বলেন, 'বেরিয়ে যাও এখান থেকে! যদি তুমি কুরায়েশ বংশীয় না হ'তে, তাহ'লে তোমাকে পদচ্যুত করতাম' *(আস-সুন্নাহ ৮৯ পৃঃ)*।

তবে হারূনের পরে তার ছেলে মামূন (১৯৮-২১৮ হি.) মু'তাযেলী হয়ে যান। ফলে তার ও তার পরবর্তী খলীফাদের সময় হকপন্থী আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের উপর চরম নির্যাতন নেমে আসে। বস্তুতঃ কপট আলেম ও দরবেশরাই বিগত যুগে ইসলামের ক্ষতি করেছে সবচেয়ে বেশী। এইসব লোকেরা আমীর-ওমারা ও ধনিক শ্রেণীর বাড়ীতে বাড়ীতে এবং মসজিদ ও বাজার-ঘাটে জনগণের মধ্যে সর্বদা বিচরণ করত এবং মিথ্যা হাদীছ বলে ও কুরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করত। যদি সে সময় আহলেহাদীছ বিদ্বানগণ জান বাজি রেখে ময়দানে এগিয়ে না আসতেন, তাহ'লে ছহীহ হাদীছের অস্তিত্ব দুনিয়াতে থাকত না। ফলে ইসলামের রূহ শেষ হয়ে যেত। কেবল নামটুকু বাকী থাকত। একারণে ইমাম আবু দাঊদ (২০২-২৭৫ হি.) বলেছেন, لَوْلاَ هَذِه الْعِصَابَةُ لَانْدَرَسَ الْإِسْلاَمُ 'যদি এই দলটি না থাকত, তাহ'লে ইসলাম মিটে যেত।[23] এই দল বলতে খাঁটি আহলেহাদীছ বিদ্বানদের বুঝানো হয়েছে। নামধারী ও কপট কোন ব্যক্তিকে নয়।

এভাবে দুষ্টু আলেমদের সংখ্যা সর্ব যুগে বেশী ছিল, আজও আছে। যদিও প্রত্যেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবেন ও খাঁটি আলেম বলে দাবী করেন। সেকারণ তারা সর্বদা ফৎওয়া দিতে ভালবাসেন। বড় বড় ইসলামী জালসায় প্রশ্ন সমূহ আহ্বান করেন ও সেসবের উত্তর দিতে উৎসাহ বোধ করেন। যাতে বড় আলেম হিসাবে সর্বত্র তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। লোকেরা তাকে দামী দামী উপঢৌকন দেয়। অথচ ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফী বিদ্বানগণ ফৎওয়া প্রদান থেকে দূরে থাকতেন।

আব্দুর রহমান ইবনু আবী লায়লা (মৃ. ৮৩ হি.) বলেন, আমি ১২০ জন আনছার ছাহাবীকে দেখেছি যাদেরকে কোন বিষয় জিজ্ঞেস করা হলে তারা প্রত্যেকে চাইতেন যে তার অমুক ভাই এর জন্য যথেষ্ট হৌক। এইভাবে প্রত্যেকে ফিরিয়ে দিতেন। অবশেষে প্রথম ব্যক্তির কাছে প্রশ্নটি ফিরে আসত'।[24] ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলতেন, إِنَّ الَّذِى يُفْتِى النَّاسَ فِى كُلِّ مَا يُسْتَفْتَى فِيهِ لَمَجْنُونٌ– 'যে ব্যক্তি যেকোন বিষয়ে চাইলেই ফৎওয়া দেয়, সে একটা পাগল'।[25] খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (৯৯-১০১ হি.)-এর নিকট কোন বিষয়ে ফৎওয়া চাইলে তিনি বলতেন, ما أنا على الفُتيا بِجَرِيءٍ 'ফৎওয়া দেওয়ার মত দুঃসাহস আমার নেই'। তিনি তার জনৈক রাজকর্মচারীকে লেখেন, আল্লাহ্র কসম! আমি ফৎওয়া দানের ব্যাপারে আগ্রহী নই। যতক্ষণ না আমি বাধ্য হই'। ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হি.)-কে কোন প্রশ্ন করা হলে মনে হ'ত যেন তিনি দাঁড়িয়ে আছেন জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে' *(ইবনু রাজাব ৮৪ পৃঃ)*।

সুফিয়ান ছাওরী (৯৭-১৬১ হি.) বলেন, আমরা বিদ্বানদের পেয়েছি এমতাবস্থায় যে, তারা ফৎওয়া প্রদান থেকে দূরে

---

২২. তিরমিযী হা/১৭০০; নাসাঈ হা/৩৫৮৬; মিশকাত হা/৩৮৭৪, সনদ ছহীহ।

২৩. আবুবকর আল-খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ পৃঃ ২৯।

২৪. ইবনু রজব ৮৪ পৃঃ; ইবনু হাজার, তালখীছুল হাবীর ৪/৪৫৪।

২৫. দারেমী হা/১৭১, সনদ ছহীহ।

Contents

থাকতেন, যতক্ষণ না তারা বাধ্য হ'তেন'। ইমাম আহমাদ (১৬৪-২৪১ হি.)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন, الإمساك أحبُّ الىَّ 'বিরত থাকাই আমার নিকট উত্তম'। ক্বাতাদাহ (৬১-১১৮হি.) যখন ফৎওয়া দিতে বসেন, তখন আমর ইবনু দীনার (৪৬-১২৪ হি.) তাকে বলেন, আপনি জানেন কোন কাজে আপনি বসেছেন? আপনি নিক্ষিপ্ত হয়েছেন আল্লাহ ও বান্দার মাঝখানে। আপনি বলছেন এটা ঠিক এবং ওটা বেঠিক'। মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (মৃ. ১৩০ হি.) বলতেন, আলেম আল্লাহ ও তার সৃষ্টি জগতের মাঝখানে প্রবেশ করে। অতএব সে দেখুক কিভাবে প্রবেশ করবে। ইবনু সীরীন (৩৩-১১০হি.)-কে হালাল ও হারাম বিষয়ে কোন প্রশ্ন করা হ'লে ভয়ে তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত। তাকে আগের চেহারায় চেনা যেত না'।

কোন কোন সালাফী বিদ্বান মুফতীদের বলতেন, যখন তোমাকে কোন বিষয় প্রশ্ন করা হবে, তখন তোমার বড় চিন্তা যেন না হয় প্রশ্নকারীকে মুক্ত করা। বরং তোমার বড় চিন্তা যেন হয় নিজেকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা' *(ইবনু রাজাব ৮৩-৮৪ পৃঃ)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীছে এসেছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন প্রথম যে তিন শ্রেণীর লোকের বিচার করা হবে, তাদের মধ্যে এক শ্রেণী হ'ল আলেমগণ। অতঃপর দানশীল অতঃপর শহীদ। যাদের কোন আমলই কবুল করা হবে না তাদের স্ব স্ব অহংকারের কারণে। অবশেষে তাদের উপুড় করে ফেলে মাটিতে চেহারা ঘেঁষে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[২৬]

উপরের আলোচনায় আমরা বলেছি যে, সম্পদ ও নেতৃত্ব এবং এ দু'টির লোভ মানুষের দ্বীনকে ধ্বংস করে দেয়। শেষে তার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না যতটুকু আল্লাহ ইচ্ছা করেন ততটুকু ব্যতীত। আর এটি মূলতঃ দুনিয়ার লোভ থেকে আসে। আর দুনিয়ার লোভ আসে প্রবৃত্তি পূজা থেকে। আর প্রবৃত্তিপূজার ফলে মানুষ হারামকে হালাল করে। আল্লাহ বলেন, فَأَمَّا مَنْ طَغَى- وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا- فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى- وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى- فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى- 'যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে' 'এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে' 'জাহান্নাম তার ঠিকানা হবে'। 'পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় করেছে এবং নিজেকে প্রবৃত্তির গোলামী হ'তে বিরত রেখেছে' 'জান্নাত তার ঠিকানা হবে' *(নাযে'আত ৭৯/৩৭-৪১)*।

সম্পদ ও নেতৃত্ব লোভীদের পরকালীন পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَالَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ- وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ- يَالَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ- مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ- هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ- 'অতঃপর (ক্বিয়ামতের দিন) যার বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, সে বলবে, হায়! যদি আমি আমার আমলনামা না পেতাম' 'এবং আমি আমার হিসাব না জানতাম'। 'হায়! যদি মৃত্যুই আমার জন্য চূড়ান্ত হ'ত'। 'আজ আমার সম্পদ কোন কাজে আসল না'। 'আমার ক্ষমতা আজ ধ্বংস হয়ে গেল' *(আল হা-ক্কাহ ৬৯/২৫-২৯)*।

জানা আবশ্যক যে, উচ্চ সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার লোভ মানুষের স্বভাবজাত। আর এ থেকেই অহংকার সৃষ্টি হয়। শয়তান তাকে উসকে দিয়ে মানুষকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করে। এই শয়তানী ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে পারাটাই আল্লাহ্‌র পরীক্ষা। হতভাগ্যরা এই ফাঁদে পা দিয়ে দুনিয়া অর্জন করে ও আখেরাতে বঞ্চিত হয়।

কিন্তু জ্ঞানীরা স্থায়ী মর্যাদা চায়। যাতে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হয় এবং যা আখেরাতে পাওয়া যায়। কেননা দুনিয়ার বড়ত্ব সাময়িক ও নিন্দনীয়। কিন্তু আখেরাতের মর্যাদা চিরস্থায়ী ও প্রশংসনীয়। আল্লাহ বলেন,-وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ 'আর এরূপ বিষয়েই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/২৬)*। হাসান বাছরী (২১-১১০ হি.) বলেন, إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُنَافِسُ فِي الدُّنْيَا فَنَافِسْهُ فِي الآخِرَةِ 'যখন তুমি দেখবে কেউ তোমার সঙ্গে দুনিয়ার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করছে, তখন তুমি তার সঙ্গে আখেরাতের বিষয়ে প্রতিযোগিতা কর'।[২৭]

ওমর ফারূক (রাঃ)-এর নিকটে জনৈক ব্যক্তি লোকদের প্রতি ওয়ায করার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে বলেন, أَخْشَى عَلَيْكَ أَنْ تَقُصَّ فَتَرْتَفِعَ عَلَيْهِمْ فِى نَفْسِكَ ثُمَّ تَقُصَّ فَتَرْتَفِعَ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْكَ أَنَّكَ فَوْقَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الثُّرَيَّا فَيَضَعَكَ اللَّهُ تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ. 'আমার ভয় হয় ওয়ায করার ফলে তোমার মধ্যে ধ্রুবতারার ন্যায় উচ্চ মর্যাদা পাওয়ার অহংকার সৃষ্টি হবে। আর তাতে আল্লাহ তোমাকে ক্বিয়ামতের দিন ঐসব লোকদের পায়ের তলায় রাখবেন'।[২৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِى صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِى جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ الأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْخَبَالِ-

২৬. মুসলিম হা/১৯০৫; মিশকাত হা/২০৫ 'ইলম' অধ্যায়।

২৭. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৬৩৫১।

২৮. আহমাদ হা/১১১, সনদ হাসান।

Contents

ক্বিয়ামতের দিন অহংকারীরা হাশরের ময়দানে মানুষের অবয়বে ক্ষুদ্র পিপীলিকার ন্যায় জমা হবে, তাদেরকে 'বূলুস' (بولُس) নামক জাহান্নামে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে। সেখানে আগুনের উপর আগুন বৃদ্ধি করা হবে এবং তাদেরকে জাহান্নামীদের গলিত পুঁজ-রক্ত 'ত্বীনাতুল খাবাল' পান করানো হবে।[২৯]

ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ (মৃ. ১১০ হি.) একদা মাকহূল (মৃ. ১১২ হি.)-কে লেখেন فإنكَ أصبتَ بظاهرِ علمكَ عندَ الناسِ شَرفًا ومنزلةً، فاطلُبْ بباطنِ علمكَ عندَ اللَّه منزلةً وزُلْفَى، واعلمْ أنَّ إحدَى المنزلَتين تمنعُ من الأخرَى– 'আপনি প্রকাশ্য ইলমের মাধ্যমে মানুষের নিকট সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছেন। এক্ষণে গোপন ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট সম্মান ও নৈকট্য হাছিল করুন। মনে রাখবেন একটির মর্যাদা অন্যটিকে বাধা প্রদান করে'।

এখানে 'প্রকাশ্য ইলম' বলতে শরী'আতের ইলম, ফৎওয়া প্রদান, ওয়ায-নছীহত ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। আর 'গোপন ইলম' বলতে আল্লাহকে চেনা, তাকে ভয় করা, তাকে ভালোবাসা, তার উপর ভরসা করা, তাকদীরের ফায়ছালার উপর সন্তুষ্ট থাকা, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সম্পদের আকাংখা থেকে বিরত হওয়া এবং চিরস্থায়ী আখেরাতের সম্পদ লাভে আকাংখী হওয়া ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। যার একটি অপরটির বিপরীত। কেননা দুনিয়া লাভের আকাংখা আখেরাত লাভের আকাংখাকে বারিত করে। ফলে সে আখেরাতকে বেছে নেয় এবং তাকে দুনিয়ার উপরে অগ্রাধিকার দেয়। আল্লাহ বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ 'যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে, আমরা তার ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ব্যক্তি ইহকালের ফসল কামনা করে, আমরা তাকে সেখান থেকে কিছু দিয়ে থাকি। কিন্তু পরকালে তার কোনই অংশ থাকবে না' *(শূরা ৪২/২০)*।

এর অর্থ এটা নয় যে, সে একেবারেই দুনিয়াত্যাগী হবে। বরং এর অর্থ আখেরাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে দুনিয়া করা, যতটুকু না করলে নয়। আর দুনিয়ার ফিৎনা যেন তাকে গ্রেফতার না করে সেজন্য দুনিয়ায় ও আখেরাতে কল্যাণ চেয়ে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করতে হবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) অধিকাংশ ছালাতে এই দো'আ করতেন رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 'হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দাও ও আখেরাতে মঙ্গল দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও'।[৩০]

আখেরাতের আকাংখী ব্যক্তিরা আল্লাহ ও বান্দার ভালোবাসা পায়। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا– 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, সত্বর তাদের জন্য দয়াময় (স্বীয় বান্দাদের অন্তরে) মহব্বত সৃষ্টি করে দিবেন' *(মারিয়াম ১৯/৯৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ إِنِّى أُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبَّهُ– قَالَ : فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِى فِى السَّمَاءِ فَيَقُولُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوهُ. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ– قَالَ : ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِى الأَرْضِ. وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ إِنِّى أُبْغِضُ فُلاَنًا فَأَبْغِضْهُ– قَالَ : فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِى فِى أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فُلاَنًا فَأَبْغِضُوهُ– قَالَ : فَيُبْغِضُونَهُ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِى الأَرْضِ– 'যখন আল্লাহ কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন ডেকে বলেন, হে জিব্রীল! আমি অমুককে ভালবেসেছি। তুমিও তাকে ভালবাস। তখন জিব্রীল তাকে ভালবাসেন এবং তিনি সেটি আসমানবাসীদের বলে দেন। তখন তারা তাকে ভালবাসেন। অতঃপর উক্ত ভালোবাসা যমীনে নামিয়ে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ যখন কোন বান্দার উপরে ক্রুদ্ধ হন, তখন ডেকে বলেন, হে জিব্রীল! আমি অমুকের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছি। তুমিও তার প্রতি ক্রুদ্ধ হও। তখন জিব্রীল তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং তিনি সেটি আসমানবাসীদের বলে দেন। তখন তারা তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন। অতঃপর উক্ত ক্রোধ যমীনে নামিয়ে দেওয়া হয়'।[৩১]

মোটকথা আখেরাতের মর্যাদা সন্ধান করলে দুনিয়ার মর্যাদা সেই সাথে অর্জিত হয়। যদিও সে ব্যক্তি তার কামনা করে না বা তার জন্য চেষ্টাও করে না। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার মর্যাদা সন্ধান করে, সে কেবল সেটাই পায়। কিন্তু আখেরাত হারায়। কেননা দু'টি বস্তু কখনো এক সাথে অর্জন করা যায় না। অতএব সৌভাগ্যবান সেই, যে ব্যক্তি চিরস্থায়ী মর্যাদাকে ক্ষণস্থায়ীর উপর প্রাধান্য দেয়। যেমন আবু মূসা আশ'আরী

২৯. তিরমিযী হা/২৪৯২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৫৮৩, সনদ হাসান; মিশকাত হা/৫১১২।

৩০. বুখারী হা/৪৫২২, ৬৩৮৯; বাক্বারাহ ২/২০১; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৪৮৭।

৩১. মুসলিম হা/২৬৩৭; বুখারী হা/৩২০৯; মিশকাত হা/৫০০৫।

Contents

(রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى 'যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসবে, সে তার আখেরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আর যে ব্যক্তি আখেরাতকে ভালবাসবে, সে তার দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। অতএব তোমরা ধ্বংসশীল বস্তুর উপরে চিরস্থায়ী বস্তুকে অগ্রাধিকার দাও'।[৩২]

লোভ দমনে করণীয় :

দুনিয়ার লোভ দমন করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখতে হবে। (১) ঐসব কর্তৃত্বশীল লোকদের মন্দ পরিণতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া, যারা আখেরাতের হক আদায় করেনি। ফলে তারা আল্লাহ্র রহমত ও মানুষের দো'আ থেকে চিরবঞ্চিত হয়েছে। বিগত যুগের ও বর্তমান যুগের দুষ্ট নেতারা এর বাস্তব উদাহরণ। (২) মিথ্যাবাদী, অহংকারী ও যালেমদের উপর আল্লাহ্র প্রতিশোধ থেকে শিক্ষা নেওয়া (৩) বিনয়ী ব্যক্তিদের প্রতি দুনিয়াতে আল্লাহ্র পুরস্কার এবং আখেরাতে তাদের উচ্চ মর্যাদার প্রতি দৃষ্টিপাত করা। (৪) আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তিদের পবিত্র জীবন ও দুনিয়াবী মর্যাদা থেকে উদ্বুদ্ধ হওয়া। যেমন আল্লাহ বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ- 'পুরুষ হৌক নারী হৌক মুমিন অবস্থায় যে সৎকর্ম সম্পাদন করে, আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম অপেক্ষা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করব' *(নাহল ১৬/৯৭)*। বস্তুতঃ পবিত্র জীবন লাভ করাই হ'ল দুনিয়াতে আল্লাহ্র দেওয়া সবচেয়ে বড় পুরস্কার। এছাড়া আখেরাতের অতুলনীয় পুরস্কার তো আছেই। যা চোখ কখনো দেখেনি, কান কখনো শোনেনি এবং হৃদয় কখনো কল্পনা করেনি।[৩৩] নিঃসন্দেহে আলেম যখন তার ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করবে তখন সবাই তাকে ভয় করবে। আর যখন তার দ্বারা সে মাল বৃদ্ধি কামনা করবে, তখন সে অন্যকে ভয় করবে। অতএব সকল কল্যাণ নিহিত রয়েছে আল্লাহ্র আনুগত্যের মধ্যে। আর আল্লাহ্র অনুগত বান্দা দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক। আল্লাহ বলেন, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ 'সকল সম্মান আল্লাহ্র জন্য, তার রাসূলের জন্য এবং মুমিনদের জন্য। কিন্তু কপট বিশ্বাসীরা তা জানে না' *(মুনাফিকূন ৬৩/৮)*।

সম্পদ লাভের ক্ষতিকর দিক সমূহ :

(১) এটি মানুষের প্রবৃত্তি পরায়ণতাকে উসকে দেয়। (২) বিলাসিতার প্রতি তার অন্তর ধাবিত হয়। (৩) কখনো কখনো হালাল আয়ের সীমা অতিক্রম করে সে সন্দেহযুক্ত আয়ের মধ্যে প্রবেশ করে। এমনকি যুক্তি দিয়ে হারামকে হালাল করে। (৪) সে আল্লাহ থেকে উদাসীন হয়ে পড়ে।

সম্মান লাভের ক্ষতিকর দিক সমূহ :

(১) এজন্য সে তার সমস্ত মাল-সম্পদ লুটিয়ে দেয়। (২) তার মধ্যে রিয়া ও নিফাক্ব প্রবেশ করে। যা তাকে চরিত্রহীন করে ফেলে। আর এটাই হ'ল তার সকল ক্ষতির বড় ক্ষতি।

চার ধরনের মানুষ :

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, মাল ও সম্পদ কামনার বিষয়ে চার ধরনের মানুষ রয়েছে। (১) যারা আল্লাহ্র অবাধ্যতার মাধ্যমে মানুষের উপর কর্তৃত্ব চায় ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। যেমন দুষ্টমতি রাজা-বাদশা ও সমাজনেতারা। (২) যারা কর্তৃত্ব কামনা ছাড়াই সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। যেমন চোর-বাটপার প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকেরা (৩) যারা বিশৃংখলা ছাড়াই কেবল কর্তৃত্ব চায়। যেমন ঐসব দ্বীনদার লোক যারা দ্বীনের মাধ্যমে সমাজের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে। (৪) জান্নাতীগণ। যারা সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব চায় না ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে না।[৩৪]

এক্ষণে সম্পদ ও কর্তৃত্ব যদি আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলে ব্যয়িত হয়, তবে সেটাতে দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ রয়েছে। আর যদি তা না থাকে, তাহ'লে তা হয় সমাজের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর। যেটাকে হাদীছে ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও মাল দেখেন না। তিনি দেখেন তোমাদের হৃদয় ও কর্ম'।[৩৫]

এক্ষণে যে ব্যক্তি জিহাদ ও ক্ষমতার মাধ্যমে দ্বীন কায়েমে ব্যর্থ হবে, সে ব্যক্তি উপদেশের মাধ্যমে ও আল্লাহ্র নিকট দো'আর মাধ্যমে সেটা করবে। সর্বোপরি সে তার সর্বোচ্চ সাধ্য মতে আল্লাহ্র আনুগত্য করে যাবে।

আলোচ্য হাদীছে কঠোর সাবধানবাণী রয়েছে সম্পদ ও মর্যাদা লোভী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। যা থাকলে কারু দ্বীন নিরাপদ থাকবে না আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত স্বল্প সংখ্যক লোকেরা ব্যতীত। এজন্য এ দু'টি লোভকে দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যা মুমিনের ঈমানকে খেয়ে ফেলে। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন- আমীন!

---

৩২. আহমাদ হা/১৯৭১২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩২৪৭; মিশকাত হা/৫১৭৯।
৩৩. বুখারী হা/৩২৪৪; মুসলিম হা/২৮২৪; মিশকাত হা/৫৬১২।
৩৪. ইবনু তায়মিয়াহ, আস-সিয়াসাতুশ শারঈয়াহ ২১৭-১৯ পৃঃ।
৩৫. মুসলিম হা/২৫৬৪; মিশকাত হা/৫৩১৪।

Contents

আহলেহাদীছ আন্দোলন ও অন্যান্য ইসলামী আন্দোলন : তুলনামূলক আলোচনা

*মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম**

ভূমিকা :

দেশে বিভিন্ন দল ও উপদল রয়েছে। এদের উদ্ভব ভিন্ন ভিন্ন কারণে। বস্তুবাদী ও অনৈসলামিক দলের পাশাপাশি ইসলামের নামেও দেশে বহু দল রয়েছে। যাদের সকলের ধর্ম ইসলাম, ধর্মগ্রন্থ কুরআন, লক্ষ্য জান্নাত। কিন্তু তাদের অনেকের আক্বীদা ইসলাম বিরোধী, কর্ম কুরআন-হাদীছ পরিপন্থী এবং তরীক্বা বিদ'আতী। তাই এসব দলের মধ্য থেকে ছিরাতুল মুস্তাক্বীমের উপরে প্রতিষ্ঠিত দলকে বেছে নিয়ে সেই দলের সাথে থাকা মুসলিমের কর্তব্য। আর হকপন্থী দল বা সংগঠনের পরিচয় তুলে ধরাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

দল বিভক্তির সূচনা :

৪র্থ খলীফা আলী (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ছিফফীনের যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ সংক্রান্ত রাজনৈতিক মতভেদের ফলে সর্বপ্রথম খারিজী দলের উদ্ভব ঘটে। তার খেলাফতের অবসানে উমাইয়া শাসনামলে শী'আ ও মুরজিয়া প্রভৃতি দলের সূত্রপাত হয়। দিনে দিনে ব্যক্তি, গোষ্ঠির মতাদর্শের ভিন্নতায় নতুন নতুন দল জন্ম লাভ করে।[১] এরপর উমাইয়া, আব্বাসিয়া, ফাতিমিয়া, সেলজুকিয়া রাজত্বকালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যক্তি প্রভাবে, তাক্বলীদে শাখছীর প্রভাবে কত যে দল-মতের উদ্ভব হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।

রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ بَنِى إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِى عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِى– 'বনু ইস্রাঈলগণ ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। একটি দল ব্যতীত এদের সবাই জাহান্নামে যাবে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, সে দল কোনটি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি ও আমার ছাহাবীগণ যার উপরে আছি, তার উপরে যে দল থাকবে। হাকেম-এর বর্ণনায় এসেছে যে, 'আমি ও আমার ছাহাবীগণ আজকের দিনে যার উপরে আছি'।[২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَهِىَ الْجَمَاعَةُ 'সেটি হ'ল জামা'আত'।[৩]

ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম এর যুগে দুনিয়ার সকল প্রান্তের মুসলিম এলাকা আহলেহাদীছ ছিল।[৪]

হিজরী ৪র্থ শতকের আগ পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে (কোন দল, কোন মানুষ) নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের অন্ধ অনুসারী ছিল না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভাষায় নিন্দিত ৪র্থ শতাব্দী হিজরীতে তাক্বলীদে শাখছী বা ইমামদের অন্ধ অনুসরণের বিদ'আত চরমে পৌঁছে, এমনকি চার মাযহাব মান্য করা ফরয ঘোষণা করা হয়। মাযহাবী তাক্বলীদের বাড়াবাড়ির পরিণামে হানাফী, শাফিঈ, শী'আ, সুন্নীর দ্বন্দ্বে ৬৫৬ হিজরীতে হালাকু খাঁর আক্রমণে বাগদাদে আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংস হয়। পরে মিসরের সুলতান রুকুনুদ্দীন বায়বারাসের আমলে ৬৫৮ হিজরীতে মিসরের রাজধানীতে সর্বপ্রথম চার মাযহাবের লোকের জন্য চারজন পৃথক ক্বাযী নিয়োগ করা হয়। চার মাযহাব বর্হিভূত কোন মাসআলা কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হ'লেও তা অনুসরণ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়। এরপর বুরুজী মামলূক সুলতান ফরজ বিন বারকুক ৮০১ হিজরীতে মাযহাবী আলেমদের সন্তুষ্ট করার জন্য কা'বা ঘরের চার পাশে চার মুছাল্লা কায়েম করেন। ফলে মুসলিম উম্মাহ অন্ততঃ ছালাতের সময় এক হওয়ার সুযোগ হ'তেও বঞ্চিত হয়। যারা এই বিভক্তির বিরোধী ছিল, তাদেরকে সরকারীভাবে লাঞ্ছিত করা হয়, সামাজিকভাবে বয়কট করা হয়, তাদেরকে 'লা মাযহাবী' বলে গালিও দেওয়া হয় এবং ওয়াহাবী নামে আখ্যায়িত করে রাজনৈতিক ফায়েদা হাছিলের অপচেষ্টা চালানো হয়।[৫]

এভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক যুলুম সত্ত্বেও প্রতি যুগে এমন কিছু হকপন্থী মুসলমান ছিলেন বা আছেন যারা কোন অবস্থাতেই ছহীহ হাদীছের ঊর্ধ্বে কোন ব্যক্তিগত মতামতকে এক মুহূর্তের জন্যও মেনে নিতে রাযী নন। বলা বাহুল্য এরাই ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে এ পর্যন্ত 'আহলেহাদীছ' নামে পরিচিত।

বাংলাদেশে প্রচলিত আন্দোলন :

বাংলাদেশে বর্তমানে মূলতঃ দু'ধরনের আন্দোলন চলছে। 'ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'ইসলামী'। প্রত্যেকটিই দু'ভাগে বিভক্ত। **প্রথমতঃ** ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির একভাগ ব্যক্তি জীবনে আস্তিক বা ধর্মভীরু, কিন্তু বৈষয়িক জীবনে নাস্তিক বা ধর্মহীন। ব্যক্তি জীবনে ধর্মের অনুসারী হ'লেও তারা বৈষয়িক জীবনে ধর্মহীন বিজাতীয় মতাদর্শের অন্ধ অনুসরণ করে থাকেন। ফলে রাজনীতির নামে ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বৈরাচার এবং অর্থনীতির নামে সূদ-ঘুষ-জুয়া-লটারী, মওজুদদারী ইত্যাদি পুঁজিবাদী শোষণ-নির্যাতনকে তারা বৈধ ভেবে নেন, এই কারণে যে এগুলি ধর্মীয় বিষয় নয় বরং বৈষয়িক ব্যাপার। আর তাই হারাম পয়সা দিয়ে রসগোল্লা কিনে নিজ নিষ্পাপ সন্তানের মুখে তুলে দিতেও এদের হাত কাঁপে না। রাজনীতির নামে

** সাধারণ সম্পাদক, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ।*

১. আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ (পিএইচ.ডি থিসিস), পৃঃ ৫০।

২. সনদ হাসান, আলবানী, ছহীহ তিরমিযী হা/২১২৯; ঐ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৪৮; হাকেম ১/১২৯ পৃঃ; আলবানী, মিশকাত হা/১৭১ 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

৩. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৭২ 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

৪. আহসানুত তাক্বাসীম, পৃঃ ৪৮১।

৫. ইনসাইক্লোপেডিয়া ১/২৪৯ পৃঃ।

ধর্মঘট-অবরোধ-হরতাল করে জনগণের ক্ষতি সাধন করতে, সূদ-ঘুষ ও ব্যভিচারের মত প্রকাশ্য হারামকে হালাল করতে, অন্যদলের লোকের বুকে চাকু বসাতে, রগ কাটতে ও বন্দুকের গুলীতে তার বুক ঝাঁঝরা করে দিতে এইসব রাজনীতিকদের বিবেকে একটুও বাঁধে না। কারণ এসব ধর্ম নয় বরং বৈষয়িক ব্যাপার। এইভাগে লোকের সংখ্যাই সর্বত্র বেশী।

ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির অন্য ভাগটি ব্যক্তি ও বৈষয়িক উভয় জীবনে 'নাস্তিক' অর্থাৎ উভয় জীবনে তারা ধর্মহীন বিজাতীয় মতাদর্শের অনুসারী। যদিও তাদের কেউ কেউ ইসলামী নাম নিয়েই ময়দানে চলাফেরা করেন।

দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে ইসলামী দলগুলি। এরা মূলতঃ দু'ভাগে বিভক্ত। একভাগের দলগুলি তাক্বলীদের অনুসরণে এবং অধিকাংশ জনগণের আচরিত মাযহাব অনুযায়ী ব্যক্তি ও বৈষয়িক জীবনে ইসলামী আইন ও শাসন চান। এরা বাহ্যিকভাবে বিশেষ একজন সম্মানিত ইমামের তাক্বলীদের দাবীদার হ'লেও বাস্তবে পরবর্তী ফক্বীহদের রচিত বিভিন্ন ফিক্বহ এবং পীর-মাশায়েখ, মুরব্বী ও ইসলামী চিন্তাবিদ নামে পরিচিত বিভিন্ন ব্যক্তির অনুসারী।

আর এক ভাগে রয়েছেন তারা, যারা তাক্বলীদমুক্তভাবে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী নিজেদের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন এবং দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থা কামনা করেন। যারা ব্যক্তি ও বৈষয়িক উভয় ক্ষেত্রে জাতীয় ও বিজাতীয় উভয় প্রকার তাক্বলীদ হ'তে মুক্ত থেকে নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী নিজেদের সার্বিক জীবন পরিচালনা করতে চান। এরাই হ'লেন 'আহলেহাদীছ'।[6]

এই দলবিভক্তি সত্ত্বেও ক্বিয়ামত পর্যন্ত একটি দল সর্বদা হকের উপরে টিকে থাকবে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَزَالُ طَائِــفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَــذَالِكَ- 'চিরদিন আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হক্বের উপরে বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা ঐভাবে থাকবে'।[7]

আহলেহাদীছের পরিচয় :

ফারসী সম্বন্ধ পদে 'আহলেহাদীছ' এবং আরবী সম্বন্ধ পদে 'আহলুল হাদীছ'-এর আভিধানিক অর্থ হাদীছের অনুসারী। পারিভাষিক অর্থে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসারী। যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে নিঃশর্তভাবে মেনে নিবেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের তরীক্বা অনুযায়ী নিজের সার্বিক জীবন গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকেন, কেবল তাদেরকেই আহলেহাদীছ বলা হয়।[8] উক্ত পথের প্রচার ও প্রসারের কাজে যে সংগঠন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেটি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'।

আহলেহাদীছ এমন একটি গুণবাচক নাম, যা উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য ভূষণ সদৃশ। কর্মের সাথে, আমলের সাথে, ইচ্ছার সাথে, সাধনার পথে, চিন্তার স্রোতে চেতনার ব্রতে এ নামে মুসলিম জীবনের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত।

বিশ্বে যতগুলি ইসলামী আন্দোলন রয়েছে, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং নির্ভেজাল হ'ল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'। দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা ইসলামী আন্দোলনের নামই হ'ল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'। পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি। এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ও উক্ত নৈতিক ভিত্তির উপরে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হয়ে একজন মুমিন যাতে জান্নাতের পথের পথিক হ'তে পারে আহলেহাদীছ আন্দোলন মানুষকে সেই পথ দেখায়। 'আহলেহাদীছ' তাই কোন মতবাদের নাম নয়, এটি একটি পথের নাম। যে পথ আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র পথ, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর পথ। সেই হক পথের দিকে আহ্বান জানায় আহলেহাদীছ আন্দোলন।

আহলেহাদীছের উৎপত্তি :

আহলেহাদীছের উৎপত্তি রাসূল (ছাঃ)-এর যুগেই। আর ছাহাবায়ে কেরাম হ'লেন জামা'আতে আহলেহাদীছের প্রথম সারির সম্মানিত দল, যাঁরা এ নামে অভিহিত হ'তেন। যেমন- (১) প্রখ্যাত ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) (মৃঃ ৭৪হিঃ) কোন মুসলিম যুবককে দেখলে খুশী হয়ে বলতেন, مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَــلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُوَسِّعَ لَكُمْ فِــي الْمَجْلِــسِ وَأَنْ نُفَهِّمَكُــمُ الْحَدِيثَ فَإِنَّكُمْ خُلُوْفُنَا وَأَهْلُ الْحَدِيْثِ بَعْــدَنَا- 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অছিয়ত অনুযায়ী আমি তোমাকে 'মারহাবা' জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে তোমাদের জন্য মজলিস প্রশস্ত করার ও তোমাদেরকে হাদীছ বুঝাবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কেননা তোমরাই আমাদের পরবর্তী বংশধর ও পরবর্তী 'আহলেহাদীছ'।[9]

(১) খ্যাতনামা তাবেঈ ইমাম শা'বী (২২-১০৪হিঃ) ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আতকে 'আহলুল হাদীছ' বলতেন। যেমন একদা তিনি বলেন, لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا حَدَّثْتُ إِلاَّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَدِيْثِ 'এখন যেসব ঘটছে,

---

৬. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, উদাত্ত আহ্বান, পৃঃ ৭-৮।*

৭. *ছহীহ মুসলিম হা/১৯২০ 'ইমারত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৩।*

৮. *আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন, পৃঃ ৬।*

৯. *আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন, পৃঃ ৬; গৃহীত : আবুবকর আল-খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ (লাহোর : রিপন প্রেস, তাবি), পৃঃ ১২; হাকেম একে ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন। -আল-মুস্তাদরাক ১/৮৮ পৃঃ; সিলসিলা ছহীহা হা/২৮০।*

Contents

তা আগে জানলে আমি কোন হাদীছ বর্ণনা করতাম না, কেবল ঐ হাদীছ ব্যতীত, যার উপরে 'আহলুল হাদীছ' অর্থাৎ ছাহাবায়ে কেরাম একমত হয়েছেন'।[১০]

(৩) ছাহাবায়ে কেরামের শিষ্যমণ্ডলী তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈন সকলে 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। ইবনু নাদীম (মৃঃ ৩৭০ হিঃ) তাঁর 'কিতাবুল ফিহ্‌রিস্ত' গ্রন্থে, ইমাম খত্বীব বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হিঃ) স্বীয় 'তারীখু বাগদাদ' দ্বাদশ ও চতুর্দশ খণ্ডে এবং ইমাম হেবাতুল্লাহ লালকাঈ (মৃঃ ৪১৮ হিঃ) স্বীয় 'শারহু উছূলি ই'তিক্বাদ ...' গ্রন্থে ছাহাবায়ে কেরাম হ'তে শুরু করে তাঁর যুগ পর্যন্ত তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম ও নেতৃবৃন্দের নামের বিরাট তালিকা দিয়েছেন। এতদ্ব্যতীত 'আহলেহাদীছ-এর মর্যাদা' শীর্ষক 'শারফু আছহাবিল হাদীছ' নামে ইমাম খত্বীব বাগদাদীর একটি পৃথক বইও রয়েছে।

(৪) ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হিঃ), ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হিঃ), ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ), ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিঃ) সকলেই 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। স্বীয় যুগে হাদীছ তেমন সংগৃহীত না হওয়ার ফলে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) অধিকহারে রায় ও ক্বিয়াসের আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে তাঁকে إِمَامُ أَهْلِ الرَّأْى বা 'আহলুর রায়দের ইমাম' বলা হয়ে থাকে। তিনি নিজে কোন কিতাব লিখে যাননি। বরং শিষ্যদের অছিয়ত করে গিয়েছেন এই বলে যে, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَـــذْهَبِيْ 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনো সেটাই আমার মাযহাব'।[১১]

প্রখ্যাত ছাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) যিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সহচর ছিলেন। যিনি ৫৩৭৪টি হাদীছ বর্ণনা করে হাদীছের শ্রেষ্ঠ রাবীরূপে বিবেচিত। যার নিকট থেকে ৮ শতাধিক ছাহাবী ও তাবেঈ হাদীছ গ্রহণ ও শ্রবণ করেছেন। তাঁকে আহলেহাদীছ নামে অভিহিত করা হ'ত।[১২]

মশহূর ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) যিনি মহানবী (ছাঃ) হ'তে ১৬৬০টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। বিপুল সংখ্যক ছাহাবী তার নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ ও গ্রহণ করেছেন। তাকেও আহলেহাদীছ হিসাবে ভূষিত করা হয়েছে।[১৩]

প্রখ্যাত তাবেঈ ইমাম শা'বী যিনি ২২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন, তিনি (১) হযরত আবুবকর ছিদ্দীক্ব (২) ওমর বিন খাত্ত্বাব (৩) ওছমান বিন আফফান (৪) আলী ইবনু আবী ত্বালেব (৫) যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (৬) সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (৭) সাঈদ বিন যায়েদ (৯) আব্দুর রহমান বিন আওফ (১০) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (১১) মু'আয বিন জাবাল (১২) উবাই বিন কাব (১৩) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (১৪) আব্দুল্লাহ বিন ওমর (১৫) আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আছ (১৬) আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (১৭) যায়েদ বিন ছাবিত (১৮) উবাদা বিন ছাবিত (১৯) আবু মূসা আশ'আরী (২০) ইমরান বিন হুসাইন (২১) আম্মার বিন ইয়াছির (২২) হুযায়ফা বিন ইয়ামান (২৩) সালমান ফারসী যিনি ৩৫০ বছর বেঁচে ছিলেন, সবাইকে আহলেহাদীছ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।[১৪]

আহলেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য হ'ল 'দ্বীনে হক্বের প্রচার ও প্রসারে সংঘবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালানো এবং তার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করে সরাসরি জান্নাত লাভের কামনা করা বা পাথেয় সংগ্রহ করা।

গঠনতন্ত্রের ভাষায়- 'নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা। আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধন, আহলেহাদীছ আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য'। মোটকথা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে রাযী-খুশি করার জন্য আল্লাহ মনোনীত একমাত্র দ্বীন ইসলামকে আল্লাহ্‌র যমীনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে আন্দোলন ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসছে সেই নির্ভেজাল দ্বীন প্রতিষ্ঠাই আহলেহাদীছ আন্দোলনের মৌলিক চিন্তাধারা। এ আন্দোলনের লক্ষ্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন। এর ভিত্তি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ। এর কাজ হ'ল পবিত্র কুরআনে যেভাবে বর্ণিত আছে, ছহীহ হাদীছে যেভাবে বাস্তবে রূপ দেওয়া হয়েছে তার প্রচার ও পতিষ্ঠা করা।

ইসলামের নামে বহু আন্দোলন বহু কাল ধরে চলে আসছে। আজও চলছে, আগামীতেও চলবে; কিন্তু সব আন্দোলনই অবশেষে সংকীর্ণ দলীয় রূপ ধারণ করে মুখ থুবড়ে পড়েছে অথবা শেষ পরিণতি অতীব ভয়াবহ হয়েছে এবং মাযহাবী চক্রজালে আবেষ্টিত হয়েছে। সে কারণে আহলেহাদীছ আন্দোলন মানব রচিত অসংখ্য মতবাদ, মাযহাব, ইযম ও তরীকার বেড়াজালে আবেষ্টিত মানব সমাজকে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রদর্শিত অভ্রান্ত সত্যের পথে পরিচালনার দ্বীপশিখা হাতে নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

আহলেহাদীছের বৈশিষ্ট্য :

আহলেহাদীছ অনুপম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এক নির্ভেজাল তাওহীদপন্থী জামা'আত। তাদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিম্নে উপস্থাপন করা হ'ল।- (১) তারা সংস্কারক হবেন (২) আক্বীদার ক্ষেত্রে সর্বদা মধ্যপন্থী হবেন এবং কখনোই চরমপন্থী বা শৈথিল্যবাদী হবেন না (৩) আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে তারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের অনুসারী হবেন এবং তারা ছাহাবায়ে কেরাম ও

---

১০. *কি ও কেন, পৃঃ ৬; গৃহীত : শামসুদ্দীন যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ১/৮৩ পৃঃ।*

১১. *ইবনু আবেদীন, শামী হাশিয়া রাদ্দুল মুহতার (বৈরুত : দারুল ফিকর ১৩৯৯/১৯৭৯) ১/৬৭ পৃঃ; আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী, মীযানুল কুবরা (দিল্লী : ১২৮৬ হিঃ) ১/৩০ পৃঃ।*

১২. *আল-ইছাবাহ, ৪/১০৪ পৃঃ; তাযকিরাতুল হুফফায, ১/২৯ পৃঃ; তারীখু বাগদাদ, ৯/৪৬৭ পৃঃ; আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন, পৃঃ ৬-১৭।*

১৩. *তারীখু বাগদাদ ৩/২২৭ পৃঃ।*

১৪. *আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, পৃঃ ৬৭।*

Contents

সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী শরী'আত ব্যাখ্যা করেন (৪) তারা জামা'আতবদ্ধভাবে আল্লাহ্র রাস্তায় সংগ্রাম করেন এবং কখনোই উদ্ধত ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী হন না (৫) তারা কুফর ও কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর ও শক্তিশালী থাকেন এবং নিজেদের মধ্যে সর্বদা রহমদিল ও আল্লাহ্র প্রতি বিনীত থাকেন (৬) তাঁরা যেকোন মূল্যে সুন্নাতকে আঁকড়ে থাকেন ও বিদ'আত হ'তে দূরে থাকেন (৭) তারা সর্বাবস্থায় সমবেতভাবে হাবলুল্লাহ বা আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ করে থাকেন এবং কখনোই সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হন না। কেউ তাদেরকে ছেড়ে গেলে সে অবস্থায় তারা আল্লাহ্র উপর ভরসা করেন ও তাঁর গায়েবী মদদ কামনা করেন।[১৫]

(৮) তারা খবরে ওয়াহেদের উপরে আমল করেন। আক্বীদা, আহকাম ও ফযীলত সহ দ্বীনের সকল ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহেদের উপরে আমল করা ওয়াজিব মনে করেন, যদি তা ছহীহ সনদে ও মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়।[১৬]

(৯) তারা কোন ব্যক্তির অন্ধ তাক্বলীদ ও গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে কেবল হাদীছের অনুসরণ করেন। সর্বক্ষেত্রে তাঁরা সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা ও তার উপরে আমল করার প্রতি আগ্রহী ও সচেষ্ট। এক্ষেত্রে বড় কোন ইমামের কথা সুন্নাত পরিপন্থী হ'লে তার কথাও তারা ত্যাগ করেন।[১৭]

(১০) যঈফ হাদীছের উপরে আমল করা থেকে বিরত থাকেন। আহকাম ও ফযীলত কোন ক্ষেত্রেই তারা যঈফ হাদীছের উপর আমল করাকে জায়েয মনে করেন না।[১৮]

আহলেহাদীছের নিদর্শন :

আহলেহাদীছদের কতিপয় অনন্য নিদর্শন নিম্নে উপস্থাপন করা হ'ল।-

(১) তারা আক্বীদা, ইবাদত ও আচরণে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের নীতির উপর দৃঢ় থাকেন এবং সর্বদা ছহীহ হাদীছের উপর আমল করেন। তারা মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করেন এবং আপোষে মহব্বতের সম্পর্ক অটুট রাখেন।

(২) তারা সকল বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে যান এবং সালাফে ছালেহীন ও মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণের মাসলাক অনুসরণে যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব দেন।

(৩) তারা ব্যাখ্যাগত মতভেদ-কে লঘু করে দেখেন এবং কখনোই তাকে দলীয় বিভক্তিতে পরিণত করেন না।

(৪) তারা সর্বদা উত্তম মুমিন হওয়ার জন্য চেষ্টিত থাকেন এবং এজন্য সর্বদা আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করেন।

(৫) তারা সুন্নাতপন্থী ইমাম, হাদীছের জ্ঞানসম্পন্ন আলেম ও তার সহায়তাকারী এবং হাদীছপ্রেমীদের সাথে মহব্বত ও হৃদ্যতা বজায় রাখে। পক্ষান্তরে তারা বিদ'আতী ইমাম, জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী ও জাহান্নামের দিকে পথ প্রদর্শনকারীদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করেন।[১৯]

আহলেহাদীছের বাহ্যিক নিদর্শন :

আহলেহাদীছদের বাহ্যিক নিদর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম আব্দুর রহমান ছাবূনী (৩৭২-৪৪৯ হিঃ) বলেন, (১) কম হউক বেশী হউক সকল প্রকারের মাদকদ্রব্য ব্যবহার হ'তে তারা বিরত থাকেন (২) ফরয ছালাতসমূহ আউয়াল ওয়াক্তে আদায়ের জন্য তারা সদা ব্যস্ত থাকেন (৩) ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতিহা পড়াকে তারা ওয়াজিব মনে করেন (৪) ছালাতের মধ্যে রুকূ-সুজূদ, ক্বিয়াম-কু'উদ ইত্যাদি আরকানকে ধীরে-সুস্থে শান্তির সঙ্গে আদায় করাকে তারা অপরিহার্য বলেন এবং এতদ্ব্যতীত ছালাত শুদ্ধ হয় না বলে তারা মনে করেন (৫) তারা সকল কাজে নবী (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের কঠোর অনুসারী হয়ে থাকেন (৬) বিদ'আতীদেরকে তারা ঘৃণা করেন। তারা বিদ'আতীদের সঙ্গে উঠাবসা করেন না বা তাদের সঙ্গে দ্বীনের ব্যাপারে অহেতুক ঝগড়া করেন না। তাদের থেকে সর্বদা কান বন্ধ রাখেন, যাতে তাদের বাতিল যুক্তিসমূহ অন্তরে ধোঁকা সৃষ্টি করতে না পারে'।[২০]

আহলেহাদীছ আন্দোলন ও অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য

আহলেহাদীছ আন্দোলন ও অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতিপয় পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। তার মধ্যে কয়েকটি দিক নিম্নে তুলে ধরা হ'ল।-

১. আক্বীদাগত দিক :

আক্বীদার অপর নাম ঈমান। যা হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যা আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও গোনাহে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। বিশ্বাস হ'ল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা। যা না থাকলে পূর্ণ মুমিন বা ইনসানে কামেল হওয়া যায় না।

খারেজীগণ বিশ্বাস, স্বীকৃতি ও কর্ম তিনটিকেই ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন। ফলে তাদের মতে কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী এবং তাদের রক্ত হালাল। যুগে যুগে সকল চরমপন্থী ভ্রান্ত মুসলমান এই মতের অনুসারী।

পক্ষান্তরে মুরজিয়াগণ কেবল বিশ্বাস অথবা স্বীকৃতিকে ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন। যা কোন কমবেশী হয় না। তাদের মতে আমল ঈমানের অংশ নয়। ফলে তাদের নিকট কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন। আমলের ব্যাপারে সকল যুগের মুরজিয়া বা শৈথিল্যবাদী ভ্রান্ত মুসলমানগণ এই মতের অধিকারী।

১৫. ফিরক্বা নাজিয়াহ, পৃঃ ৫৬।
১৬. মুহিব্বুদ্দীন আবু যায়েদ, খাছায়িছু আহলিল হাদীছ ওয়াস সুন্নাহ (আযহার : দারু ইবনুল জাওযী, ২০০৫ খ্রিঃ/১৪২২হিঃ), পৃঃ ১২৫।
১৭. ঐ, পৃঃ ১৩৫।
১৮. ঐ, পৃঃ ২০৮।
১৯. আবু ওছমান ইসমাঈল আছ-ছাবূনী, আক্বীদাতুস সালাফ আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ২৯।
২০. আব্দুর রহমান ছাবূনী, আক্বীদাতুস সালাফ আছহাবিল হাদীছ পৃঃ ৯৯-১০০।

আহলেহাদীছদের আক্বীদাহ হ'ল ঐ দুই চরমপন্থী খারেজী ও মুরজিয়ার মধ্যবর্তী। আহলেহাদীছদের মতে বিশ্বাস ও স্বীকৃতি হ'ল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা। তাই কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি আহলেহাদীছদের নিকটে কাফের নয় কিংবা পূর্ণ মুমিনও নয়। বরং ফাসেক মুসলমান। সে তওবা না করে মারা গেলেও চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। আর এটাই হ'ল পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর মত। আহলেহাদীছগণ আল্লাহ্র উপর ঈমান রাখেন 'রব' হিসাবে, ইলাহ হিসাবে, নাম ও গুণাবলী সহকারে। যা মাখলূকের নাম ও গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয়। আর এই নির্ভেজাল একত্ববাদকেই বলা হয় 'তাওহীদ'।

পক্ষান্তরে অন্যদের আক্বীদা ভেজাল মিশ্রিত। যেখানে আল্লাহকে নিরাকার, সর্বত্র বিরাজমান, রাসূলকে নূরের তৈরী, হাযির-নাযির বলা ইত্যাদি শিরকী আক্বীদা বিদ্যমান।

২. আমলের ক্ষেত্রে :

আমলের ক্ষেত্রে এ আন্দোলন শিরক-বিদ'আতের সাথে কোন আপোস করে না। পক্ষান্তরে অন্যান্য আন্দোলন অনুসৃত মাযহাব ও ইমামের রায় অনুযায়ী আমল করে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা কুরআন ও হাদীছের নির্দেশনাকে উপেক্ষা করে অনুসৃত মাযহাব ও ইমামের রায়কে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। যদিও তা ছহীহ হাদীছের বিরোধী হয়। অথচ ইমামগণ ছহীহ হাদীছকেই তাদের মাযহাব বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৩. অর্থনৈতিক দিক :

দেশে প্রচলিত সূদভিত্তিক অর্থনীতির বিপরীতে এ আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে সূদমুক্ত যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট। তারা সন্দিগ্ধ বিষয়গুলি থেকেও নিজেদেরকে দূরে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। তারা রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী 'সন্ধিগ্ধ বিষয়কে পরিহার করে সন্দেহমুক্ত জিনিসের দিকে ধাবিত হও' *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৭৭৩)*-কে সর্বদা স্মরণ রাখে। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইসলামী দল খাজনার জমিতে ওশর নেই, অর্ধ ছা' ফিৎরা প্রদান ইত্যাদি হাদীছ বিরোধী মাসআলা দিয়ে স্বচ্ছ ইসলামী অর্থনীতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলে।

৪. রাজনৈতিক দিক :

আহলেহাদীছ আন্দোলন দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজাতে চায়। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইসলামী আন্দোলন নিজেদের আচরিত মাযহাব ও অনুসরণীয় ইমামের রায়ের আলোকে দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়। আহলেহাদীছের রাজনীতি ইমারত ও খেলাফত তথা শূরা ভিত্তিক। অন্যান্যদের রাজনীতি গণতান্ত্রিক।

৫. লক্ষ্য-উদ্দেশ্য :

আহলেহাদীছ আন্দোলন ইহকালীন যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে। সুতরাং লক্ষ্য হ'ল পরকালীন। এজন্য তাদের যাবতীয় কর্মসূচী আখিরাতকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়। পক্ষান্তরে অন্যান্য আন্দোলন ও সংগঠনের লক্ষ্য পার্থিব স্বার্থসিদ্ধি, দলীয় উন্নয়ন ও যেকোন উপায়ে ক্ষমতা লাভ। পরকালীন বিষয়টি অনেকক্ষেত্রে তাদের নিকটে গৌণ থাকে।

৬. আন্দোলনের ক্ষেত্রে :

আহলেহাদীছ আন্দোলন নবী-রাসূলগণের আদর্শ অনুযায়ী ব্যক্তি ও পরিবার সংশোধনের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে কাজ করে। পক্ষান্তরে অন্যান্য আন্দোলন ক্ষমতা লাভ করে ব্যক্তি সংশোধনের স্বপ্ন দেখে। এ কারণে তারা কর্মীদের মাঝে বিদ্যমান শত ভুলকে ও সুন্নাতী আমল পরিত্যাগ করাকে তুচ্ছ জ্ঞান ও ছোটখাট বিষয় বলে মনে করে। আর ক্ষমতা লাভের জন্য অন্যের ভোট ভিক্ষা করে। অথচ ইসলামে নেতৃত্ব চেয়ে নেয়া হারাম।

৭. দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে :

আহলেহাদীছ আন্দোলন ইক্বামতে দ্বীন তথা তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য নবী-রাসূলগণের রেখে যাওয়া তরীকায় কাজ করে। তাদের নিকটে দ্বীন প্রতিষ্ঠার অর্থ হচ্ছে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা। পক্ষান্তরে অন্যান্য সংগঠন হুকুমত তথা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে। আর ব্যালট বা বুলেট যে কোন পদ্ধতিতে হোক যে কোন উপায়ে সেটা লাভের জন্য তারা মরিয়া ও উন্মুখ হয়ে থাকে।

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, আহলেহাদীছ আন্দোলনই দেশের একমাত্র নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন, যা আক্বীদার ক্ষেত্রে শিরকের বিরুদ্ধে আপোষহীন তাওহীদপন্থী এবং আমলের ক্ষেত্রে বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন সুন্নাতপন্থী। অতএব আসুন! আমাদের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্য আমরা এ আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী হই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

সংগঠনের গতিশীলতা বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা ও তা উত্তরণের উপায়

*শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম**

মানুষকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। তাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আসমানী কিতাবসহ অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। সৃষ্টির সেরা হিসাবে মানুষ তাঁরই ইবাদত করবে এটাই স্বাভাবিক। ইসলাম আল্লাহ মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। তাই ইসলামী বিধান ব্যতীত অন্য কোন মতাদর্শ গ্রহণের পরিণতি হবে ভয়াবহ। আল্লাহ প্রেরিত বিধান আপনা-আপনিই বাস্তবায়িত হয় না। প্রয়োজন হয় প্রচার ও আন্দোলনের। আর আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন হয় সংঘবদ্ধ জনসমষ্টির এবং সংগঠিত জনগণকে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয় সংগঠনের। সংগঠনের গতিশীলতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হ'লে সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না। একটি সংগঠনকে গতিশীল করতে যে সমস্ত কারণ বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং তা হতে উত্তরণের উপায় কি নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হ'ল।-

অযোগ্য ও অদক্ষ নেতৃত্ব : প্রকৃত অর্থে আদর্শহীন সংগঠন কোন সংগঠন নয়। আল্লাহ প্রদত্ত অহি-র বিধান ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুযায়ী যে সংগঠন পরিচালিত হয়, সেটাকেই আদর্শ সংগঠন বলা যায়। এ ধরনের সংগঠনের অগ্রগতির সবচেয়ে বড় বাধা হ'ল অযোগ্য নেতৃত্ব। অযোগ্য ও অদক্ষ ড্রাইভার যেমন একটা মোটর গাড়িকে গন্তব্যে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়, তেমনি একজন অযোগ্য ও অদক্ষ নেতা সংগঠনের গতিশীলতায় কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না। সেজন্য প্রয়োজন একজন যোগ্য ও দক্ষ নেতার। অযোগ্য নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِه، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ- 'যখন আমানত বিনষ্ট হবে তখন ক্বিয়ামতের অপেক্ষা করবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কিভাবে আমানত বিনষ্ট হবে? উত্তরে তিনি বললেন, যখন কোন দায়িত্ব অযোগ্য ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা হবে তখন ক্বিয়ামতের অপেক্ষা করবে'।[১]

পদলোভী হওয়া : একজন ব্যক্তি নিজেকে যতই যোগ্য মনে করেন না কেন, তিনি নিজেই নিজেকে নেতা ঘোষণা দিতে পারেন না। ইসলামী শরী'আতে এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّا وَاللهِ لاَ نُوَلِّى عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلاَ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ 'আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে এমন কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করব না, যে তা পাওয়ার জন্য প্রার্থী হবে। অথবা এমন কাউকেও নয়, যে তা পাওয়ার জন্য লালায়িত হবে'।[২] উপরন্তু নেতৃত্ব চেয়ে নিলে তাতে কোন কল্যাণ থাকে না। বরং না চাইতেই যদি অর্পিত হয়, তাহ'লে তাতে আল্লাহ্‌র রহমত ও কল্যাণ বিদ্যমান থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا- 'তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিয়ো না। কেননা নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়ার কারণে তা প্রাপ্ত হ'লে তোমার উপর তা চাপিয়ে দেওয়া হবে। আর নেতৃত্ব না চেয়ে প্রাপ্ত হ'লে তুমি তাতে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে'।[৩]

আনুগত্যহীনতা : নেতৃত্বের প্রতি কর্মীদের আনুগত্যহীনতা সংগঠনের গতিশীলতা ও অগ্রগতিতে চরম অন্তরায় সৃষ্টি করে। যে সংগঠনের কর্মীরা নেতার প্রতি যত আনুগত্যশীল সে সংগঠন তত বেশী মযবুত ও গতিশীল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের আনুগত্য কর'... *(নিসা ৪/৫৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِى، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِى- 'যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল। যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করল। যে ব্যক্তি আমীরের (নেতা) আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল'।[৪] নেতা যদি নাফরমানির নির্দেশ ব্যতীত কোন নির্দেশ দেন এবং সে নির্দেশ যদি কারো অপসন্দ হয়, তথাপিও সে নির্দেশ মানতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ 'প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হচ্ছে নেতার নির্দেশ শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা চাই সে নির্দেশ তার পসন্দ হোক বা অপসন্দ হোক; যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র নাফরমানির নির্দেশ দেয়া হয়। যখন আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হবে, তখন আমীরের কথা শোনা যাবে না ও তাঁর আনুগত্য করা যাবে না'।[৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, لاَ طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ- 'গোনাহের কাজে

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, পাইকগাছা কলেজ, খুলনা।

১. বুখারী হা/৬৪৯৬; মিশকাত হা/৫৪৩৯।

২. বুখারী হা/৭১৪৯; মুসলিম হা/১৭৩৩; মিশকাত হা/৩৬৮৩।

৩. বুখারী হা/৬৬২২; মুসলিম হা/১৬৫২; মিশকাত হা/৩৬৮০।

৪. বুখারী হা/২৯৫৭; মুসলিম হা/১৮৩৫; মিশকাত হা/৩৬৬১।

৫. বুখারী হা/৭১৪৪; মুসলিম হা/১৮৩৯; মিশকাত হা/৩৬৬৪।

আনুগত্য করা যাবে না; বরং আনুগত্য শুধুমাত্র ন্যায়সংগত কাজে'।[৬] তিনি অন্যত্র বলেন, لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই'।[৭]

নেতার উত্তম ব্যবহারের অনুপস্থিতি : কর্মীদের প্রতি নেতার ব্যবহার যদি ভাল না হয়, তাহ'লে সংগঠন ক্ষতিগ্রস্থ হবে। নেতা ও কর্মীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে সংগঠনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। নেতার রূঢ় আচরণে কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। সেজন্য নেতাকে উত্তম আদর্শ ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হ'তে হয়। এ বিষয়ের প্রতি নেতার সর্বদা দৃষ্টি রাখা দরকার। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে মহান আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণীর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ 'আর আল্লাহ্র রহমতের কারণেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয়ের হ'তে তাহ'লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

সংগঠনে নেতার আচার-ব্যবহারে কর্মীরা যেন কোন অবস্থাতেই দুঃখ-কষ্ট না পায়, সেদিকে নেতাকে সর্বদা খেয়াল রাখা অতীব প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَللَّهُمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ 'হে আল্লাহ! আমার উম্মতের সামষ্টিক কাজের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি তাদেরকে কষ্টে ফেলে তবে তুমি তাকে কষ্টে ফেলো। আর সে যদি তাদের প্রতি নম্রতা অবলম্বন করে তাহ'লে তুমিও তার প্রতি নম্রতা অবলম্বন করো'।[৮]

পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ না করা : সংগঠন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে সংগঠনের নেতা যদি পরামর্শ ছাড়াই কাজ করেন তাহ'লে সংগঠনে গতিশীলতা আসবে না। মজলিসে শূরার সদস্যগণ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহকে সামনে রেখে খোলা মনে সংগঠনের অগ্রগতির স্বার্থে তাদের সুচিন্তিত যুক্তিপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করবেন। কারো মুখের দিকে তাকিয়ে নয় বা কারো স্বার্থ রক্ষার জন্য নয় বা কেউ অসন্তুষ্ট হবেন এ চিন্তায় বা কারো ভয়ে মত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকার অর্থ হ'ল সংগঠনকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। যা প্রত্যেক শূরা সদস্যকে পরিহার করা একান্ত দরকার। অপরদিকে নিজ মতামত অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিসংগত মতকে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য প্রত্যেক শূরা সদস্যকে প্রস্তুত থাকতে হবে। এক্ষেত্রে কোন প্রকার যিদ করা যাবে না। পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করায় নেতার স্বেচ্ছাচারী হওয়ার সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। পরামর্শভিত্তিক কাজ করার গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ 'তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং যরূরী বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন তুমি সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَكْثَرَ اسْتِشَارَةً لِلرِّجَالِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'আমি এমন কোন ব্যক্তিকে দেখিনি, যিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অপেক্ষা বেশী পরামর্শ করতেন'।[৯]

নিবেদিতপ্রাণ কর্মীর অভাব : নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদা-বিশ্বাসের অধিকারী কর্মী বাহিনীর অভাবে সংগঠনের গতিশীলতা বাধাগ্রস্ত হয়। এ থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হ'ল- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর উপর পূর্ণ বিশ্বাসী হক গ্রহণে যাদের অন্তরে থাকবে না কোন প্রকার দ্বিধা-সংকোচ, তেমনি ধরনের একদল নিবেদিতপ্রাণ কর্মী বাহিনী। যারা পালন করবে শরী'আত অনুমোদিত সৎকর্মসমূহ। সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় ধৈর্যধারণে থাকবে অবিচল। তারা হবে না ক্ষতিগ্রস্ত। পরিনামে পাওয়া যাবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রহমত ও সাহায্য। আল্লাহ বলেন, 'কালের শপথ! নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা ব্যতীত যারা (জেনে-বুঝে) ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে এবং পরস্পরকে 'হক'-এর উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্য্যের উপদেশ দিয়েছে' *(আছর ১০৩/১-৩)*।

সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকা : সকল পর্যায়ের কর্মী ও দায়িত্বশীলদের সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে সংগঠনের অগ্রগতি আদৌও সম্ভব নয়। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অভাবে যে কোন সময় যে কোন কর্মী ও দায়িত্বশীল সংগঠন থেকে নিমিষেই ছিটকে পড়তে পারে। তাই বিশেষ করে সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও কর্মসূচী সম্পর্কে প্রত্যেকেরই স্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সংগঠনের কর্মী ও দায়িত্বশীলদের মনে সংশয় থাকলে সংগঠনের অগ্রগতি হবে বাধাগ্রস্ত এবং ফাটল ধরবে সংগঠনিক মযবুতিতে। আল্লাহ বলেন, 'বলুন! এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র। আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*।

যুগোপযোগী পরিকল্পনার অভাব : দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে কর্মীদের জন্য যুগোপযোগী কর্মপন্থা প্রদান না করলে সংগঠনের প্রতি কর্মীদের আকৃষ্ট করা, আস্থাশীল রাখা ও সর্বদা সাংগঠনিক কাজে নিয়োজিত রাখার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হয়। এজন্য উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলদের অধঃস্তন কর্মীদের সর্বদা খোঁজ-খবর রাখা একান্ত প্রয়োজন। কোন প্রকার সমস্যার সৃষ্টি হ'লে দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা করা দরকার।

---

৬. *বুখারী হা/৭২৫৭; মুসলিম হা/১৮৪০; মিশকাত হা/৩৬৬৫*।
৭. *শারহুস সুন্নাহ; মিশকাত হা/৩৬৯৬*।
৮. *মুসলিম হা/১৮২৮; মিশকাত হা/৩৬৮৯*।
৯. *শারহুস সুন্নাহ ১/৮৪৯ পৃঃ*।

দায়িত্বশীলদের সাংগঠনিক সফর, সর্বদা যোগাযোগ রাখা এবং সকলের মানোন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড অব্যাহত না রাখলে সংগঠনের অগ্রগতি ব্যাহত হবে। একে অপরের সাথে সুদৃঢ় বন্ধন নষ্ট হবে। ফলে সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

দায়িত্বশীলদের যথাযথ মূল্যায়ন না করা : সংগঠনের মধ্যে দায়িত্বশীলদের যথাযথ মূল্যায়ন না করা হ'লে সংগঠনের অগ্রগতি সম্ভব হয় না। দায়িত্বশীলদের মধ্যে সকলের সমান যোগ্যতা ও মেধা থাকে না। তাদের যোগ্যতা ও মেধানুযায়ী সংগঠনের প্রতি আন্তরিক হয়ে দায়িত্ব পালন করলে তার যথাযোগ্য মূল্যায়ন করা দরকার। তাতে কর্মীদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পায় এবং অর্পিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকে। ফলে সংগঠনের অগ্রগতি সাধিত হয়। সাথে সাথে দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন।

যোগ্যতা অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদান না করা : কর্মীদের যোগ্যতা অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদান না করলে সংগঠনের অগ্রগতি সম্ভব নয়। যোগ্য কর্মীকে বাদ দিয়ে অযোগ্য কর্মীকে দায়িত্ব দিলে মানুষ হিসাবে যোগ্য কর্মীর মন ভেঙ্গে যায়। ফলে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা সৃষ্টি হয়। সাথে সাথে নেতৃত্বের প্রতি কর্মীদের আনুগত্য ও শ্রদ্ধা লোপ পায়। যোগ্য কর্মীদের মাঝে হতাশার সৃষ্টি হয় এবং অযোগ্য কর্মীদের মধ্যে অহংকারবোধ দেখা দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আমানত সমূহ তার হকদারের উপর অর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছেন...' *(নিসা ৪/৫৮)*।

ধৈর্য ধারণে অভ্যস্ত না হওয়া : ছবর বা ধৈর্য হ'ল সফলতার চাবিকাঠি। তাই সংগঠনের সকল পর্যায়ের কর্মী ও দায়িত্বশীলদের ধৈর্য ধারণের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সুখ-শান্তি, দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদে এক কথায় সর্বাবস্থায় ধৈর্য ধারণ করা মুমিনের লক্ষণ। ধৈর্যের গুণে গুণান্বিত হতে না পারলে কোন কাজ করা সম্ভব নয়। তাই সংগঠনের অগ্রগতিতে অর্পিত দায়িত্ব ধৈর্য সহকারে সম্পাদন করা একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ '(মুমিন হল তারা) যারা অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ছবরকারী। তারাই হ'ল সত্যাশ্রয়ী আর তারাই মুত্তাকী' *(বাক্বারাহ ২/১৭৭)*।

নিরাশ হওয়া ও তড়িৎ ফলাফলের আশা করা : সাংগঠনিক অগ্রগতির একটা বড় অন্তরায় হ'ল কর্মীদের মাঝে নিরাশ হওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি হওয়া। আর হতাশার সৃষ্টি হয় তখন, যখন কেউ আন্দোলন-সংগ্রামের তড়িৎ ফলাফল আশা করে। অন্যদের দুনিয়াবী জৌলুসে প্রতারিত হয় এবং পরস্পরের আমানতে সন্দেহ পোষণ করে। সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞানের অপর্যাপ্ততা এবং সংগঠন কি চায়, কেন চায়, কিভাবে চায়? এসব বিষয়ে জ্ঞানের অভাবে দিনে দিনে কর্মীরা দুর্বল হয়ে পড়ে, যা পরিহার করা একান্ত আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 'তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তান্বিত হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হও' *(আলে ইমরান ৩/১৩৯)*। আল্লাহ আরও বলেন, أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِيْنَ 'তোমরা কি ভেবেছ জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ এখনো জেনে নেননি কারা তোমাদের মধ্যে জিহাদ করেছে এবং কারা তোমাদের মধ্যে ধৈর্যশীল? *(আলে ইমরান ৩/১৪২)*।

অহংকার ও প্রশংসার আকাংখী হওয়া : অহংকার ধ্বংসের মূল। সকল অসৎগুণের মধ্যে সবচেয়ে বড় অসৎগুণ হচ্ছে অহংকার ও অন্যের প্রশংসার প্রত্যাশী হওয়া। যা শয়তানের কাজ ছাড়া অন্য কিছু নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِيَاءَ 'যার অন্তরে সরিষাদানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[১০]

মানুষের যত প্রকার ত্রুটি আছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি হ'ল নিজেকে বড় মনে করা। আর এটা যখন কারো মধ্যে জাগ্রত হয়, তখন সে নিজেকে খুব বড় জ্ঞানী ও গুণসম্পন্ন মনে করে ও অন্যরা তাকে সর্বাপেক্ষা বড় জ্ঞানী ও যোগ্য মনে করুক এটা প্রত্যাশা করে এবং এর থেকে মুক্ত হওয়ার পথ বন্ধ করে দেয়। সকলে তার প্রশংসা করুক এটা সে কামনা করে এবং সংশোধনের জন্য কেউ তার দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে কিছু বললে সে তা মোটেই সহ্য করতে পারে না। উপরন্তু যারা তার দোষ-ত্রুটির কথা বলে তাদের প্রতি সে খারাপ ধারণা পোষণ করে ও রাগান্বিত হয়। সংগঠনের অগ্রগতির জন্য নেতা ও কর্মীদের নিকট থেকে এটা গ্রহণীয় নয়।

নেতা ও কর্মীদের মধ্যে সুদৃঢ় সম্পর্ক না থাকা : যে সমস্ত কাজ নেতা ও কর্মীদের মধ্যকার সুদৃঢ় বন্ধন নষ্ট করে দেয় সে সকল কাজ পরিহার করা সংগঠনের অগ্রগতির জন্য খুবই প্রয়োজন। নেতা সর্বদা নিজ দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করবেন এবং কথা ও কাজের মধ্যে মিল রাখার জন্য সচেষ্ট হবেন। সাথে সাথে কর্মীদেরকেও নেতার আস্থাশীল হওয়ার জন্য অর্পিত দায়িত্ব সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে হবে। তাহ'লে উভয়ের মাঝে সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে ও সংগঠনের অগ্রগতি সাধিত হবে। কোন অবস্থাতেই তৃতীয় পক্ষ চক্রান্ত করে উভয়ের মধ্যে যেন ফাটল সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

সাংগঠনিক শৃংখলা বজায় না রাখা : বিশৃংখলভাবে কাজ করার মধ্যে সংগঠনের ক্ষতি অনিবার্য। ঊর্ধ্বতন থেকে অধঃস্ত ন অনুরূপ অধঃস্তন থেকে ঊর্ধ্বতন সকল ক্ষেত্রে নিয়ম-শৃংখলা (Chain of Command) মেনে কাজ না করলে সংগঠনের অগ্রগতি কোনভাবে সম্ভব নয়। তাই সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীদের সর্বাবস্থায় সাংগঠনিক শৃংখলা মেনে চলা একান্ত কর্তব্য।

---

১০. *মুসলিম হা/৯১; মিশকাত হা/৫১০৭*।

Contents

আত্মবিশ্বাসের অভাব ও আপোষহীন মনোভাব : সংগঠনের সকল স্তরের কর্মী ও দায়িত্বশীলদের আপোষকামী মনোভাব ও আত্মবিশ্বাসের অভাবে সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আত্মবিশ্বাসের অভাবে নিজকে যোগ্য করে গড়ে তোলা এবং নেতৃত্ব দানের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করা যায় না। দায়িত্ব সচেতনতা বা দায়িত্ব পালনে আন্তরিক ও যত্নবান হওয়া এবং নিজেকে বিশ্বস্ত ও আমানতদার হিসাবে গড়ে তোলার মাধ্যমে আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। বেশী বেশী সৎ কাজ ও সকল প্রকার অন্যায় কাজ পরিহার করে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা রেখে ধৈর্যসহ হকের উপর অবিচল থেকে বাতিলের সাথে আপোষকামী মনোভাব পরিহার করে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হ'লে সংগঠনের অগ্রগতি সাধিত হবে।

দ্বিমুখী স্বভাব ও প্রতিশোধ পরায়ণতা : 'দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথায় কখনো ভুলো না'- কথাটি প্রবাদ হিসাবে ব্যবহৃত হ'লেও বাস্তবতা সত্য। যারা হক ও বাতিল উভয়ের পক্ষপাতী তারা সংগঠনের অগ্রগতির পথে চরম অন্তরায়। দ্বিমুখী চরিত্রের অধিকারী মানুষ স্বভাবতই প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে থাকে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য এরা যেকোন ধরনের কাজ করতে পিছপা হয় না। সংগঠনের স্বার্থের চেয়ে নিজের স্বার্থকে সর্বদা বড় করে দেখে। যে কারণে তারা সংগঠনের সাথে বা নেতা-কর্মীদের সাথে সম্পর্ক রাখলেও তাদের একটা গোপন চেহারা থাকে, যা তাড়াতাড়ি প্রকাশ পায় না। তবে কোন না কোন সময় এদের দ্বিমুখী নীতি ধরা পড়ে যায়। তখন সংগঠনের অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। এদের থেকে দূরে থাকা একান্ত প্রয়োজন।

সংগঠনের স্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত থাকা : সংগঠনপ্রিয় প্রত্যেকে সর্বদা সংগঠনের স্বার্থ তথা সংগঠনের অগ্রগতির স্বার্থে নিবেদিতপ্রাণ না হ'লে সংগঠন গতিশীল হয় না। সংগঠনের মধ্যে এমন কিছু মানুষ থাকে যারা সংগঠন বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকে। তারা সংগঠনকে ধ্বংসের জন্য বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রমাণাদিসহ কিছু বললে তারা তা মানতে চায় না। ক্ষেত্রবিশেষে অস্বীকারও করে বসে। চোখে আঙ্গুল দিয়ে সংগঠনের স্বার্থ বিরোধী কাজ দেখিয়ে দিলেও বিভিন্ন অজুহাতে তা এড়িয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা চালায়। এরা সুবিধাবাদী। এদের থেকে সাবধান হওয়া দরকার। সংগঠনের কল্যাণকামী কর্মী যে যেকোন অবস্থাতেই সংগঠনের কোন ক্ষতি হোক এমন ধরনের কাজ করবে না।

পারস্পরিক মতবিরোধে লিপ্ত থেকে সাংগঠনিক ঐক্য বিনষ্ট করা : পরস্পরে মতবিরোধে লিপ্ত থাকার অর্থ হ'ল নিজেদের ধ্বংস করা। সংগঠনের কাজ করার ক্ষেত্রে নেতা-কর্মীদের পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করার মধ্যে যেমন কল্যাণ নিহিত আছে, তেমনি পরস্পরের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলে ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। ফলে সাংগঠনিক ঐক্য বিনষ্ট হবে। সেই সাথে সুবিধাবাদীরা স্বার্থ হাছিলের সুযোগ পেয়ে যাবে। সেজন্য সাংগঠনিক অগ্রগতি ও ঐক্যের স্বার্থে প্রত্যেকের যেকোন ধরনের মতপার্থক্য থেকে দূরে থাকা উচিৎ।

ব্যর্থতার দায় স্বীকার না করা : ব্যর্থতার দায় কেউ স্বীকার করতে চায় না। এটা মানুষের স্বভাব। সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সর্বদা সফলতা আশা করা ঠিক নয়। কখনো কখনো ব্যর্থতাও থাকে। একজন কর্মীর বড় সফলতা হ'ল ব্যর্থতার দায় স্বীকার করা ও এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা। আর কুরআন-হাদীছ মোতাবেক পরিচালিত সংগঠনের প্রত্যেক স্তরের নেতা-কর্মীর উচিৎ সংগঠনের অগ্রগতির স্বার্থে খালেছ নিয়তে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করা। আর সফলতার দায়িত্ব আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত করা। তাতে মনে কোন গ্লানি থাকে না বরং প্রশান্তি আসে।

সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত না মেনে হঠকারী আচরণ প্রকাশ করা : সেই প্রকৃতপক্ষে সফল কর্মী যে সংগঠনের স্বার্থে সাংগঠনিক সকল প্রকার সিদ্ধান্ত মাথা পেতে মেনে নেয়। এর পরিণতি এমনও হ'তে পারে যে, সে সিদ্ধান্ত না মেনে হঠকারী আচরণ করায় সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'লে বিনয়ের সাথে নিজ মতামত ব্যক্ত করা ভাল। মনের মধ্যে কোন কালিমা গোপন রেখে সংগঠনের ক্ষতির উদ্দেশ্যে কোন প্রকার গোপন তৎপরতা চালানো একজন নিষ্ঠাবান কর্মীর কাজ নয়। তাতে সম্মান বৃদ্ধি পায় না। উপরন্তু নিজের যদি বা হঠকারী আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটালে সকলের কাছে হাস্যোস্পদ হ'তে হয়। ক্ষেত্রবিশেষে চরম অপমানিত হ'তে হয়। যদিও তা সে নিজে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না।

স্রেফ সংশোধনের উদ্দেশ্য ব্যতীত সমালোচনা করা : সংশোধনের উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে ভুল-ত্রুটির সমালোচনা করায় কোন দোষ নেই। তবে তা করতে হবে সংগঠনের নিয়মানুযায়ী। না বুঝে অন্ধের মত সরল মনে যতই সঠিকভাবে কাজ করা হোক না কেন তা অনেক সময় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পারস্পরিক পর্যালোচনা না থাকলে ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় না। যেখানে দুর্বলতার প্রতি নযর দেয়ার কেউ থাকে না সেখানে নীরবতার কারণে গাফিলতি বা অক্ষমতা সব ধরনের দুর্বলতার আশ্রয়স্থলে পরিণত হয় এবং পরবর্তীতে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পারস্পরিক পর্যালোচনার মাধ্যমে যথাসময়ে দোষ-ত্রুটি উৎঘাটন করা সম্ভব হয় এবং সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানো যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে সমালোচনার উদ্দেশ্য দোষ বের করা নয়; বরং আন্তরিকভাবে সংশোধন চাওয়া। এক্ষেত্রে পর্যালোচনাকারীকে যথার্থ সমালোচনার পদ্ধতি মেনে আলোচনা করা। কারণ একজন দোষ অন্বেষণকারীর খারাপ নিয়তে অসময়োচিত ও বাজে সমালোচনা সংগঠনকে ক্ষতির মধ্যে ফেলে দেয়। প্রত্যেক নেতা-কর্মীকে এ ধরনের কর্মকাণ্ড পরিহার করা একান্ত অপরিহার্য কর্তব্য।

আমানতদার না হওয়া : আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকের লক্ষণ। চাই তা অর্থের হোক বা কথা ও কাজের হোক। সকল প্রকার আমানত যথাযথভাবে রক্ষা করা প্রত্যেক নেতা-কর্মীর পবিত্র দায়িত্ব। আমানত রক্ষার ব্যাপারে রাসূল বলেন, لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ 'যার আমানাত নেই তার

Contents

ঈমান নেই'।[১১] তিনি আরো বলেন, أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. 'যে ব্যক্তি তোমার কাছে আমানত রেখেছে তাকে সময় মত আমানত বুঝিয়ে দাও। আর যে তোমার খিয়ানত করে তার খিয়ানত করো না'।[১২]

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, কোন মহৎ লক্ষ্য অর্জনে সংগঠন প্রতিষ্ঠার চেয়ে সংগঠনকে লক্ষ্য অর্জনে গতিশীল করাই মূল কাজ। যেমন স্বাধীনতা অর্জন করা সহজ। কিন্তু যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা লাভ করা হয় তা টিকিয়ে রাখা খুবই কঠিন। ঠিক তেমনি একটা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা সহজসাধ্য হ'লেও সংগঠনকে স্বীয় লক্ষ্যে চলমান রাখাই মূল চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জে বিজয়ী হ'তে হ'লে সংগঠনের সকল পর্যায়ের কর্মী ও দায়িত্বশীলকে খালেছ অন্তরে কঠিনভাবে শপথ করতে হবে এবং দো'আ করতে হবে যে, হে আল্লাহ! আমাদের প্রত্যেকটি কাজ যেন স্রেফ তোমার সন্তুষ্টির জন্য হয় এবং আমাদের কোন কাজ যেন সংগঠনের ক্ষতির কারণ না হয়। আল্লাহ আমাদের সকলকে সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

১১. *বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৩৫ 'ঈমান' অধ্যায় সনদ হাসান।*
১২. *তিরমিযী, আবূদাউদ, দারেমী, মিশকাত হা/২৯৩৪, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায় হাদীছ ছহীহ।*

Contents

সমাজ সংস্কারে আত-তাহরীক-এর ফৎওয়া সমূহের ভূমিকা

*ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন**

'ফৎওয়া' মুমিন জীবনের অন্যতম প্রধান অনুসঙ্গ। যেকোন জিজ্ঞাসার জবাবে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে শরী'আতের বিধান বর্ণনা করাকে ফৎওয়া বলে। পবিত্র কুরআনে 'ফৎওয়া' শব্দটি ৯টি আয়াতে মোট ১১ বার এসেছে। মহান আল্লাহ নিজের শানেও ফৎওয়া শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যেমন- তিনি বলেন, يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ 'লোকেরা তোমার নিকট ফৎওয়া জানতে চাচ্ছে। তুমি বলে দাও, আল্লাহ তোমাদেরকে 'কালালাহ'-র (পিতা-পুত্রহীন ব্যক্তির) সম্পত্তি বণ্টন সম্পর্কে ফৎওয়া দিচ্ছেন' *(নিসা ৪/১৭৬)*। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ প্রদত্ত এলাহী বিধানের আলোকে সমাজ সংস্কারে ফৎওয়া প্রদান করেছেন। পরবর্তীতে ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম, তাবে তাবেঈন এবং তৎপরবর্তী বিভিন্ন খলীফাদের আমলেও ফৎওয়া প্রদান অব্যাহত ছিল। যুগ পরম্পরায় বর্তমানে ফৎওয়া প্রদানের ব্যাপকতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, আজকাল যত্রতত্র এমন সব মুফতী দেখা যাচ্ছে, যারা কুরআন-হাদীছের যথার্থ জ্ঞান ছাড়াই ফৎওয়া দিয়ে থাকে। ফলে ভুল ফৎওয়ার জালে আটকা পড়ে বিভ্রান্ত হচ্ছে অসংখ্য মানুষ।

বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাসিক 'আত-তাহরীক' প্রকাশের ১ম সংখ্যা থেকে নিয়মিত প্রকাশ হ'তে থাকে 'প্রশ্নোত্তর বিভাগ'। ছহীহ দলীল ভিত্তিক যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব সন্নিবেশিত হয় অত্র বিভাগে। আলোচ্য নিবন্ধে আত-তাহরীক-এর ফৎওয়া বিভাগ ও সমাজ সংস্কারে তার প্রভাব ও ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।-

দারুল ইফতা গঠন :

১ম সংখ্যা থেকে মাত্র ৩টি ফৎওয়া দিয়ে 'আত-তাহরীক'-এর 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগ তার যাত্রা শুরু করে। ১ম সংখ্যায় ৩টি, ২য় সংখ্যায় ১০টি। অতঃপর ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর'৯৮ হ'তে ১৫টি, একই বর্ষ ৮ম সংখ্যা জুন'৯৯ হ'তে ২৫টি, ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর'৯৯ হ'তে ৩০টি, ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর'২০০০ হ'তে ৩৫টি ও ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা জানুয়ারী'০৩ হ'তে নিয়মিত ৪০টি করে প্রশ্নোত্তর প্রকাশিত হ'তে থাকে। যা অদ্যাবধি চলছে। সমৃদ্ধ হচ্ছে ফৎওয়ার ভাণ্ডার। ইতিমধ্যে পুনরুল্লেখ সহ সর্বমোট প্রকাশিত ফৎওয়ার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৯১০টি (মার্চ'১৬ সহ)।

শুরুতে আত-তাহরীক এর কোন ফৎওয়া বোর্ড ছিল না। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** পরে কেন্দ্রীয় ফৎওয়া বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে লক্ষ্যে বিগত ১৫.৯.৯৮ইং তারিখে অনুষ্ঠিত 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর পরিচালনা কমিটির ১৩নং বৈঠকের ৯নং সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠিত হয় কেন্দ্রীয় ফৎওয়া বোর্ড 'দারুল ইফতা'। মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সভাপতিত্বে ফৎওয়া বোর্ডে সে সময় যাদেরকে সদস্য করা হয় তারা হ'লেন, ২. আব্দুছ ছামাদ সালাফী (নওদাপাড়া মাদ্রাসা) ৩. আব্দুর রাযযাক সালাফী (নওদাপাড়া মাদ্রাসা) ৪. আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (ঐ) ৫. সাঈদুর রহমান (ঐ) ৬. আখতারুল আমান (ঐ, ঠাকুরগাঁও) ৭. শিহাবুদ্দীন সুন্নী (গাইবান্ধা) ৮. আব্দুর রশীদ (গাইবান্ধা)।

উল্লেখ্য যে, প্রথম গঠিত বোর্ডের সদস্যদের অনেকেই এখন আর সদস্য নেই। পরবর্তীতে উক্ত বোর্ডের সদস্য করা হয় প্রবীণ আলেম মাওলানা বদীউযযামান (রাজশাহী) ও আব্দুল খালেক সালাফী (নওগাঁ)-কে। মাওলানা বদীউযযামান ছাহেব গত ১৪ নভেম্বর'১২ তারিখে ইন্তিকাল করেন *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন)*। বর্তমানে আরো যারা ফৎওয়া বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট আছেন তারা হচ্ছেন- মুযাফফর বিন মুহসিন (রাজশাহী), হাফেয আখতার মাদানী (সঊদী আরব), আকমাল হোসাইন (দক্ষিণ আফ্রিকা), শরীফুল ইসলাম (বাহরাইন) প্রমুখ। এতদ্ব্যতীত হাদীছ ফাউণ্ডেশন গবেষণা বিভাগের গবেষণা সহকারীগণ সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন এই বিভাগে। উল্লেখ্য যে, দেশে আহলেহাদীছ জামা'আতের এটিই প্রথম ফৎওয়া বোর্ড।

পরবর্তীতে 'গবেষণা বিভাগ' প্রতিষ্ঠিত হয় ১লা ডিসেম্বর ২০১০-য়ে। এটিও ছিল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দেশে প্রথম। এরপরে ২০১৩ সালের জুলাইয়ে চালু হয় 'ফৎওয়া হটলাইন'। এটিও ছিল দেশে প্রথম। *ফালিল্লাহিল হামদ।* হট লাইনে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে যেকোন ব্যক্তি ফোন করে তার উত্তর জেনে নিতে পারেন। যা আজও অব্যাহত আছে।

যেভাবে প্রস্তুত হয় আত-তাহরীক-এর ফৎওয়া :

প্রথমে প্রাপ্ত প্রশ্নগুলি বাছাই করা হয়। কেননা প্রতিনিয়ত ডাক, ইমেইল, ফৎওয়া হটলাইন, এসএমএস ইত্যাদির মাধ্যমে বহু প্রশ্ন জমা হয় অত্র বিভাগে। বাছাইয়ে বিশেষত প্রশ্নের মান, গুরুত্ব ও অল্প সময়ের ব্যবধানে প্রকাশ হয়েছে কি-না ইত্যাদি বিষয় দেখা হয়। অতঃপর বাছাইকৃত প্রশ্নগুলি সদস্যগণের মধ্যে ভাগ করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রবাসী সদস্যগণের নিকটে ই-মেইলের মাধ্যমে এবং অন্যান্যদের নিকটে হাতে হাতে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উত্তর পাওয়ার পর প্রথমে কম্পোজ করা হয়। তারপর গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রাথমিক সম্পাদনার পর ফৎওয়া বোর্ডে পেশ করা হয়। অতঃপর নির্ধারিত দিনে ফৎওয়া বোর্ডের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দারুল ইফতা প্রধান মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নেতৃত্বে উপস্থিত সদস্যগণ এবং আত-তাহরীক-এর সম্পাদকমণ্ডলী সেখানে উপস্থিত থাকেন। প্রত্যেকটি ফৎওয়ার চুলচেরা বিশ্লেষণ হয় সেখানে। তাহকীকী পর্যালোচনার ফলে একক চিন্তার আলোকে লিখিত অনেক ফৎওয়ার চেহারাই পাল্টে যায়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণ

ফৎওয়াই পরিবর্তন হয়ে যায়। প্রত্যেকটি ফৎওয়ার পিছনে ব্যয় হয় বিস্তর সময় ও শ্রম। কোন মাসআলায় ইখতেলাফ হ'লে পুনরায় কিতাবপত্র দেখা হয় এবং ভুল থাকলে সংশোধন করা হয়। কোন মাসআলায় একমত হওয়া সম্ভব না হ'লে সেটি পরবর্তী বোর্ডের জন্য রেখে দিয়ে সংশ্লিষ্ট লেখককে এবং গবেষণা বিভাগকে পুনরায় এ বিষয়ে তাহকীক করতে বলা হয়। এভাবে দীর্ঘ সময় ধরে চলে ফৎওয়া দানের প্রক্রিয়া। অতঃপর সকলের সম্মতিতে বোর্ডে পাশ হওয়া ফৎওয়াগুলিই আত-তাহরীকে প্রকাশের জন্য মনোনীত হয়। সবশেষে ফৎওয়া বোর্ডের মাননীয় পরিচালক মুহতারাম আমীরে জামা'আতের চূড়ান্ত সংশোধন ও পরিমার্জনের পর তা আত-তাহরীকে ছাপা হয়। এরপরেও যদি কোন ভুল ধরা পড়ে বা পাঠকদের কেউ দৃষ্টিতে এনে দেন, তাহ'লে পুনরায় বোর্ডে আলোচনার পর সেটি গৃহীত হ'লে পরবর্তী কোন সংখ্যায় 'সংশোধনী' আকারে তা প্রকাশ করা হয়। যা ইতিমধ্যে অনেক বিদ্বানের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

সমাজ সংস্কারে আত-তাহরীক-এর ফৎওয়া

আত-তাহরীক-এর বিশেষত্ব এখানেই যে, আত-তাহরীক বিনা দলীলে কোন কিছুই প্রকাশ করে না। পাশাপাশি জাল ও যঈফ দলীল থেকেও নিজেকে বিরত রাখে। কেননা মিথ্যা হাদীছ বর্ণনা থেকে সাবধান করে রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়'।[১]

আত-তাহরীকের ফৎওয়ার বৈশিষ্ট্য :

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুখপত্র হিসাবে আত-তাহরীক সর্বদা পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী ফৎওয়া দিয়ে থাকে। প্রয়োজনবোধে প্রাচীন ও আধুনিক সুন্নী মুজতাহিদ বিদ্বানগণের সিদ্ধান্ত যাচাই করা হয়। অতঃপর যেটি কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র সাধারণ নির্দেশ ও ইঙ্গিত সমূহের সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়, সেটিকে গ্রহণ করা হয়। নির্দিষ্টভাবে কোন মাযহাবী ফিক্বহ বা উছূলে ফিক্বহের অনুসরণ করা হয় না *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : থিসিস ১৩৪-৩৫ পৃ.; আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ২৩ পৃ.)*। এই নিরপেক্ষ নীতির ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, অনেক হানাফী বিদ্বানের মুখে এখন শোনা যাচ্ছে যে, এ যুগে ফিক্বহ ব্যতীত কেবল কুরআন ও হাদীছ দিয়ে ফৎওয়া দেওয়া হয়, আত-তাহরীকের পূর্বে কেউ সেটা কল্পনাও করতে পারত না। আত-তাহরীক তাই এদেশে এক নীরব বিপ্লব সৃষ্টি করে চলেছে। একথার বাস্তবতা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মাত্র ২০০০ কপি দিয়ে যাত্রা শুরু করে আত-তাহরীকের গ্রাহক সংখ্যা এখন ২৯ হাযার ছাড়িয়ে গেছে। এছাড়াও রয়েছে ১৭ হাযার ইন্টারনেট পাঠক। যা ক্রমবর্ধমান। অথচ অন্যান্য ইসলামী পত্রিকার অনেকগুলি গ্রাহক সংকটে বন্ধ হ'তে চলেছে।

শিরক-বিদ'আত ও ভ্রান্ত আক্বীদার মূলোৎপাটনে ভূমিকা :

শিরক বিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস ও বিদ'আত মুক্ত ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক আমল ব্যতীত কোন ইবাদত কবুল হবে না। শরী'আতের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য দু'টি অন্যায় হচ্ছে শিরক ও বিদ'আত। শিরক আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত। আর বিদ'আত তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সম্পৃক্ত। দু'টিই মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়।[২]

সমাজে জেঁকে বসা শিরক ও বিদ'আত দূরীকরণে আত-তাহরীকের ফৎওয়া বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত এসব বিষয় নিয়ে প্রশ্নোত্তর প্রকাশিত হওয়ার ফলে সমাজের একজন সাধারণ পাঠকও আত-তাহরীক-এর মাধ্যমে কোনটা শিরক, কোনটা বিদ'আত এবং এর পরিণতি কত ভয়াবহ তা জানতে পারছে। এভাবে ক্রমান্বয়ে সমাজ থেকে শিরক ও বিদ'আত দূরীভূত হচ্ছে। মানুষ শিরকী আক্বীদা ছেড়ে দিয়ে তাওহীদী আক্বীদায় এবং বিদ'আত ছেড়ে দিয়ে সুন্নাতী তরীকায় ফিরে আসছে। সেই সাথে দেশে প্রচলিত ব্রেলভী, দেওবন্দী, ছূফী, কাদিয়ানী, শী'আ ও অন্যান্য ভ্রান্ত মতবাদ সমূহের বিরুদ্ধে আত-তাহরীকে বিভিন্ন সময় ফৎওয়া সমূহ ছাপা হয়। ফলে এসব বাতিল ফিরক্বা ও মতবাদ সমূহ থেকে মানুষ ক্রমেই সতর্ক হচ্ছে।

কুসংস্কার মুক্ত সমাজ গঠনে ফৎওয়া বিভাগ :

নানাবিধ কুসংস্কারে নিমজ্জিত আমাদের দেশ। ধর্মের নামে, রাজনীতির নামে, অর্থনীতির নামে, সংস্কৃতির নামে চলছে এসব কুসংস্কার। ধর্মের নামে মাযহাবী তাক্বলীদ, মীলাদ, ক্বিয়াম, শবেবরাত, কুলখানী, চেহলাম, চল্লিশা, জন্মদিবস, মৃত্যুদিবস ইত্যাদি। রাজনীতির নামে গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজবাদ। অর্থনীতির নামে পুঁজিবাদ, সূদ, ঘুষ, জুয়া, লটারী ইত্যাদি সমাজ বিধ্বংসী কর্ম। সংস্কৃতির নামে নাচ-গান-আনন্দমেলা ও বিদেশ থেকে চালান করা আকাশ সংস্কৃতির নীল দংশনে আমাদের যুবচরিত্র ধ্বংসের কিনারায় পৌঁছে গিয়েছে। উপরের প্রতিটি বিষয়েই আত-তাহরীক-এর ফৎওয়া সমূহ প্রকাশিত হয়েছে। ফলে কুসংস্কারে নিমজ্জিত মানুষকে জাগিয়ে দিয়েছে আত-তাহরীক। তার অবচেতন মনে ফিরিয়ে দিয়েছে এলাহী চেতনা।

চরমপন্থা প্রতিরোধে ফৎওয়া বিভাগ :

নব্বই-এর দশকের শেষ দিকে বাংলাদেশে চরমপন্থী মতবাদের আনাগোনা শুরু হয়। অতঃপর ক্রমান্বয়ে তা বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। উঠতি বয়সের তরুণদের জিহাদের সুড়সুড়ি দিয়ে এ পথে নামানো হয়। অল্পশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত এইসব তরুণরা বনে-জঙ্গলে ঘুরে সশস্ত্র ট্রেনিং নিতে থাকে। যাদের

১. *আবুদাঊদ হা/৩৬৫১।*

২. নাসাঈ হা/১৫৭৮; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৭৮৫।

Contents

দাবী সশস্ত্র জিহাদ ছাড়া ইসলাম কায়েম সম্ভব নয়। অতঃপর দেশব্যাপী বোমা হামলার মাধ্যমে এরা প্রকারান্তরে শান্তিপূর্ণ ধর্ম ইসলামকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলে। খারেজী আক্বীদাপুষ্ট এই চরমপন্থী মতবাদের বিরুদ্ধে কুরআন ও হাদীছের আলোকে সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরে আত-তাহরীক এই সব তরুণদের চরমপন্থা থেকে ফিরে আসার আহ্বান জানায়, যা আজও অব্যাহত রয়েছে।[৩]

প্রচলিত স্রোতের বিপরীতে সাহসী পদক্ষেপ :

ইসলাম সমর্থিত নয় এমন যেকোন বিষয়ের বিরুদ্ধে আত-তাহরীক সব সময়ই সোচ্চার থেকেছে। সেটি ধর্মীয়, সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক যেকোন বিষয়েই হোক না কেন। এমনকি এর সাথে কোন আলেম-ওলামা জড়িত থাকলেও হক প্রকাশে আত-তাহরীক কখনো কুণ্ঠাবোধ করেনি। বরং আপোষহীন দৃঢ়তা অক্ষুণ্ন রেখে দলীল ভিত্তিক ফৎওয়ার মাধ্যমে জাতির সামনে প্রকৃত সত্য তুলে ধরেছে। ফলে অনেক দ্বীনদার মুসলমান নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে বিভিন্ন লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে হারাম থেকে হালালের পথে ফিরে এসেছেন। নিম্নে এ জাতীয় দু'একটি বিষয় তুলে ধরা হ'ল।-

(ক) এমএলএম ব্যবসা : MLM-এর পুরো নাম Multi level marketing অর্থাৎ বহুস্তর বিপণন। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম এমএলএম পদ্ধতিতে ব্যবসা শুরু হয় ১৯৯৮ সালে। জিজিএন বা 'গ্লোবাল গার্ডিয়ান নেটওয়ার্ক' নামে একটি প্রতিষ্ঠানে সর্বপ্রথম এই প্রতারণা পূর্ণ ব্যবসা শুরু করে। দুর্ভাগ্যজনক যে, এসব ব্যবসার সাথে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে একশ্রেণীর দুনিয়াদার আলেম।

মাসিক আত-তাহরীক শুরু থেকেই এমএলএম পদ্ধতিতে ব্যবসার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে কথা বলেছে। ১৯৯৮ সালে জিজিএন চালু হওয়ার পর যখন ক্রমান্বয়ে এই হারাম ব্যবসা জনগণের মাঝে বিস্তৃত হ'তে থাকে, সে সময় ২০০০ সালের অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'প্রতারণার অপর নাম জিজিএন' শিরোনামে তথ্যবহুল একটি প্রবন্ধ। ফলে সরকারের নযর পড়ে এবং ২০০০ সালেই জিজিএন নিষিদ্ধ হয়। পরবর্তীতে 'নিউওয়ে প্রাইভেট লিমিটেড' ও 'ডেসটিনি ২০০০ লিঃ'-এর বিরুদ্ধে মার্চ'০৪ সংখ্যার ২৫/২২৫ নং প্রশ্নোত্তরে এবং মার্চ '১২ সংখ্যার ১/২০৯ নং প্রশ্নোত্তরে বিস্তারিত ফৎওয়া প্রকাশিত হয়। ফলে ২০১২ সালে সরকার ডেসটিনির সকল কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় এবং ঐ বছরের অক্টোবর মাসে ডেসটিনির মালিক ও কর্মচারীদের গ্রেফতার করে। উল্লেখ্য যে, জিজিএন ও ডেসটিনি বন্ধ হওয়ায় বহু আলেম আত-তাহরীক ও সংগঠনের উপর ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

(খ) ব্যাংক ও বীমা : দেশে ব্যাঙের ছাতার মত ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। অতঃপর কৌশলে এগুলিকে হালাল করার জন্য অনেকে 'ইসলামী' সাইনবোর্ড জুড়ে দেয়। যাতে সাধারণ মানুষ এগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়। অথচ ব্যাংক ও বীমার লেনদেন বেশির ভাগই সূদ ভিত্তিক। সেকারণ এগুলি স্পষ্ট হারাম।

দেশের এই স্রোতধারার বিপরীতে আত-তাহরীক পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র ভিত্তিতে ইসলামী অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য এবং সূদ ভিত্তিক এসব পুঁজিবাদী অর্থনীতি হ'তে বেঁচে থাকার জন্য জাতির প্রতি আহ্বান জানায়। ফলে অনেক দ্বীনদার ব্যক্তি এসবের খপ্পর থেকে বেরিয়ে হালাল রূযীর পথে ফিরে আসেন।

(গ) কোয়ান্টাম মেথড : মানুষকে আল্লাহ্র ইবাদত থেকে ফিরিয়ে কথিত অন্তর্গুরুর ইবাদতে লিপ্ত করার অভিনব প্রতারণার নাম হ'ল কোয়ান্টাম মেথড। হাযার বছর পূর্বে ফেলে আসা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান পাদ্রী ও যোগী-সন্ন্যাসীদের যোগ সাধনার আধুনিক কলা-কৌশলের নাম দেওয়া হয়েছে 'মেডিটেশন'। যা ব্যক্তিকে আল্লাহ্র উপর বাদ দিয়ে নিজের উপর তাওয়াক্কুল করতে বলে এবং শিখানো হয় যে, 'তুমি চাইলেই সব করতে পার'। এদের আকর্ষণীয় কথার ফুলঝুরিতে ভুলে বিশেষ করে টাকাওয়ালা মানুষেরা এদের প্রতারণার ফাঁদে নিজেদেরকে সঁপে দিচ্ছেন অবলীলাক্রমে। কথিত ধ্যানের পিছনে ব্যয় করছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অথচ একটা অবাস্তব স্বপ্ন ছাড়া এদের ভাগ্যে কিছুই জুটছে না। আত-তাহরীক শিরকী আক্বীদা সম্পন্ন এই মেথড ও মেডিটেশনকে নাকচ করে ডিসেম্বর'১১ সংখ্যার ১৬/৯৬নং প্রশ্নোত্তরে এ বিষয়ে দ্ব্যর্থহীন জওয়াব দেয়। তাছাড়া আগষ্ট'১২ সংখ্যার সম্পাদকীয় কলামে *'কোয়ান্টাম মেথড : একটি শয়তানী ফাঁদ'* শিরোনামে এক বলিষ্ঠ সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ফলে বহু পাঠক এই ফাঁদ হ'তে বাঁচার সুযোগ লাভ করে।

দাম্পত্য জীবনের আশার আলো ফৎওয়া বিভাগ :

মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হ'ল বৈবাহিক জীবন। একাকী মানুষ থাকতে পারে না। তাই এই বন্ধন মহান আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে এক কল্যাণ বিধান। দুর্ভাগ্য যে, ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ বিধান পালনেও ভুলের কোন শেষ নেই। বিবাহের সঠিক পদ্ধতি এদেশের অধিকাংশ মানুষ জানে না। বিবাহকে ঘিরে হাযারো কুসংস্কার চালু আছে আমাদের সমাজে। এছাড়া ইসলামে বিবাহ বিচ্ছেদের সুন্দর পদ্ধতি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বিধৃত আছে। যেখানে তিন তহুরে তিন তালাকের সুন্দরতম বিধান রয়েছে। যেন এত বড় একটি মারাত্মক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে স্বামী দীর্ঘ সময় যাবৎ চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পায়। প্রতিটি তালাক দেওয়ার পর ইদ্দতকাল অর্থাৎ তিন মাস সময় থাকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য। এই ইদ্দতকালের মধ্যে সে ইচ্ছা করলে স্ত্রী ফেরত নিতে পারবে। এভাবে দু'বার সুযোগ দেওয়ার পর ৩য় তালাকের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়।

---

৩. *আত-তাহরীক, আগষ্ট'০০, প্রশ্নোত্তর নং ২৪/৩২৪; ফেব্রুয়ারী'০৯, প্রশ্নোত্তর নং ৩৭/১৯৭; ফেব্রুয়ারী'১৩, প্রশ্নোত্তর নং ৪০/২০০।*

অথচ আমাদের সমাজে এক বৈঠকে তিন তালাক কার্যকরের ভ্রান্ত ফৎওয়া চালু আছে। আর তার প্রতিক্রিয়ায় চালু হয়েছে আরেক জঘন্য প্রথা 'হিল্লা'। এভাবে মুমিনের পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে ভুল ফৎওয়ার কারণে।

মাসিক আত-তাহরীক-এর ফৎওয়া বিভাগে বিবাহের সঠিক পদ্ধতি ও তালাকের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে এ যাবৎ সর্বাধিক সংখ্যক ফৎওয়া প্রকাশিত হয়েছে। যার মাধ্যমে বিবাহ ও তালাক সম্পর্কিত ত্রুটি-বিচ্যুতি হ'তে জাতিকে সর্বাত্মকভাবে সাবধান করা হয়েছে। ফলে শত শত পরিবার নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ফিরে এসেছে সঠিক পথে।

ভাঙ্গা সংসার গড়ে দিল আত-তাহরীক : ঢাকা বিমান বন্দরে কর্মরত জনৈক কর্মকর্তা। সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান। দু'কন্যা সন্তানের পিতা। স্ত্রীও সম্ভ্রান্ত পরিবারের। দাম্পত্য জীবনে অসুখী নন তারা। সাংসারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মন ধরাধরি হ'তেই পারে। তেমনি এক পরিস্থিতিতে রাগের মাথায় স্ত্রীর প্রতি তিন তালাক উচ্চারণ করেন। পরক্ষণেই স্বাভাবিক হ'লে নিজের ভুল বুঝতে পারেন। কিন্তু উপায় কি? মাযহাবী ফৎওয়া অনুযায়ী তো স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে। এবার স্ত্রী ফিরে পাবার আশায় ছুটতে লাগলেন রাজধানী ঢাকার নামকরা সব আলেমের নিকটে। সকলেরই একই কথা, স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে। ফিরে পাওয়ার কোন পথ নেই 'হিল্লা' ব্যতীত। এদের মধ্যে জনৈক টিভি ব্যক্তিত্ব ও দেশ-বিদেশে খ্যাতিমান আলেম বললেন, হানাফী মাযহাবের ফৎওয়া অনুযায়ী আপনার স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তবে আপনার স্ত্রী তালাক হয়নি। তবে এই ফৎওয়া আমরা দিতে পারব না। যেহেতু আমরা একটি মাযহাবের প্রতিনিধিত্ব করি এজন্য আমাদের জন্য এই ফৎওয়া দেওয়া দুষ্কর। আমি আপনাকে একটি পথ দেখিয়ে দিতে পারি, যাতে আপনি স্ত্রী ফেরত নিতে পারেন। রাজশাহীতে একজন বড় আলেম আছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর। নাম ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। তাঁর নিকটে গেলে তিনি কুরআন-হাদীছের দলীল সহ আপনাকে এ বিষয়ে সঠিক ফৎওয়া দিতে পারবেন।

যেমন পরামর্শ তেমনি কাজ। পরের দিনের বিমান যোগেই তিনি চলে আসেন রাজশাহীতে। একদিন এক রাত থাকেন মারকাযে। প্রথমে আমীরে জামা'আতের 'তালাক ও তাহলীল' বইটা দেওয়া হ'ল। বইটি পাঠেই তার মনে আশার সঞ্চার হ'ল। অতঃপর দারুল ইফতার প্যাডে আমীরে জামা'আতের স্বাক্ষরিত দলীল ভিত্তিক লিখিত ফৎওয়া পেয়ে তিনি যেন নতুন জীবন ফিরে পেলেন। পরদিনের বিমানে ফিরে গেলেন ঢাকা। ফৎওয়া অনুযায়ী এক তালাকে রাজঈ হওয়ায় স্ত্রী ফিরিয়ে নিলেন। এখনও তাদের সুখী দাম্পত্য জীবন চলছে।

অবৈধ বিবাহ ভেঙ্গে দিল তাহরীক : জনৈক ব্যক্তি তার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মেয়েকে বিবাহ করেছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে তাহরীক স্পষ্ট বলে দেয় যে, সহোদর ভাইয়ের মেয়ের মেয়েকে যেমনভাবে বিবাহ করা হারাম, তেমনি বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মেয়েকেও বিবাহ করা হারাম। এ ধরনের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। অন্যথায় তা যেনা হিসাবে বিবেচিত হবে।[৪]

২. জনৈক হিন্দু একজন মুসলিম মহিলাকে বিবাহ করেছে এবং তাদের সন্তানও আছে। এ বিবাহ সম্পর্কেও তাহরীকের স্পষ্ট বক্তব্য, 'শরী'আতের দৃষ্টিতে তাদের বিবাহ হয়নি। তারা ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের সন্তান-সন্ততি জারজ সন্তান হিসাবে পরিগণিত।[৫]

৩. তিন সন্তানের জনক-জননী। দাম্পত্য জীবনও বেশ ভালই কাটছিল। কিন্তু তারা ছিল দুধ ভাই-বোন। শিশুকালে স্ত্রী তার স্বামীর মায়ের দুধ পান করেছিল। তাহরীকের নিকট জানতে চাইলে এ বিষয়ে স্পষ্ট জওয়াব দেওয়া হয় যে, দুধ বোন হওয়ার কারণে এ বিবাহ বাতিল। এক্ষণে জানার পর উভয়কে পৃথক করে দিতে হবে। অন্যথায় তাদের যেনার পাপ হবে।[৬] কি মর্মান্তিক বাস্তবতা। সঠিক ফৎওয়া না জানার কারণে তিন সন্তানের জনক-জননীরও বিবাহ বাতিল হয়ে গেল।

৪. ভাগনীর মেয়ে সম্পর্কে নাতনী হয়। এরূপ নাতনীকে বিবাহ করে স্বামী-স্ত্রী বসবাস করছিল এরা। প্রশ্ন আসলো ফৎওয়া বিভাগে। উত্তর প্রকাশিত হ'ল, মার্চ'০২ সংখ্যায়। জানিয়ে দেওয়া হ'ল এরূপ বিবাহ হারাম। কেননা আল্লাহ তা'আলা নিজ মেয়ে ও বোনের মেয়েকে হারাম করেছেন *(নিসা ৪/২৩)*। আর মেয়ে বলতে মেয়ের মেয়ে, তার মেয়ে এরূপ যত নীচে যাবে সবাই অন্তর্ভুক্ত।[৭]

এভাবে অনেক হারাম বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায় আত-তাহরীক-এর ফৎওয়া বিভাগের অবদানে। চলমান পাপ হ'তে নিষ্কৃতি পায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও পরিবার। সাবধান হয়ে যায় বহু পাঠক-পাঠিকারা। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

হিল্লা থেকে বাঁচালো আত-তাহরীক : মেহেন্দীগঞ্জ বরিশাল : **১১**টি পরিবার ভেঙ্গে গেছে হিল্লার ফৎওয়ায়। অবশেষে একটি ফাযিল মাদরাসার জনৈক মাওলানা শিক্ষক এক মজলিসে তিন তালাক দিয়ে নিজেই হিল্লা-র ফাঁদে পড়ে গেলেন। অতঃপর মাদরাসার বড় বড় আলেমরা বসে গেলেন। কোন কূল-কিনারা করতে না পেরে অবশেষে শরণাপন্ন হলেন পাশের নতুন আহলেহাদীছদের কাছে। কিছু দিন পূর্বে যাদের মসজিদ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের কাছ থকে পেলেন 'তালাক ও তাহলীল' বই। পেলেন আত-তাহরীকের ফৎওয়া ও দরস। বইটি পড়ে তাঁরা একমত হলেন ও নিজেদের এতদিনের ফৎওয়া বাদ দিয়ে সসম্মানে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার ফৎওয়া দিলেন। ফলে জীবন ফিরে পেল **১১** জন মহিলা ও তাদের পরিবার।[৮] এভাবে আত-তাহরীক-এর

---

৪. *আত-তাহরীক নভেম্বর '৯৯, প্রশ্নোত্তর নং ২১/৫১।*
৫. *আত-তাহরীক, জানু-ফেব্রুয়ারী '০০, প্রশ্নোত্তর নং ৫৪/১৪৪।*
৬. *আত-তাহরীক, নভেম্বর ২০০০, প্রশ্নোত্তর নং ২৪/৫৯।*
৭. *আত-তাহরীক, মার্চ'০২, প্রশ্নোত্তর নং ১৬/১৯১।*
৮. *দ্রঃ 'তালাক ও তাহলীল' পৃঃ ২৩-২৭।*

ফৎওয়ার মাধ্যমে দেশের আনাচে-কানাচে হিল্লার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাচ্ছেন অসংখ্য মা-বোন।

পরিশেষে সমাজ সংস্কারের যে মহান লক্ষ্য নিয়ে আত-তাহরীক-এর জন্ম হয়েছিল শত বাধা-বিপত্তি ও চড়াই-উৎরাইয়ের মুখেও তাহরীক তার লক্ষ্যমূলে দৃঢ় থেকে সমাজ সংস্কারে নীরব বিপ্লব সৃষ্টি করে যাচ্ছে। আর এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে আত-তাহরীক-এর ফৎওয়া বিভাগ। প্রতি সংখ্যায় ৪০টি দলীল ভিত্তিক ফৎওয়ার মাধ্যমে পাঠকগণ অনেক অজানা বিষয় জানতে পারছেন এবং সে অনুযায়ী জীবন গঠনে সচেষ্ট হচ্ছেন। ফলে ক্রমান্বয়ে বিদ'আতী সমাজ হেদায়াতী সমাজে পরিণত হচ্ছে। আল্লাহ আমাদের সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার তাওফীক দিন- আমীন!

আহলেহাদীছদের রাজনীতি : ইমারত ও খেলাফত

*মূল (উর্দূ) : প্রফেসর হাফেয আব্দুল্লাহ বাহাওয়ালপুরী**

*অনুবাদ : নূরুল ইসলাম**

[প্রফেসর হাফেয আব্দুল্লাহ বাহাওয়ালপুরী পাকিস্তানের একজন খ্যাতিমান আলেম, মাসলাকে আহলেহাদীছ-এর অনেক বড় দাঈ ও মুবাল্লিগ ছিলেন। তিনি ১৯২৪ সালের দিকে পূর্ব পাঞ্জাবের আম্বালা যেলার রোপাড় তহসিলের ডুগরী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলভী নূর মুহাম্মাদ অত্যন্ত সৎ ও আল্লাহভীরু ব্যক্তি ছিলেন। দেশ বিভাগের অনেক আগেই বাহাওয়ালপুরী 'জামে'আ তা'লীমুল ইসলাম' (মামূকাঞ্জন)-এর খ্যাতিমান শিক্ষকদের নিকট থেকে ইলমে দ্বীন হাছিল করেন। হাফেয আব্দুল্লাহ রোপড়ী এবং মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন রোপড়ী তাঁর বিশিষ্ট উস্তাদগণের অন্যতম ছিলেন। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি গ্রাজুয়েশন করেন। পরবর্তীতে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে ইসলামিক স্টাডিজে এম.এ. করেন। তিনি ইংরেজী, আরবী, উর্দূ ও ফার্সী ভাষায় দক্ষ ছিলেন। দেশ বিভাগের সময় তিনি ৯০ হাযার লোকের বিশাল কাফেলা নিয়ে পাকিস্তানে হিজরত করেন। এ সময় তিনি একশ' গ্রামের আমীর ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি বাহাওয়ালপুরের এস.ই. কলেজে লেকচারার হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি হিজরত করে পাকিস্তানের বাহাওয়ালপুরে এসে মুহাজির কলোনীতে তার বাড়ীর একটা অংশকে মসজিদের জন্য ওয়াকফ করে দেন এবং সেখানে জুম'আ ও জামা'আত কায়েম করেন। এভাবে যেখানেই গেছেন আহলেহাদীছ মসজিদ তৈরী করেছেন এবং জামা'আত কায়েম করেছেন। তিনি মন-মেযাজে, মেধা-মননে, চিন্তা-চেতনায়, গোপনে-প্রকাশ্যে একজন সাচ্চা আহলেহাদীছ ছিলেন। বাহাওয়ালপুর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে তিনি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তাঁর দাওয়াতে হাযার হাযার মানুষ সঠিক পথের দিশা খুঁজে পেয়েছে। বহু মানুষ তাক্বলীদের বন্ধন ছিন্ন করে কুরআন ও হাদীছের অনুসারী হয়েছে। পাকিস্তানের প্রফেসর যাফর ইকবাল সালাফী তাঁর দাওয়াতেই ব্রেলভী ও নকশবন্দী তরীকা ছেড়ে আহলেহাদীছ হন। আহলেহাদীছ মাসলাকের প্রচার-প্রসারের জন্য তিনি সরকারী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ অবলীলায় হাতছাড়া করেন।

অত্যন্ত সাধাসিধে জীবন যাপনে অভ্যস্ত প্রফেসর আব্দুল্লাহ বাহাওয়ালপুরী ১৪১১ হিজরীর ৬ই শাওয়াল মোতাবেক ১৯৯১ সালের ২১শে এপ্রিল রবিবার দুপুর ১২-টার দিকে ৬৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। পাকিস্তানের খ্যাতিমান আহলেহাদীছ আলেম ও মুহাক্কিক মাওলানা এরশাদুল হক আছারী তাঁর জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন। বহু মানুষ তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। বাহাওয়ালপুরে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৫০টি। তন্মধ্যে তাক্বলীদ কে খওফনাক নাতায়েজ, আহলেহাদীছ কে লিয়ে দাওয়াতে ফিকর ওয়া আমল, হাম নামায মে রাফউল ইয়াদায়েন কিঁউ করতে হ্যাঁয়, খুতবাতে বাহাওয়ালপুরী (৫ খণ্ড), রাসাইলে বাহাওয়ালপুরী অন্যতম।][1]

* পিএইচ.ডি. গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলামী সমাজে আমীর থাকা দ্বীনের ওয়াজিব বিষয় সমূহের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, يَجِـــبُ أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ وِلَايَةَ أَمْرِ النَّاسِ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ؛ بَلْ لَـــا قِيَامَ لِلدِّيْنِ وَلَا لِلدُّنْيَا إِلَّا بِهَـــا- 'জানা আবশ্যক যে, আমীর নির্ধারণ করা দ্বীনের বড় ওয়াজিব সমূহের অন্যতম। বরং ইমারত ছাড়া দ্বীন ও দুনিয়ার কোন অস্তিত্বই নেই'।[2] আর ইক্বামতে দ্বীন ব্যতীত মুসলমান মুসলমান নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেছেন,

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ-

'বলে দাও, হে আহলে কিতাবগণ! মূলতঃ তোমরা কোন কিছুর উপরেই প্রতিষ্ঠিত নও, যে পর্যন্ত না তোমরা তাওরাত, ইনজীল ও যে কিতাব তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে তার যথার্থ অনুসারী হবে' *(মায়েদাহ ৫/৬৮)*। অর্থাৎ তোমাদের কোন দ্বীন ঈমান নয়, যতক্ষণ না তোমরা দ্বীন কায়েম করবে।

মানুষ স্বভাবগতভাবে সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া তার জীবন যাপন করা কঠিন। আর মানুষের সংঘবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমেই সমাজ গড়ে ওঠে। যেখানেই কিছু মানুষ একত্রিত হবে, সেখানে তাদের একজনের আরেকজনের নিকটে প্রয়োজন পড়বে। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হবে। যার জন্য ইমারতের নিয়ম-নীতি যরূরী। এজন্যই তিনজন ব্যক্তি যখন সফরে থাকবে তখনও তাদের মধ্যে আমীর নির্ধারণের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। বরং মুসনাদে আহমাদে তো একথা পর্যন্ত বর্ণিত আছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلاَةٍ إِلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ-

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'কোন তিনজন ব্যক্তির জন্যেও কোন নির্জন ভূমিতে অবস্থান করা হালাল নয় তাদের মধ্যে একজনকে 'আমীর' নিযুক্ত না করা পর্যন্ত'।[3] অর্থাৎ সফরেও তিনজন ব্যক্তির আমীর বিহীন থাকা হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তিনজন ব্যক্তির মধ্য থেকেও একজনকে আমীর নির্ধারণ করাকে ওয়াজিব আখ্যা দেয়া প্রমাণ করে যে, যেখানেই কিছু মুসলমান থাকবে তারা অবশ্যই তাদের আমীর নির্ধারণ করবে। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

১. *প্রফেসর হাফেয আব্দুল্লাহ বাহাওয়ালপুরী, খুতবাতে বাহাওয়ালপুরী (ফায়ছালাবাদ, পাকিস্তান : মাকতাবায়ে ইসলামিয়াহ, ৩য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭), পৃঃ ১২-৩০।*
২. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৮/৩৮০।*
৩. *আহমাদ হা/৬৬৪৭, হাদীছ হাসান।*

যেটি দ্বীনের অন্যতম ওয়াজিব বিষয় সমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, সেটাও আমীর ব্যতীত হতে পারে না। জিহাদ যেটা ইসলামের রূহ বা প্রাণ, এটাও আমীর ব্যতীত সম্ভব নয়। মোটকথা আমীর মুসলিম সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমীর ব্যতীত সঠিক ইসলামী সমাজ কায়েমই হতে পারে না। যে জামা'আতে আমীর নেই সেই জামা'আতের উদাহরণ হল ঐ লাশের মতো যার মাথা নেই। মাথা ছাড়া যেমন দেহ থাকে, সেরূপই অবস্থা আমীর বিহীন জামা'আতের। ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী তো মুসলমানদের একদিনও আমীর বিহীন অতিবাহিত করা উচিত নয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যু হ'লে সর্বাগ্রে খলীফা নির্বাচন করা হয়। এরপর অন্য কাজ হয়। এমনকি তাঁর কাফন-দাফনও হযরত আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পরে হয়। এদিকে ছাহাবীদের যারা আমাদের পূর্বসূরি ও প্রথম আহলেহাদীছ তাদের অবস্থা এই যে, তাঁরা আমীর বিহীন এক রাতও অতিবাহিত করতেন না। অন্যদিকে আমাদের অবস্থা এই যে, আমরা আমীর নির্ধারণ ছাড়াই সারা জীবন অতিবাহিত করছি। এজন্যই তো বলা হয়, আহলেহাদীছ তো ছাহাবীগণ ছিলেন। যাদের প্রত্যেকটা আমল হাদীছ অনুযায়ী ছিল। যাদের নিকটে ইমারতের নিয়ম-নীতি এত যরূরী ছিল যে, আমীর ব্যতীত একদিন অতিবাহিত করাকে তারা হারাম মনে করতেন। এজন্য আমার ভাই যদি আমরা আহলেহাদীছ হতে চাই তাহলে আমাদেরকেও ছাহাবীগণের আদর্শের উপর চলে যেখানেই আমরা থাকি দ্রুত আমাদের আমীর নির্ধারণ করা উচিত। যাতে আমাদের জীবন হারাম না হয়ে আমীরের অধীনে অতিবাহিত হয়। যেমনটা শরী'আতের নির্দেশ।

আমীর নির্ধারণ করা যেমন ফরয। আমীর ব্যতীত কোন জামা'আতী যিন্দেগী নেই। তদ্রূপই আমীরের আনুগত্যও ফরয। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অত্যন্ত তাকীদ করেছেন। তিনি বলেছেন, مَنْ يُطِعِ الأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِى، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِى– 'যে আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল'।[4] তিনি আমীরের আনুগত্যকে নিজের আনুগত্য এবং আমীরের অবাধ্যতাকে নিজের অবাধ্যতা আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوْا لَهُ وَأَطِيعُوْا– 'যদি তোমাদের উপর একজন নাক-কান কাটা কৃষ্ণকায় গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করা হয়, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করেন, তোমরা তার কথা শোন এবং আনুগত্য কর'।[5]

তিনি আরো বলেছেন,

اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ–

'প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর পসন্দনীয় ও অপসন্দনীয় সব বিষয়ে (নেতার নির্দেশ) শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা অপরিহার্য। যতক্ষণ না আল্লাহ্র অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হয়। যখন আল্লাহ্র অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হবে, তখন আমীরের কথা শ্রবণ ও তার কোন আনুগত্য নেই'।[6]

لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ– 'আল্লাহ্র অবাধ্যতায় কোন আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবল ভাল কাজে'।[7]

হাদীছে এসেছে, لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই'।[8]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমীরের আনুগত্যের উপর জোর দিতে গিয়ে বলেছেন, مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِه شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوْتُ إِلاَّ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً– 'যে ব্যক্তি তার আমীরের মধ্যে এমন কিছু দেখে যা সে অপসন্দ করে, তখন সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল অতঃপর মৃত্যুবরণ করল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল'।[9]

এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً– 'যে ব্যক্তি (আমীরের) আনুগত্য হতে বেরিয়ে যায় ও জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, অতঃপর মারা যায়, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করে'।[10]

আমীরের আনুগত্য এত যরূরী যে, তিনি বলেছেন, أَلاَ مَنْ وَلِىَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأْتِى شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِى مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ– 'সাবধান! কারো উপর যদি কোন শাসক নিযুক্ত হয়। অতঃপর সে যদি শাসককে আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক কোন কাজ করতে দেখে, তখন সে যেন তার আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক কাজকে ঘৃণা করে এবং অবশ্যই আনুগত্যের হাত গুটিয়ে না নেয়'।[11] এর দ্বারা প্রমাণিত হ'ল যে, আমীর যদি খারাপও হয় তবুও প্রত্যেক নেকীর কাজে তার নির্দেশ মানতে হবে। অবশ্যই তার গোনাহকে খারাপ জানতে হবে এবং গোনাহের কাজ

---

৪. *বুখারী হা/২৯৫৭; মিশকাত হা/৩৬৬১।*
৫. *মুসলিম হা/১৮৩৮; মিশকাত হা/৩৬৬২।*
৬. *বুখারী হা/৭১৪৪; মুসলিম হা/১৮৩৯; মিশকাত হা/৩৬৬৪।*
৭. *বুখারী হা/৭২৫৭; মুসলিম হা/১৮৪০; মিশকাত হা/৩৬৬৫।*
৮. *শারহুস সুন্নাহ; আহমাদ হা/১০৯৫; আল-মু'জামুল কাবীর হা/৩৮১; মিশকাত হা/৩৬৯৬।*
৯. *বুখারী হা/৭০৫৪; মুসলিম হা/১৮৪৯; মিশকাত হা/৩৬৬৮।*
১০. *মুসলিম হা/১৮৪৮; মিশকাত হা/৩৬৬৯।*
১১. *মুসলিম হা/১৮৫৫; মিশকাত হা/৩৬৭০।*

সমূহে তার আনুগত্য করা যাবে না। এছাড়া তার সব নির্দেশ মেনে নিতে হবে।

আফসোস তো এই যে, গণতন্ত্রপন্থী আহলেহাদীছরাও নিজেদের সংগঠনে সভাপতিকে আমীরের নাম দিয়ে দিয়েছে। যেটা সরাসরি ধোঁকা। আসলে সে আমীর হয় না। কোথায় শারঈ সংগঠনের আমীর আর কোথায় গণতন্ত্রের সভাপতি। কোথায় আল্লাহ প্রদত্ত ইমারত আর কোথায় দুনিয়াবী সভাপতি। শারঈ সংগঠনের আমীরের আনুগত্যকে তো কুরআন মাজীদও ফরয আখ্যা দেয়। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের আনুগত্য কর' *(নিসা ৪/৫৯)*। কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সভাপতির আনুগত্যকে স্বয়ং গণতন্ত্র এবং তার সভাপতি যরূরী আখ্যা দেয় না। গণতন্ত্রের সভাপতির সম্পর্ক স্রেফ দল বা রাজনীতির সাথে হয়। তিনি শুধু রাজনীতির ময়দানেই আমীর হন। জীবনের অন্যান্য দিক ও বিভাগের সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু শারঈ আমীর পুরা জীবনের তত্ত্বাবধায়ক হন। তার জন্য ফরয হ'ল, ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী নিজের জামা'আতের এমন চরিত্র গড়ে তোলা, যার মাধ্যমে তাদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই ঠিক হয়ে যায়।

গণতান্ত্রিক নিয়মে প্রেসিডেন্ট ক্ষমতাসম্পন্ন হন না। কেননা তার দলের সকল সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসেন। ফলে তারা প্রেসিডেন্টের অনুগত হন না। তারা সর্বদা প্রেসিডেন্টের জন্য মাথাব্যথা হয়ে থাকেন। বরং সকল ক্ষমতা সেক্রেটারী অথবা প্রধানমন্ত্রীর হাতে থাকে। প্রেসিডেন্ট বেচারা তো একজন অক্ষম সদস্যের মতো হয়ে থাকেন।

পক্ষান্তরে শারঈ আমীর সম্পূর্ণরূপে নিজেই কর্তৃত্বশীল হন। তিনি পরামর্শ করে যাকে ইচ্ছা পদ দেন। এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকেন। কারো অনুগত হন না। হযরত আবুবকর ছিদ্দীক্ব ও হযরত ওমর (রাঃ) খলীফা হ'লে কেউ তাদের সেক্রেটারী বা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না। তারা যাকে ইচ্ছা নেতা বানাতেন। যাকে ইচ্ছা সরিয়ে দিতেন। শারঈ আমীরের পরে কারো কোন মতামত থাকত না। সব পদাধিকারী তার নিয়োগপ্রাপ্ত এবং তার অনুসারী হয়। এজন্য আহলেহাদীছদের বর্তমান আমীরদেরকে শারঈ আমীর বলতে পারি না। আর না তাদের আনুগত্য ফরয। কেননা তারা কুফরী গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অধীনে আমীর হয়েছেন। তাদের সংগঠনও শরী'আতসম্মত নয়, গঠনতন্ত্রও শরী'আতসম্মত নয়। যেটা একজন প্রকৃত আহলেহাদীছের কাছেও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

হে আহলেহাদীছগণ! এটা কি আফসোসের বিষয় নয় যে, ছাহাবীগণও আহলেহাদীছ ছিলেন এবং আমরাও আহলেহাদীছ। কিন্তু আমাদের ও তাদের মাঝে পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব। ছাহাবীগণের মাঝে আত্মসম্মানবোধ ছিল, দ্বীনী আগ্রহ ছিল। আমরা এসকল গুণ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। ছাহাবায়ে কেরাম দ্বীনী জোশে পাগলপারা ছিলেন। তারা ইসলামের জন্য জীবন দিতেন। আমরা দুনিয়াদার। আমরা গদির জন্য মরি এবং বাতিলের কাছে মাথা নত করি। এ সকল পার্থক্য স্রেফ এ কারণে যে, ছাহাবায়ে কেরাম ইসলামের ফসল ছিলেন। আমরা গণতন্ত্রের ফসল।

এখন হিজরী চতুর্দশ শতক শেষ হয়ে গেছে। অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। সময়ের পরিবর্তন হচ্ছে। ইসলাম বিকশিত হচ্ছে এবং শেষাবধি তাকে বিকাশমান থাকতে হবে। আমরা যদি এখনো না জাগি এবং নিজেদের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন না রাখি, তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদের অপেক্ষা করবেন না। আল্লাহ এই কাজ অন্য কারো দ্বারা নিবেন। আর আমরা আফসোস করতে থাকব। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ 'যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। এরপর তারা তোমাদের মত হবে না' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৮)*।

বাগদাদের পতনের পর আল্লাহ ইসলামকে নিশ্চিহ্নকারীদের দ্বারাই ইসলামের কাজ নিয়েছেন। তাতার যারা ইসলামের দুশমন ছিল তারাই ইসলামের পাহারাদার হয়ে গেছে। এজন্য হে আমার ভাই! উঠো। নিজের মর্যাদাকে বুঝ। নিজের দায়িত্বকে পুরা কর। আহলেহাদীছ হওয়ার কারণে তোমার মর্যাদা হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতিনিধি হওয়া। তুমি রাসূল (ছাঃ)-এর উত্তরাধিকারী। নিজের আমল দ্বারা প্রমাণ করো যে, আহলেহাদীছরাই প্রকৃতপক্ষে রাসূল (ছাঃ)-এর উত্তরাধিকারী। এরাই বিশুদ্ধভাবে ইসলামের উপর আমলকারী।

ইক্বামতে দ্বীন আমাদের কাজ। এজন্য তাবলীগও করো এবং জিহাদও করো। এটাই আহলেহাদীছদের ফরয দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে প্রকৃত আহলেহাদীছ হওয়ার তাওফীক দিন এবং কুফরীর ফিতনা সমূহ থেকে বাঁচান। -আমীন ইয়া রব্বাল 'আলামীন!

॥ অমা 'আলায়না ইল্লাল বালাগ ॥

Contents

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মুসলিম চেতনা

*মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম**

দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অনস্বীকার্য। এ দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে আছে এক দশকের দীর্ঘ ইতিহাস; যেখানে ক্রিয়াশীল ছিল একটি চেতনা, একটি অনুপ্রেরণা। নতুন প্রজন্মের সামনে সেই ইতিহাস তুলে ধরার জন্য আলোচ্য নিবন্ধের অবতারণা।

দিন তারিখের হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২১ সালের ১লা জুলাই প্রতিষ্ঠিত হ'লেও মূলতঃ এর সূত্রপাত হয় ১৯০৬ সালে। স্যার সৈয়দ আহমাদ খানের (১৮১৭-১৮৯৮) মৃত্যুর পর আলীগড় আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় গঠিত 'মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সে'র ঢাকার শাহবাগে ২৭-৩১শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ২০তম অধিবেশনে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, ব্যারিস্টার আফতাব আহমাদ প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠা লাভ করে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'। পূর্ববঙ্গের অনগ্রসর মুসলিম জনসমাজ যাতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায় সে লক্ষ্যে উক্ত সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ কনফারেন্স থেকে সর্বপ্রথম ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী উত্থাপন করেন।

ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে অভিমানে পিছিয়ে থাকলেও 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড' এ প্রবাদকে সামনে রেখে বাংলার মুসলমানরা পরে আন্দোলন শুরু করেছিল। তাদের অতীত ইতিহাস ছিল জ্ঞানের আলোয় সমুজ্জ্বল। বিশেষতঃ ইউরোপ যখন অজ্ঞতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, তখন মুসলমানরা সুদূর স্পেনে ইসলামের পতাকা সমুন্নত করেছিল এবং জ্বালিয়ে দিয়েছিল জ্ঞানের দীপশিখা। ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কর্ডোভা ও গ্রানাডার মত জগদ্বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও মুসলমানরা যথেষ্ট ত্যাগ করেছেন ও অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। ব্রিটিশদের ইচ্ছা থাকলেও বর্ণ-হিন্দুদের বিরোধিতার কারণে পূর্ব বাংলা সকল সুযোগ-সুবিধা হ'তে বঞ্চিত হ'তে থাকে। কারণ এ অঞ্চলের জনগণের বেশিরভাগ ছিল মুসলমান। কিন্তু মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনার ফলে সকল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়ে স্বীয় দাবী আদায়ে তারা সক্ষম হয়েছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে যাদের প্রচেষ্টায় এ প্রতিষ্ঠানটি 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিল সে ইতিহাস জাতি আজ ভুলতে বসেছে। বিশেষতঃ এ সময়ে মুসলিম চেতনা কতটুকু ভূমিকা রেখেছিল তা তৎকালীন ইতিহাস থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করব। যে কয়জন মুসলিম মনীষী এক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক অন্যতম।

একথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, নিতান্ত প্রশাসনিক সুবিধার্থে তৎকালীন দখলদার ইংরেজ সরকার বিশাল বঙ্গদেশ দুইভাগে বিভক্ত করে। তবে এ বিভাগের পিছনে তাদের একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল ছিল। আর তা হ'ল 'ভাগ কর ও শাসন কর' (Divide and rule policy)। তৎকালীন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি' বা বঙ্গপ্রদেশ ছিল এ উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ প্রদেশ। এ প্রদেশের লোকসংখ্যা ছিল সমগ্র উপমহাদেশের এক-তৃতীয়াংশ। একজন মাত্র শাসকের (ছোটলাট) পক্ষে এতবড় প্রদেশ শাসন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই প্রায় দেড়শ' বছর পর প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে 'বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা' প্রদেশকে দু'ভাগে বিভক্ত করে বাংলার পূর্বাঞ্চল (আজকের বাংলাদেশ)-কে আসামের সাথে যুক্ত হয়ে ঢাকাকে রাজধানী করে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ (বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগ)-কে বিহার ও উড়িষ্যার সাথে যুক্ত হয়ে কলকাতাকে রাজধানী করে অপর একটি প্রদেশ- 'বাংলা প্রদেশ' গঠন করা হয়। 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের আয়তন ১,০৬,৫০৪ বর্গমাইল, জনসংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ১০ লক্ষ। এর মধ্যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমান, ১ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু এবং বাকি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী।[১] অপরদিকে 'বাংলা প্রদেশ'-এর আয়তন ১,৪১,৫৮০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ৫ কোটি ৪০ লক্ষ। এদের মধ্যে ৪ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু, ৯০ লক্ষ মুসলমান এবং বাকি অন্যান্য ধর্মাবলম্বী।[২]

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী' উপমহাদেশে শাসন প্রতিষ্ঠিত করলেও মুসলমানদের ইসলামী চেতনা বিনষ্ট করতে পারেনি। এক সময় ভারত বর্ষের রাজনৈতিক ঐক্য রক্ষার জন্য মিঃ গান্ধী বলেছিলেন, We are first Indian, then we are Hindu or Muslim. 'আমরা প্রথমে ভারতীয় অতঃপর হিন্দু অথবা মুসলিম'। এর উত্তরে কায়েদে আযম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮) দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছিলেন, We are first Muslim, then we are Indian. 'আমরা প্রথমে মুসলিম অতঃপর ভারতীয়'।

মুসলমানদের মৌলিক চেতনা হ'ল তাদের আক্বীদার বিপ্লব। নির্ভেজাল আক্বীদা সম্পন্ন মুসলিমকে তার ঈমানী চেতনা থেকে দূরে রাখা বা চেতনা নির্মূল করা আদৌ সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে বিরুদ্ধবাদীরা অনেক ভূমিকা পালন করেছে।

বঙ্গভঙ্গের ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী। পূর্ব বাংলার জনগণের কাছে বঙ্গভঙ্গ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্ব বাংলার জনগণ বিশেষ করে মুসলিম জনগোষ্ঠী এটাকে সমর্থনের কারণ ছিল ঢাকা কেন্দ্রিক নতুন প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের জন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে নতুন নতুন সুযোগ

* *সাংগঠনিক সম্পাদক, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ।*

১. *কে. এম. রাইছ উদ্দিন খান, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, (ঢাকা : খান ব্রাদাস, ২০০১), পৃঃ ৫৯২।*
২. *ঐ, পৃঃ ৫৯৩।*

সৃষ্টি হবে। সাথে সাথে বাণিজ্য তথা অর্থনীতি, যোগাযোগসহ সকল ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হবে। সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য পেয়েছিল শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রভূত সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা।

অবিভক্ত বঙ্গদেশে ১৯০৫ সালে যে ৪৫টি কলেজ ছিল তার ৩০টি ছিল পশ্চিমবঙ্গে। বাকী ১৫টি ছিল পূর্ববঙ্গ ও আসামে। যদিও জনসংখ্যা এখানেই বেশি ছিল। অপরদিকে শুধু কলকাতায় ছিল ১৩টি কলেজ এবং ৭টি মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এসব বঞ্চিত পরিবেশ থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষায় পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করে।

বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলায় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির যে সূচনা হয়, কলকাতা কেন্দ্রিক ভদ্র হিন্দু সমাজ তা মেনে নিতে পারেনি। বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৯০৬ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলা ও আসামের কলেজ পর্যায়ে মুসলিম ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৬,৯৯,০৫১ জন থেকে ৯,৩৬,৬৫৩ জন হয় এবং শিক্ষা খাতে বাজেট বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭,৮১,৮৩৩ টাকা থেকে ৭৩,০৫,২৬০ টাকায় উন্নীত হয়'।[৩]

কিন্তু বঙ্গ দেশের অখণ্ডতা রক্ষার দাবীতে রবীন্দ্রনাথসহ হিন্দু নেতা, লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রবল গণ-আন্দোলন গড়ে তোলেন। যা অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে বৃটিশ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।[৪] ১৯০৫ সালের ১০ই জুলাই বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার দু'দিন পরেই কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা ১৯০৫ সালের ১৩ই জুলাই সম্পাদকীয় নিবন্ধে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সামগ্রিক 'বয়কট' যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। 'হিতবাদী' পত্রিকায় বলা হয়, বিগত ১৫০ বছরের মধ্যে বাঙ্গালী জাতির সম্মুখে এরূপ বিপর্যয় কখনও আসেনি। 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় বলা হয়, বাঙ্গালী জাতিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৫] শুধু নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীরাই নয়, ব্যবসায়িক স্বার্থ বিপন্ন হবার আশঙ্কায় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা পর্যন্ত এর চরম বিরোধিতা করেন। তারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত রাখার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদান করেন।

সেকারণ শেরে বাংলা একেফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) এক সময় বলেছিলেন, Politics of Bengal is in reality economics of Bengal. 'বাংলার অর্থনীতিই হ'ল বাংলার আসল রাজনীতি'।[৬]

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর 'বঙ্গভঙ্গ' কার্যকর করার দিন থেকেই কলকাতার হিন্দু নেতৃবৃন্দ এবং কংগ্রেস সদস্যরা 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর নামে 'বঙ্গভঙ্গ রদ' আন্দোলন শুরু করেন এবং দুর্বার গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন।[৭]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনী কান্ত সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি রচিত স্বদেশী গান বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলেছিল। এই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি রচনা করেন, যা বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত।[৮]

মোটকথা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন যে প্রবল রূপ ধারণ করেছিল এবং যে চরিত্র পরিগ্রহ করেছিল, সে পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করা বৃটিশ সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের 'অনুশীলন সমিতি' বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে পুরোপুরি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে রূপ নেয়।[৯] পরিস্থিতির ভয়াবহতা লক্ষ্য করে ইংরেজ সরকার অবশেষে ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ করার সিদ্ধান্ত নেয়।[১০] যা ১৯১২ সালের জানুয়ারী মাস হ'তে কার্যকর হয়।[১১] এর ফলে বঙ্গদেশের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী জনগণ যেমন আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়ে, তেমনি বঙ্গভঙ্গের সমর্থনপুষ্ট মুসলিম জনগোষ্ঠী ক্ষোভে ফেটে পড়ে। এমত পরিস্থিতিতে বাঙ্গালী মুসলিমরা যে আশার আলো দেখেছিল তা দপ করে নির্বাপিত হয়ে যায়।

'বঙ্গভঙ্গ রদ' হ'লে মুসলিম নেতৃবৃন্দ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ভারতের বর্ণ-হিন্দুদের আন্দোলনে এটি আরও মারাত্মক আকার ধারণ করে। তখন ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ এবং ময়মনসিংহের সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী আগা খানের 'দাবীপত্রে' 'বঙ্গভঙ্গ স্থায়ী' করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার জোর প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু আগা খান বিষয়টি গুরুত্ব দেননি, বরং তিনি এর বিরোধিতা করেছিলেন। 'বঙ্গভঙ্গ রদ' করার কারণে বাংলার মুসলমান তথা সর্বশ্রেণীর জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়টি ক্ষুণ্ন হয়। বিশেষ করে তারা সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিকভাবে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ বিষয়টি গভর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জন বুঝলেও আগা খান বুঝতে চাইলেন না। অবশ্য এর পিছনে বর্ণ-হিন্দুদের বিরোধিতাও ছিল মূল কারণ। তাঁরা আগা খাঁর বিরোধিতাকেই বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে, বাঙ্গালী মুসলমান নেতৃবৃন্দ, বিশেষত ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ ও সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী এই দাবীপত্রে বঙ্গভঙ্গের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আগা খাঁর বিরোধিতায় তা সম্ভব হয়নি।[১২] একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যখন মুসলমান জনগণ তাদের নিজেদের বিষয়ে দাবী উত্থাপন করেছে, তখনই অমুসলিমরা চরম বিরোধিতা করেছে।

বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর পূর্ব বাংলার বিক্ষুব্ধ ও বিমর্ষ মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্ট অসন্তোষ প্রশমনের জন্য তৎকালীন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ পূর্ববঙ্গ সফরের কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

---

৩. ড. এমাজ উদ্দীন আহমদ, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ইতিহাসের বিস্মৃত এক অধ্যায়, (ঢাকা : শিকড় প্রকাশনী, ২০০২), পৃঃ ২৬১।
৪. বশির আলহেলাল, ইবরাহীম খাঁ, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃঃ ১৯।
৫. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পৃঃ ৫৯৩।
৬. ঐ, পৃঃ ৫৯৫।
৭. এম. এ. মতিন, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাস ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা, (ঢাকা : জ্ঞান বিতরণী, ২০০১), পৃঃ ২২।
৮. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পৃঃ ৬০১।
৯. আবদুল গফুর, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৭), পৃঃ ১২১।
১০. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পৃঃ ৬০৭।
১১. ঐ, পৃঃ ৬০৭।
১২. আধুনিক ভারত, ১ম খণ্ড, (কোলকাতা ১৯৮৩), পৃঃ ১৩৮।

তদনুযায়ী তিনি ১৯১২ সালের ৩১শে জানুয়ারী ঢাকা সফরে আসেন। ঐ দিনই নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী ও এ কে ফজলুল হক প্রমুখ মুসলিম নেতাদের একটি প্রতিনিধি দল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার অনুরোধ জানান। এই অনুরোধের প্রেক্ষিতে তিনি ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন।[১৩] উক্ত ঘোষণার পর একই বছর মে মাসে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিস্তারিত সুপারিশ পেশ করার জন্য 'নাথান কমিশন' (১৯১২) নামে একটি কমিশন গঠন করা হয়।[১৪]

ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'লে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব হ্রাস পাবে, চাষা ও যবনরা শিক্ষিত হবে এই আশঙ্কায় পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা এর চরম বিরোধিতা শুরু করে। রবীন্দ্রনাথসহ সকল বাঙ্গালী হিন্দু নেতা ও বুদ্ধিজীবি ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চরম বিরোধী ছিলেন। এমনকি পূর্ববঙ্গের হিন্দুরাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ছিল। এ লক্ষ্যে জনমত সৃষ্টির জন্য ১৯১২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী ফরিদপুর ও ময়মনসিংহে, ২৩শে মার্চ দিনাজপুরে, ২৪শে মার্চ রংপুরে, ২৬শে মার্চ রাজশাহীতে, ২৮শে মার্চ কুমিল্লা ও মেদিনীপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিরোধী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব জনসভায় সভাপতি ও আলোচক ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ।[১৫] সবচেয়ে মজার ব্যাপার হ'ল ১৯১২ সালের ২৮শে মার্চ কলকাতার গড়ের মাঠে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে হিন্দুরা যে প্রতিবাদ সভা ডাকে, সে সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।[১৬]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিরোধিতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভিসি স্যার আশুতোষ মুখার্জী, যিনি ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইঝি জামাই। তাঁর নেতৃত্বে তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জকে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন না করার জন্য ১৮ বার স্মারকলিপি দিয়ে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হয়।[১৭] সে সময়ে অনেক হিন্দু কটাক্ষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বলত 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়'। স্যার আশুতোষ মুখার্জীর স্মারকলিপির জবাবে লর্ড হার্ডিঞ্জ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবেই। কি মূল্যের বিনিময়ে আপনি প্রতিবাদলিপি প্রত্যাহার করতে রাযী আছেন বলুন। তখন স্যার আশুতোষ মুখার্জী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অতিরিক্ত ৪টি প্রফেসরের পদ সৃষ্টির বদৌলতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা বন্ধ করেন।[১৮] কিন্তু অন্যান্য মহল তাদের বিরোধিতা অব্যাহত রাখে।

এসব বাধা-বিপত্তির মাঝেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া থেমে থাকেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তৎপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দার অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ বিলম্বিত হয়। অতঃপর ১৯১৭ সালের ২০শে মার্চ সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ভারতীয় আইনসভায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী পুনরায় উত্থাপন করেন এবং অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিল পাসের দাবী জানান। আইনসভার পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল-এর খসড়া প্রস্তুত রয়েছে, তবে যুদ্ধ সঙ্কটের মধ্যে সরকার এ বিলে হাত দিতে চান না। যুদ্ধ শেষে যথাসময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। অতঃপর একই বছর 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' পূর্বের 'নাথান কমিশন' রিপোর্ট অনুমোদন করে। এ রিপোর্টের ভিত্তিতে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ' পাস হয়। অবশেষে সকল প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে দীর্ঘ নয় বছর পর ১৯২১ সালে বহুল প্রত্যাশিত ও অনেক সংগ্রামের ফসল 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্নে এর পরিধি কেমন ছিল এবং বর্তমান পরিধি কি রূপ সেটা নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১৯২১ সালের ১লা জুলাই ৬০০ একর জমির উপরে আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় ৩টি অনুষদ ও ১২টি বিভাগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। অনুষদ ৩টি হ'ল কলা, বিজ্ঞান ও আইন। এ অনুষদের অন্তর্গত বিভাগগুলো হ'ল : (১) ইংরেজী (২) সংস্কৃত ও বাংলা (৩) আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ (৪) ফার্সী ও উর্দূ (৫) ইতিহাস (৬) অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (৭) দর্শন (৮) গণিত (৯) পদার্থ বিদ্যা (১০) রসায়ন (১১) আইন এবং (১২) শিক্ষা। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা ছিল সর্বমোট ৬০ জন। এর মধ্যে ২৮ জন ছিলেন কলা অনুষদের, ১৭ জন বিজ্ঞানের এবং ১৫ জন আইনের।[১৯] ছাত্র-ছাত্রী ছিল ৮৭৭ জন ও আবাসিক হল ছিল ৩টি।

বর্তমানে এর অনুষদ ১৩টি এবং বিভাগ ৭০টি। ইন্সটিটিউট ১১টি, গবেষণা কেন্দ্র ৩৯টি। ক্যাম্পাস ২৩টি। ছাত্র-ছাত্রী ৩৩,৫০০ জন। ছাত্র-ছাত্রীদের থাকার জন্য হল ও হোস্টেল ২১টি। এর মধ্যে ছাত্রদের ১৬টি ও ছাত্রীদের ৫টি। শিক্ষক ১৮০৫ জন। একাডেমিক স্টাফ ১৮১৭ জন এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারী ৩৪০৮ জন। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে বিশ্বের বিখ্যাত ১০০ নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তুলনীয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক ত্যাগ, সংগ্রাম ও আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' খ্যাত এ বিশ্ববিদ্যালয় আজ বাংলার মুসলমানদের উচ্চশিক্ষার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান। এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ, নওয়াব আলী চৌধুরী, শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক প্রমুখ ব্যক্তিত্বের অবদান সবিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা না থাকলে হয়তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারত না। জাতি তাঁদের কৃতিত্বের কথা আজীবন স্মরণ রাখবে। এসব ব্যক্তিত্ব মূল যে প্রেরণা নিয়ে কাজ করেছিলেন তা ছিল তাঁদের মুসলিম চেতনা।

---

১৩. *আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাস ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা, পৃঃ ২৪।*
১৪. *ঐ।*
১৫. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ইতিহাসের বিস্মৃত এক অধ্যায়, পৃঃ ২৬৫।*
১৬. *নীরোদ চন্দ্র চৌধুরী, দি অটোবায়োগ্রাফী অফ অ্যান আননোন ইন্ডিয়ান।*
১৭. *জীবনের স্মৃতিদ্বীপে: ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার।*
১৮. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ইতিহাসের বিস্মৃত এক অধ্যায়, পৃঃ ২৬৫।*
১৯. *ডঃ আ.ফ.ম আবুবকর সিদ্দীক, বাংলার মুসলিম চেতনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ৪৭।*

Contents

(সম্পাদকীয় বাকী অংশ)

মুক্ত বাংলা বলতে কি তাহ'লে এগুলিকেই বুঝায়? এইসব কবিরা কাদের কাছে প্রতিষ্ঠিত? কারা এদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিল? বাংলা একাডেমী কি তাহ'লে এদেরই মুখপত্র? এখানে ইসলামী প্রকাশকগণ স্থান পান না কেন? মুখরক্ষার জন্য এক/দু'জনকে দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেন কেন? বাংলা একাডেমী ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন দু'টিই সরকারী প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের বানানারীতি পৃথক কেন? বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার ইসলামপন্থী সাহিত্যিকরা পান না কেন? সেখানকার অনুষ্ঠানে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী গেলেও লোক পাওয়া যায় না কেন? মেলার স্টলগুলি ফাঁকা। অনুষ্ঠানগুলি ফাঁকা। ফলে তারা এখন বাধ্য হয়ে সাপ খেলা, খেলনা, হাড়ি-পাতিল বিক্রির দোকান, গানের আসর ইত্যাদি স্টল সমূহের অনুমতি দিয়ে বইমেলাকে সাধারণ মেলায় পরিণত করেছেন। যা জাতির মেধা ও মনন নিয়ে খেল-তামাশার শামিল।

বই মানুষকে আলোকিত মানুষে পরিণত করে। কিন্তু সেটা কোন বই? বাংলা একাডেমীর প্রকাশিত কয়টা বই তেমন আছে? বরং এসব বই তো জাতিকে অন্ধকারে নিয়ে যাচ্ছে। দায়িত্বশীলগণ একবার ভেবে দেখবেন কি? *(স.স.)*।

মীরাছ বণ্টন : শারঈ দৃষ্টিকোণ

*ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ**

ভূমিকা :

মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদই হচ্ছে মীরাছ, যা মৃতের নিকটাত্মীয়রা লাভ করে। প্রাচীনকাল থেকে মৃতের সন্তানাদি ও আত্মীয়দের মাঝে সম্পত্তি বণ্টনের নিয়ম চলে আসছে। সম্পদ বণ্টনে অনিয়ম হ'লে উত্তরাধিকারীদের মাঝে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। অনেক ক্ষেত্রে তা প্রতিহিংসার চরম সীমায় উপনীত হয়। তাই মৃত ব্যক্তির সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনের গুরুত্ব অপরিসীম। এতে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন কল্যাণ নিহিত রয়েছে। নিম্নে মীরাছ বণ্টনের শারঈ দৃষ্টিকোণ তুলে ধরা হ'ল।-

মীরাছ-এর আভিধানিক অর্থ :

আরবী 'মীরাছ' (ميراث) শব্দটি ক্রিয়ামূল, যা وَرَثَ يَرِثُ إِرْثًا ومِيْرَاثًا থেকে উদগত। আভিধানিক অর্থ : অংশীদার হওয়া, হকদার হওয়া।[১] যেমন আল্লাহ বলেন, وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ 'সুলায়মান দাঊদের ওয়ারিছ হয়েছে' *(নামল ২৭/১৬)*।

কোন বস্তু এক সম্প্রদায় থেকে অপর সম্প্রদায় বা এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে স্থানান্তরিত হওয়া, চাই তা বিদ্যা, পদমর্যাদা বা সম্পদ হোক।[২] যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ 'আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিছ। নিশ্চয়ই নবীগণ কোন দিরহাম বা দীনারের ওয়ারিছ করেননি। বরং তাঁরা জ্ঞানের (ইলম) ওয়ারিছ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা অর্জন করেছে, সে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে'।[৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُوْنَ 'তারাই ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে, যেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে' *(মুমিনূন ২৩/১১)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَنَحْنُ الْوَارِثُوْنَ 'আমরাই উত্তরাধিকারী' *(হিজর ১৫/২৩)*।

পারিভাষিক অর্থ :

মীরাছ হ'ল মৃত ব্যক্তি হ'তে তার জীবিত ওয়ারিছদের নিকট মালিকানা স্থানান্তরিত হওয়া। যা স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ অথবা শারঈ যেকোন হক হোক।

মীরাছের বিষয়টি মানুষের মরণোত্তর সময়ের সাথে সম্পৃক্ত, তাই এর সংশ্লিষ্ট জ্ঞানকে 'নিছফুল ইলম' বা জ্ঞানের অর্ধেক বলা হয়েছে।[৪]

জাহেলী ও ইসলামী যুগে মীরাছের বিধান :

জাহেলী যুগে আরবে মীরাছ হ'তে মহিলাদেরকে কোন অংশ দেয়া হ'ত না। এক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, তারা যুদ্ধ-বিগ্রহ বা অন্য কোনভাবে নিজ সম্প্রদায়কে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে না। তারা বলত, 'যারা ঘোড়ায় চড়তে পারে না, তরবারী ব্যবহার করতে জানে না এবং শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে না, আমরা কিভাবে তাদেরকে সম্পদ প্রদান করতে পারি'? তাই তারা শিশুদের মত মেয়েদেরকেও উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করত।

ইসলামী শরী'আত মীরাছে তাদের হক প্রতিষ্ঠা করেছে। সম্মান ও ইযযতের সাথে তা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। এটা কারো দয়া বা অনুগ্রহ-অনুকম্পা নয়; বরং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের জন্য নির্ধারিত অংশ।

মীরাছের আয়াত সমূহ নাযিল হ'লে আরবদের কাছে তা অত্যন্ত কঠিন বলে মনে হয়। তাই তারা এ হুকুমের বিলুপ্তি কামনা করতে থাকে। কেননা এ নির্দেশ ছিল তাদের অভ্যাসের পরিপন্থী।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে ইবনু জারীর ত্বাবারী বর্ণনা করেন, যখন ফারায়েয সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হ'ল, যাতে আল্লাহ তা'আলা পুত্র ও কন্যা সন্তান এবং পিতা-মাতার অংশ নির্দিষ্ট করেছেন, তখন অনেকেই তা অপসন্দ করল। তারা বলল, স্ত্রীকে এক-চতুর্থাংশ বা এক-অষ্টমাংশ এবং মেয়েকে অর্ধেক ও ছোট শিশুকেও সম্পদ প্রদান করা হয়েছে। অথচ তারা কেউই গোত্রের প্রতিরক্ষার জন্য যুদ্ধ করে না এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করতে পারে না। তাই এ হাদীছ সম্পর্কে নীরব থাক। সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটা ভুলে যাবেন অথবা আমরা তাঁকে এ হুকুম পরিবর্তনের জন্য বলব। কেউ কেউ বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি শিশুকেও মীরাছ দিব, অথচ তারা কোন কাজে আসে না? মেয়েকে কি তার পিতার পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেক দেব, অথচ সে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করতে জানে না এবং গোত্রের জন্য যুদ্ধ করে না।

ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু সমাজে পিতার পক্ষ থেকে নারীরা কোন মীরাছ পায় না। বরং বিয়ের সময় যতটুকু দিয়ে কন্যা বিদায় করা হয়, তা-ই নারীর শেষ প্রাপ্য হিসাবে গণ্য হয়। অথচ ইসলামের বিধান ভিন্ন। ইসলামে নারীকে মীরাছ প্রদান করে তার প্রতি যুলুম ও বাড়াবাড়ির পথ রুদ্ধ করা হয়েছে। তাকে সম্পদের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে। পুরুষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের জন্য অংশ নির্দিষ্ট করা হয়েছে।[৫]

** সহকারী শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. মুহাম্মাদ আলী আছ-ছাবূনী, আল-মাওয়ারীছু ফিশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ (দামেশক : দারুল কলম, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃঃ ৩৩-৩৪।

২. ঐ, পৃঃ ৩৪।

৩. আবুদাঊদ হা/৩৬৪১; তিরমিযী হা/২৮৯৮; ইবনু মাজাহ হা/২২৩; মিশকাত হা/২১২, সনদ ছহীহ।

৪. আল-মাওয়ারীছ, পৃঃ ৩৪।

৫. আল-মাওয়ারীছ, পৃঃ ২০-২২; ছালেহ বিন ফাওযান, আত-তাহকীকাতুল মারযিয়্যাহ (রিয়ায : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ৩য় সংস্করণ ১৯৮৬ খ্রি.), পৃঃ ১৭-১৯।

মীরাছের আয়াত অবতীর্ণের কারণ :

একদা সা'দ বিন রাবী' (রাঃ)-এর স্ত্রী সা'দের ঔরষজাত দু'টি মেয়েকে সাথে নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এরা দুইজন সা'দ ইবনে রাবীর কন্যা। তাদের পিতা সা'দ ওহোদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। এখন তাদের চাচা তাদের সমস্ত সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, তাদের জন্য কিছুই রাখেনি। অর্থ ছাড়া তাদেরকে বিয়েও দেয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ ফায়ছালা দিবেন। এর পরেই উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ 'আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের (মধ্যে মীরাছ বণ্টনের) ব্যাপারে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান' *(নিসা ৪/১১)*। এরপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাদের চাচাকে এ নির্দেশ পাঠালেন যে, সা'দের মেয়েদেরকে দুই-তৃতীয়াংশ ও তাদের মাকে এক অষ্টমাংশ দাও এবং অবশিষ্টাংশ তোমার জন্য রাখো।[৬]

মীরাছ বণ্টনে শারঈ দৃষ্টিকোণ :

মহান আল্লাহ কুরআনে মীরাছ বণ্টনের বিধান উল্লেখ করেছেন এবং রাসূল (ছাঃ) কথা ও কাজের মাধ্যমে তার নমুনা রেখে গেছেন। নিম্নে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হতে মীরাছ বণ্টনের বিধান তুলে ধরা হ'ল।-

পবিত্র কুরআনে মীরাছের বিধান :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا 'পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ রয়েছে এবং পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের সম্পত্তিতে নারীদের অংশ রয়েছে, কম হৌক বা বেশী হৌক। এ অংশ সুনির্ধারিত' *(নিসা ৪/৭)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا- 'আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের (মধ্যে মীরাছ বণ্টনের) ব্যাপারে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। যদি তারা দুইয়ের অধিক কন্যা হয়, তাহ'লে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি কেবল একজনই কন্যা হয়, তবে তার জন্য অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার প্রত্যেকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ করে পাবে, যদি মৃতের কোন পুত্র সন্তান থাকে। আর যদি না থাকে এবং কেবল পিতা-মাতাই ওয়ারিছ হয়, তাহ'লে মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। কিন্তু যদি মৃতের ভাইয়েরা থাকে, তাহ'লে মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ মৃতের অছিয়ত পূরণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রদের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী, তা তোমরা জানো না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' *(নিসা ৪/১১)*।

তিনি আরো বলেন, وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ 'আর তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তোমরা অর্ধেক পাবে, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। যদি থাকে, তবে তোমরা সিকি পাবে, তাদের অছিয়ত পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর। আর তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে স্ত্রীরা সিকি পাবে, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। যদি থাকে, তবে তারা অষ্টমাংশ পাবে, তোমাদের অছিয়ত পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর। আর যদি পিতা ও সন্তানহীন কোন পুরুষ বা স্ত্রী মারা যায় এবং তার একজন ভাই অথবা বোন থাকে, তবে তারা প্রত্যেকে এক ষষ্ঠাংশ করে পাবে। আর যদি তারা একাধিক হয়, তাহ'লে তারা সকলে এক তৃতীয়াংশে শরীক হবে, অছিয়ত পূরণ অথবা ঋণ পরিশোধের পর, কাউকে কোনরূপ ক্ষতি না করে। এটি আল্লাহ প্রদত্ত বিধান। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সহনশীল' *(নিসা ৪/১২)*।

তিনি আরো বলেন, يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

৬. *তিরমিযী হা/২০৯২; আবুদাঊদ হা/২৮৯১; আত-তাহকীকাতুল মারযিয়্যাহ, পৃঃ ২২।*

Contents

يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ‘লোকেরা তোমার নিকট ফৎওয়া জানতে চাচ্ছে। তুমি বলে দাও, আল্লাহ তোমাদেরকে কালালাহ-র সম্পত্তি বণ্টন সম্পর্কে ফৎওয়া দিচ্ছেন; যদি কোন ব্যক্তি একক অবস্থায় মারা যায় যে, তার কোন সন্তান নেই কিন্তু একটি বোন আছে, তাহ'লে সে অর্ধেক পাবে। পক্ষান্তরে কালালাহ যদি নিঃসন্তান নারী হয় তাহ'লে তার ভাই তার পরিত্যক্ত সমুদয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। আর যদি কালালাহ ব্যক্তির দু'টি বোন থাকে, তবে তারা দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি তারা অনেক ভাই ও বোন থাকে, তাহ'লে ‘এক ভাই সমান দুই বোন’ নীতিতে সম্পত্তি বণ্টিত হবে। আল্লাহ তোমাদেরকে এগুলি বর্ণনা করছেন যাতে তোমরা বিভ্রান্ত না হও। বস্তুতঃ আল্লাহ সকল বিষয়ে সুবিজ্ঞ’ *(নিসা ৪/১৭৬)*।

হাদীছে মীরাছের বিধান :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِى أَيْدِيهِمْ، ‘এক-তৃতীয়াংশ। আর এক-তৃতীয়াংশই অধিক। ওয়ারিছকে সম্পদশালী অবস্থায় রেখে যাওয়া, তাদেরকে মানুষের নিকট মুখাপেক্ষী অবস্থায় রেখে যাওয়া অপেক্ষা উত্তম’।[৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ‘মুসলমান কাফেরের এবং কাফের মুসলমানের ওয়ারিছ হবে না’।[৮]

উপরোক্ত হাদীছদ্বয়ের প্রথমটিতে একজন ব্যক্তির অছিয়ত হ'তে কতটুকু অংশ কার্যকর হবে তা বর্ণিত হয়েছে। আর দ্বিতীয় হাদীছ দ্বারা মুসলিম অমুসলিমের এবং অমুসলিম মুসলিমের ওয়ারিছ হবে না, তা ফুটে উঠেছে।

পরিত্যক্ত সম্পদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলী :

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের সাথে বেশ কিছু কর্তব্য রয়েছে। প্রথমতঃ মৃত্যুর সময় থেকে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদ দ্বারা তার গোসল, কাফন, দাফন পর্যন্ত সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে হবে। সেক্ষেত্রে তার সম্পদের উপর ভিত্তি করে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে মৃতের দাফন সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী সমাপ্ত করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ তার ঋণ পরিশোধ করা। মৃতের নিকটে কোন মানুষের ঋণ থাকলে তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে ঋণ পরিশোধের পর বাকী সম্পদ ওয়ারিছদের মাঝে বণ্টিত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ ‘মুমিনের আত্মা ঋণ পরিশোধের পূর্ব পর্যন্ত ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে’।[৯]

তৃতীয়তঃ মৃতের অছিয়ত পূরণ করা। মৃতের অছিয়ত বাস্তবায়ন করতে হবে দাফন, কাফন ও ঋণ পরিশোধের পর।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِىْ أَعْمَالِكُمْ ‘আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মৃত্যুবরণের সময় এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ (অর্থাৎ অছিয়ত) দান করেছেন তোমাদের আমল বৃদ্ধি করার জন্য’।[১০] সুতরাং কেউ চাইলে এক-তৃতীয়াংশ দান করতে পারে, তার বেশী নয়।

চতুর্থতঃ পরিত্যক্ত সম্পদ ওয়ারিছদের মাঝে বণ্টন করতে হবে।[১১]

পুরুষের অংশ মহিলার দ্বিগুণ কেন?

জনমনে প্রশ্নের উদ্রেক হ'তে পারে, মহিলা দুর্বল ও সম্পদের অধিক মুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও তাকে পুরুষের অর্ধেক সম্পদ দেয়ার কারণ কি? এর জবাবে বলা যায়, এ বিধান মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। যিনি সৃষ্টিকুলের কল্যাণ সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।

ইসলামী শরী'আত বেশ কিছু যুক্তিসঙ্গত কারণে মীরাছে নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কারণ হ'ল।-

১. মহিলার প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার ছেলে, পিতা, ভাই বা অন্যান্য আত্মীয়ের উপর ন্যস্ত।

২. মহিলা নিজে কারো ব্যয়ভার বহনে বাধ্য নয়। অথচ পুরুষ পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও দাবীদারদের ভারণ-পোষণে আদিষ্ট।

৩. পুরুষের ব্যয় পরিমাণহীন ও তার সম্পদের আবশ্যকতা অধিক। সেহেতু তার অর্থের প্রয়োজন মহিলার চেয়ে বেশী।

৪. পুরুষ তার স্ত্রীর মোহর প্রদান করে এবং সন্তানদের ও স্ত্রীর অন্ন-বস্ত্রের ব্যয়ভার ও বাসস্থান নির্মাণের দায়িত্ব পালন করে।

৫. সন্তানদের লেখা-পড়া, চিকিৎসা, স্ত্রীর সকল ব্যয়ভার পুরুষের উপরই ন্যস্ত, মহিলার উপরে নয়।

একটি পরিবার ও তৎসংশ্লিষ্টদের সব ধরনের ভরণ-পোষণ ও খরচের বিষয়াদি পুরুষের উপরে ন্যস্ত। যা ইসলামী শরী'আত স্বীকৃত ও নির্দেশিত।[১২] এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী হ'ল- لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ ‘সম্পদশালীদের উচিৎ যে, সে যেন স্বীয় সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করে এবং যার আয়-উপার্জন কম তার উচিৎ যে, আল্লাহ তাকে যতটুকু দান করেছেন, তা হ'তে সে ব্যয় করবে’ *(তালাক ৬৫/৭)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ‘আর সন্তানের খাদ্য ও বস্ত্র নিয়ম মাফিক জন্মদাতার উপর ন্যস্ত’ *(বাক্বারাহ ২/২৩৩)*।

---

৭. ইবনু মাজাহ হা/২৭০৮; ছহীহ ইবনে খুযায়মা হা/২৩৫৫।
৮. বুখারী হা/৬৭৬৪; মুসলিম হা/৪২২৫; মিশকাত হা/৩০৪৩।
৯. তিরমিযী হা/১০৭৮; ইবনু মাজাহ হা/২৫০৬; মিশকাত হা/২৯১৫।
১০. ইবনু মাজাহ হা/২৭০৯; মুসনাদে আহমাদ হা/২৬২১০, সনদ হাসান।
১১. আল-মাওয়ারীছ, পৃঃ ৩৫-৩৬।
১২. ঐ, পৃঃ ১৮-১৯।

Contents

মীরাছের বিধান লংঘনের পরিণতি :

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে সূরা নিসার ১১-১২ ও ১৭৬ নং আয়াতে মীরাছ বণ্টনের নিয়ম-নীতি বর্ণনা করেছেন। যে এই নীতি বাস্তবায়ন করবে তার জন্য রয়েছে জান্নাত এবং যে তালবাহানা ও কৌশল অবলম্বন করে এ বণ্টনে কম-বেশী করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ، وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيْنٌ– 'এগুলি হ'ল আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ'ল মহা সফলতা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর সীমাসমূহ লংঘন করবে, তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরদিন থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি' *(নিসা ৪/১৩-১৪)*।

ইসলাম প্রদত্ত মীরাছের বিধান দ্বারা ব্যক্তির অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। মহান আল্লাহ মানব জাতির ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্যই এ বিধান অবতীর্ণ করেছেন।

ব্যক্তির হক নষ্টের জন্য ব্যক্তির নিকট থেকেই ক্ষমা নিতে হবে। যদি কেউ ব্যক্তির হক নষ্ট করে মৃত্যুবরণ করে তাহ'লে ক্বিয়ামতের দিন নিজের পুণ্য দিয়ে বা তার পাপ গ্রহণ করে তা পরিশোধ করতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ 'আর তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ করো না এবং অন্যের সম্পদ গর্হিত পন্থায় গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তোমরা জেনেশুনে তা বিচারকদের নিকট পেশ করো না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৮)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ. قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِى يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِى قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ.

'তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? ছাহাবীগণ বললেন, আমাদের মাঝে নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি, যার কোন অর্থ ও সামগ্রী নেই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমার উম্মতের নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি, যে ছালাত, ছিয়াম ও যাকাতের নেকী নিয়ে ক্বিয়ামতের মাঠে উপস্থিত হবে। অথচ সে কাউকে গালি দিয়েছে, কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে, কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে এবং কাউকে প্রহার করেছে। তখন তার নেকী হ'তে তাদেরকে পরিশোধ করা হবে। প্রাপ্য পরিশোধের পূর্বে তার নেকী শেষ হয়ে গেলে তাদের পাপ নিয়ে তার উপর চাপানো হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[১৩]

বর্তমানে অধিকাংশ মানুষই মীরাছ বণ্টনের শারঈ বিধান লংঘন করে চলেছে। মীরাছ বণ্টনে শরী'আতের সীমাকে উপেক্ষা করে নিজ স্বার্থ হাছিলের চেষ্টা করছে। যেমন পিতা কর্তৃক পুত্র সন্তানদেরকে মীরাছ প্রদান করা এবং কন্যাদেরকে বঞ্চিত করা। চাচা কর্তৃক নাবালিকা ভাতিজাদের মীরাছ থেকে বঞ্চিত করা। বিধবা পিতা-মাতাকে বশীভূত করে প্রভাবশালী সন্তান কর্তৃক সম্পদ আত্মসাৎ করা। বড় ভাই কর্তৃক পিতার সম্পদ সুষ্ঠু বণ্টন না করে অন্যান্য ভাই-বোনদের সাধ্যমত বঞ্চিত করা। অপরিচিতা কোন মহিলাকে ফুফু বানিয়ে নিজ ফুফুর জমি জাল দলীল করে আত্মসাৎ করা। কাউকে পিতা বানিয়ে নিজ পিতার জমি জাল দলীল করে প্রভাবশালী পুত্রের আত্মসাৎ করা। অনুরূপ বহু ঘটনা বর্তমান সমাজে অহরহ ঘটছে। ফলে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে অশান্তির দাবানল দাউদাউ করে জ্বলছে।

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামের মীরাছ বিধান ন্যায়-নীতিপূর্ণ। এ বিধান পালনে আমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর লংঘনে রয়েছে কঠিন শাস্তি। সুতরাং আমরা প্রত্যেককে তার ন্যায্য মীরাছ প্রদান করে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন-আমীন!

---

১৩. *মুসলিম হা/৪৬৭৮; মিশকাত হা/৫১২৮।*

মৃত ব্যক্তির নিকট কুরআন তেলাওয়াতের বিধান

*মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম**

ভূমিকা : কুরআন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে জিবরীল (আঃ)-এর মাধ্যমে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ এলাহী কিতাব। এ কিতাবের মাঝে যেমন মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে, তেমনি এটি তেলাওয়াত করলে এর প্রতিটি বর্ণের বিনিময়ে দশটি করে নেকী পাওয়া যায়।[১] বিশ্বের এমন কোন গ্রন্থ নেই, যা তেলাওয়াত করলে জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ছওয়াব অর্জিত হয়। এই পবিত্র গ্রন্থের তেলাওয়াতকারী ও হাফেয জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান লাভ করবে।[২] সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে অবস্থান করবে।[৩] তার সুফারিশ কবুল করা হবে।[৪] এর তেলাওয়াতকারী ও তার মা-বাবাকে জান্নাতের রেশমী পোশাক ও তাজ পরিধান করানো হবে।[৫] তাদের উপর আল্লাহ্র রহমত ও অনুগ্রহ নাযিল হয় এবং রহমতের ফেরেশতাগণ তাদের বেষ্টন করে রাখে।[৬] কিন্তু এ গ্রন্থের বিধি-বিধান জীবিত ব্যক্তির জন্য। কেউ মারা গেলে তার উপরে শরী'আতের বিধান প্রযোজ্য নয়। কুরআন তেলাওয়াত যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, তেমনি এটি শ্রবণও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শ্রবণের এ বিষয়টিও মানুষের জীবদ্দশায় প্রযোজ্য। এ নিবন্ধে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির নিকটে কুরআন তেলাওয়াতের বিধান আলোচনা করা হ'ল।-

জীবিত ব্যক্তির নিকট কুরআন তেলাওয়াতের বিধান

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ 'আর যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাকো, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হ'তে পার' *(আ'রাফ ৭/২০৪)*। জীবিত ব্যক্তির কুরআন তেলাওয়াত শুনতে কোন বাধা নেই। এমনকি মুমূর্ষু ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করতে চাইলে তার পাশে বসে কুরআন তেলাওয়াত করা যেতে পারে। তবে মৃত ব্যক্তির কল্যাণে তার পাশে বা বাড়িতে কিংবা কবরস্থানে কুরআন তেলাওয়াত করার কোন বিধান শরী'আতে নেই। এটি স্পষ্ট বিদ'আত।

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : اقْرَأْ عَلَيَّ، قَالَ : قُلْتُ : أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ، قَالَ إِنِّى أَشْتَهِى أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِىْ، قَالَ فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ- فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيْدًا- قَالَ لِى : كُفَّ- أَوْ أَمْسِكْ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانِ-

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমার নিকট কুরআন তেলাওয়াত কর। আমি বললাম, আমি আপনার নিকটে কুরআন তেলাওয়াত করব অথচ তা আপনার উপরই নাযিল হয়েছে? তিনি বললেন, আমি তা অন্যের নিকট থেকে শ্রবণ করতে চাই। বর্ণনাকারী বলেন, আমি সূরা নিসা তেলাওয়াত করে এ আয়াতে যখন পৌঁছলাম 'অতএব সেদিন কেমন হবে, যেদিন আমরা প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী (নবী) আনব এবং তোমাকে তাদের সকলের উপর সাক্ষী করব'? *(নিসা ৪/৪১)*। তখন তিনি আমাকে বললেন, থাম। আমি দেখলাম তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে'।[৭]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ قِرَاءَةَ أَبِيْ مُوْسَى فَقَالَ لَقَدْ أُوتِيَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ آلِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) আবু মূসা (রাঃ)-এর কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করে বললেন, তাঁকে দাঊদ (আঃ)-এর সুন্দর সুর দান করা হয়েছে'।[৮] এ হাদীছ থেকে বুঝা যায়, রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদের কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করতেন। সুতরাং জীবিত ব্যক্তির নিকট কুরআন তেলাওয়াতে কোন বাধা নেই। বরং যে কুরআন তেলাওয়াত করবে এবং শ্রবণ করবে উভয়ে ছওয়াব অর্জন করবে।

মুমূর্ষু ব্যক্তির জন্য করণীয়

অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলে তার সুস্থতার জন্য দো'আ করতে হবে। এ ব্যাপারে বহু দো'আ বর্ণিত হয়েছে। তবে যদি ধারণা হয় যে, এ ব্যক্তি মরণাপন্ন তাহ'লে তাকে কালেমার তালক্বীন দিতে হবে।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের মৃত্যুপথযাত্রীকে কালেমা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'র তালক্বীন দিবে (অর্থাৎ তার কানের কাছে আস্তে আস্তে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করতে থাকবে)।[৯] রাসূল (ছাঃ) মুমূর্ষু ব্যক্তিদের তালক্বীন প্রদানে উৎসাহিত করে বলেন,

لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ تَخْرُجُ رَشْحًا، وَنَفْسَ الْكَافِرِ تَخْرُجُ مِنْ شِدْقِهِ، كَمَا تَخْرُجُ نَفْسُ الْحِمَارِ-

---

* নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

১. তিরমিযী হা/২৯১০; মিশকাত হা/২১৩৭; ছহীহাহ হা/৩৩২৭।
২. আবুদাউদ হা/১৪৬৪; মিশকাত হা/২১৩৪; ছহীহাহ হা/২২৪০।
৩. বুখারী হা/৪৯৩৭; মুসলিম হা/৭৯৮।
৪. হাকেম হা/২০৩৬; মিশকাত হা/১৯৬৩; ছহীহু তারগীব হা/৯৮৪।
৫. তিরমিযী হা/২৯১৫; ছহীহাহ হা/২৮২৯।
৬. মুসলিম হা/২৬২৯; মিশকাত হা/২০৪।
৭. বুখারী হা/৫০৫৫; মুসলিম হা/৮০০।
৮. বুখারী হা/৫০৪৮; নাসাঈ হা/১০১৯; ইবনু মাজাহ হা/১৩৪১।
৯. মুসলিম হা/৯১৬, ৯১৭; মিশকাত হা/১৬১৬; ছহীহুল জামে' হা/৪১৪৮।

'তোমরা তোমাদের মৃত্যুপথযাত্রীকে কালেমা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'র তালক্বীন দিবে (অর্থাৎ তার কানের কাছে আস্তে আস্তে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করতে থাকবে)। কেননা মুমিনদের আত্মা ঘর্মাক্ত হয়ে (অর্থাৎ দ্রুত) বের হয়। অপরদিকে কাফিরদের আত্মা গাধার আত্মার ন্যায় চোয়াল দিয়ে বের হয়।[১০] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন,

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلِمَتِه لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ-

'তোমরা তোমাদের মৃত্যুপথযাত্রীকে কালেমা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'র তালক্বীন দিবে। কেননা মৃত্যুর সময় যার শেষ বাক্য 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্' হবে সে কোন এক সময় জান্নাতে প্রবেশ করবে। ইতিপূবে সে যে আমলই করে থাকুক না কেন'।[১১]

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ، أَوِ الْمَيِّتَ، فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ-

উম্মে সালামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন অসুস্থ বা মৃত (আসন্ন) ব্যক্তির নিকটে তোমরা হাযির হ'লে তার সম্পর্কে ভাল কথা বলবে। কেননা তোমরা যা বল সে সম্পর্কে ফেরেশতাগণ আমীন বলেন'।[১২]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَادَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ : يَا خَالُ قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَقَالَ : أَخَالٌ أَمْ عَمٌّ فَقَالَ : لاَ بَلْ خَالٌ، قَالَ فَخَيْرٌ لِى أَنْ أَقُوْلَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ —

আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) এক আনছারী ছাহাবীকে দেখতে গিয়ে বললেন, হে মামা! আপনি 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করুন। তখন সে বলল, মামা, না চাচা? তিনি বললেন, না বরং মামা। সে বলল, আমার জন্য কালেমা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করা উত্তম হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ'।[১৩]

অমুসলিমদেরকেও কালেমা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'র তালক্বীন দেওয়া যাবে। রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা আবু ত্বালিবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হ'লে তাকে লক্ষ্য করে বললেন, চাচাজান, 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' কালেমাটি একবার পড়ুন, তাহ'লে আমি আপনার জন্য আল্লাহ্র নিকট কথা বলতে পারব'।[১৪] এছাড়া এক ইহূদী বালক নবী করীম (ছাঃ)-এর খিদমত করত। সে একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী করীম (ছাঃ) তাকে দেখার জন্য আসলেন। তিনি তার মাথার নিকট বসে তাকে বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তুমি কালেমা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' পাঠ কর। সে তখন তার পিতার দিকে তাকাল, যে তার নিকটেই ছিল। পিতা তাকে বলল, আবুল কাসেম [নবী (ছাঃ)]-এর কথা মেনে নাও। তখন সে ইসলাম গ্রহণ করল। রাসূল (ছাঃ) সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় এরশাদ করলেন, যাবতীয় প্রশংসা সে আল্লাহ্র, যিনি তাকে জাহান্নাম হ'তে মুক্তি দিলেন'।[১৫] এর কিছুক্ষণ পর সে মারা যায়।

তবে এক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি করা যাবে না। কারণ চাপ সৃষ্টি করলে সে এ কালেমা অস্বীকার করতে পারে। ইবনুল মুবারকের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে লোকেরা তাকে বেশী বেশী কালেমার তালক্বীন দেওয়া শুরু করে। তখন তিনি বলেন, তোমরা ভালো কাজ করছ না। আমার মৃত্যুর পর তোমরা লোকদের কষ্টে ফেলে দিবে। তোমরা যখন আমাকে তালক্বীন দিবে আর আমি কালেমা পাঠ করব এবং অন্য কোন কথা বলব না তখন তোমরা আর কিছু বলবে না। আর যদি কথা বলি তাহ'লে আবার তালক্বীন দিবে যাতে শেষ কালেমা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' হয়।[১৬]

শায়খ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, মুমূর্ষু ব্যক্তির অবস্থার উপর ভিত্তি করে তালক্বীন দিতে হবে। সে খাঁটি মুমিন হ'লে বা কাফির হ'লে কালেমা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' পাঠের নির্দেশ দিতে হবে। আর দুর্বল হৃদয়ের মানুষ হ'লে তার নিকট কেবল কালেমা বা অনুরূপ কিছু পাঠ করতে হবে'।[১৭]

একজন মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো পাঠ করা শরী'আতসম্মত এবং এগুলো সালাফে ছালেহীনের আমল দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট কুরআন তেলাওয়াত সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহ যঈফ অথবা জাল। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে সে হাদীছগুলোর দুর্বলতার দিকগুলি এখানে উল্লেখ করা হ'ল।-

١. عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم اقْرَءُوْا (يس) عَلَى مَوْتَاكُمْ-

১. মা'কিল ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের মৃতদের কাছে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত কর'।[১৮]

হাদীছটি দু'টি কারণে আমলযোগ্য নয়। প্রথমতঃ বর্ণনাটি যঈফ। আর তিনটি কারণে হাদীছটি যঈফ। আবু ওছমান ও তার পিতা অপরিচিত রাবী। তাছাড়া এ বর্ণনায় 'ইযতিরাব'

---

১০. *মু'জামুল কাবীর হা/১০৪১৭; ছহীহাহ হা/২১৫১; ছহীহুল জামে' হা/৫১৪৯।*
১১. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩০০৪; ছহীহুল জামে' হা/৫১৫০, সনদ ছহীহ।*
১২. *মুসলিম হা/৯১৯; মিশকাত হা/১৬১৭।*
১৩. *আহমাদ হা/১২৫৮৫; আবু ইয়া'লা হা/৩৫১২; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৩৯২২, সনদ ছহীহ।*
১৪. *বুখারী হা/৩৮৮৪; মুসলিম হা/২৪।*
১৫. *বুখারী হা/১৩৫৬, ১৩৪২; মিশকাত হা/১৫৭৪।*
১৬. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৮/৪১৮,।*
১৭. *শারহুল মুমতে' ৫/১৭৭।*
১৮. *আবুদাঊদ হা/৩১২১; আহমাদ হা/১৪৬৫৬; মিশকাত হা/১৬২২; যঈফুল জামে' হা/১০৭২; যঈফাহ হা/৫৮৬১।*

রয়েছে।[১৯] হাফেয যাহাবী বলেন, আবু ওছমান ও তার পিতা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।[২০] ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর শিক্ষক আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, আবু ওছমান এমন রাবী যার থেকে সুলায়মান তায়মী ব্যতীত কেউ হাদীছ বর্ণনা করেনি। এর সনদ অজ্ঞাত।[২১] ইমাম দারাকুৎনী (রহঃ) বলেন, এই হাদীছের সনদ যঈফ, মতন অপরিচিত এবং এ বিষয়ে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি।[২২] শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট সূরা ইয়াসীন পাঠের পক্ষে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি।[২৩] শায়খ বিন বায বলেন, প্রচলিত হাদীছটিতে আবু ওছমান নামে একজন অপরিচিত রাবী থাকায় তা যঈফ। অতএব মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করা সিদ্ধ নয়।[২৪]

দ্বিতীয়তঃ এ সকল হাদীছে বর্ণিত মৃত ব্যক্তি বলতে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। আর মুমূর্ষু ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত শুনতে চাইলে তার নিকট কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে। তবে দলবদ্ধভাবে মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকটে কুরআন খতমের প্রচলিত পদ্ধতি জঘন্য বিদ‘আত।

২. عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَإِنَّ قَلْبَ الْقُرْآنِ يس وَمَنْ قَرَأَ يس وَهُوَ يُرِيدُ بِهَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ، وَأُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ كَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ قُرِئَ عِنْدَهُ إِذَا نَزَلَ بِهِ مَلَكُ الْمَوْتِ سُورَةُ يس نَزَلَ بِكُلِّ حَرْفٍ مِنْ سُورَةِ يس عَشَرَةُ أَمْلَاكٍ يَقُومُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ صُفُوفًا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ، وَيَشْهَدُونَ غُسْلَهُ، وَيُشَيِّعُونَ جِنَازَتَهُ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، وَيَشْهَدُونَ دَفْنَهُ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ قَرَأَ يس وَهُوَ فِي سَكَرَاتِ الْمَوْتِ لَمْ يَقْبِضْ مَلَكُ الْمَوْتِ رُوحَهُ حَتَّى يَجِيئَهُ رِضْوَانُ خَازِنُ الْجَنَّةِ بِشَرْبَةٍ مِنْ شَرَابِ الْجَنَّةِ فَيَشْرَبُهَا، وَهُوَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَيَقْبِضُ مَلَكُ الْمَوْتِ رُوحَهُ وَهُوَ رَيَّانُ، فَيَمْكُثُ فِي قَبْرِهِ وَهُوَ رَيَّانُ، وَيُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ رَيَّانُ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى حَوْضٍ مِنْ حِيَاضِ الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ رَيَّانُ-

২. উবাই বিন কা‘ব হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘প্রত্যেক জীবের হৃদয় রয়েছে। আর কুরআনের হৃদয় হ’ল সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং ১২ বার কুরআন খতম করার ছওয়াব দিবেন। আর যে মুসলিম ব্যক্তির মৃত্যুর সময় সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করা হয়, প্রত্যেক হরফের বিনিময়ে দশজন করে ফেরেশতা অবতরণ করে। যারা তার সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তার জন্য রহমতের দো‘আ করে, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, তার গোসলদানে অংশগ্রহণ করে, জানাযা অনুসরণ করে চলে, তার জন্য দো‘আ করে এবং দাফন কার্যে অংশগ্রহণ করে। আর যে মুসলিম ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থায় (মৃত্যুর যন্ত্রণাকালীন সময়ে) সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করবে, মৃত্যুর ফেরেশতা ততক্ষণ তার জান কবয করবে না যতক্ষণ না জান্নাতের প্রহরী রিযওয়ান জান্নাতের শরাব নিয়ে এসে পান করাবে। অথচ সে নিজ বিছানায় শুয়ে থাকবে। অতঃপর মালাকুল মওত তার জান কবয করবে এমতাবস্থায় সে পরিতৃপ্ত থাকবে। সে পরিতৃপ্ত অবস্থায় কবরে অবস্থান করবে, পরিতৃপ্ত অবস্থায় ক্বিয়ামতের দিন উত্থিত হবে এবং নবীগণের হাউযে কাওছারের পানি পানের প্রতি অমুখাপেক্ষী থেকেই পরিতৃপ্ত অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে’।[২৫]

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, বর্ণনাটি জাল। এ হাদীছের বর্ণনাকারী মুখাল্লাদ হাদীছ জাল করত। ইবনু হিব্বান বলেন, মুখাল্লাদ অত্যন্ত অগ্রহণযোগ্য রাবী। আযদী বলেন, সে মিথ্যুক, হাদীছ জালকারী। রাযী বলেন, সে যঈফ হাদীছ বর্ণনাকারী।[২৬] যাহাবী বলেন, সে মুনকারুল হাদীছ।[২৭] এছাড়া ইউসুফ ইবনু আতিয়া হাদীছ জালকারী। আমর ইবনু আলী ফাল্লাস বলেন, সে ইউসুফ ইবনু আতিয়া থেকেও অধিক মিথ্যাবাদী। দারাকুৎনী বলেন, তারা দু’জনই মাতরূকুল হাদীছ। যাকারিয়া আনছারী ও খাফাজী অত্র হাদীছটিকে জাল বলেছেন।[২৮]

৩. عَنْ صَفْوَانَ حَدَّثَنِى الْمَشْيَخَةُ أَنَّهُمْ حَضَرُوا عِنْدَ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ الثُّمَالِىِّ حِينَ اشْتَدَّ سَوْقُهُ فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ يس قَالَ فَقَرَأَهَا صَالِحُ بْنُ شُرَيْحٍ السَّكُونِىُّ فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ مِنْهَا قُبِضَ. قَالَ وَكَانَ الْمَشْيَخَةُ يَقُولُونَ إِذَا قُرِئَتْ عِنْدَ الْمَيِّتِ خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا. قَالَ صَفْوَانُ وَقَرَأَهَا عِيسَى بْنُ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ ابْنِ مَعْبَدٍ-

৩. ছাফওয়ান হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট শায়খগণ বর্ণনা করেন যে, গুযাইফ বিন হারেছ আছ-ছুমালী যখন মরণাপন্ন হ’ল তখন তারা তার নিকট হাযির হ’ল। সে বলল, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করবে? ছালেহ বিন শুরাইহ আস-সাকূনী তা

---

১৯. আলবানী, যঈফাহ হা/৫৮৬১; ইরওয়া হা/৬৮৮; যঈফুল জামে‘ হা/১০৭২।
২০. মীযানুল ই‘তিদাল ৭/৩৯৮, ৪/৫৫০, রাবী নং ১০৪০৯।
২১. মীযানুল ই‘তিদাল ৪/৫৫০ রাবী নং ১০৪০৪।
২২. ইবনু হাজার, আত-তালখীছ ২/২১৩, হা/৭৩৫।
২৩. আলবানী, আহকামুল জানায়েয, ১/১১৪, মাসআলা ১৫ দ্রঃ।
২৪. মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১৩/৯৩-৯৪।
২৫. মুসনাদুশ শিহাব হা/১০৩৬; তাফসীরে কাশ্শাফ ৪/৩২; তাফসীরে বায়যাভী, সূরা ইয়াসীনের তাফসীর দ্রষ্টব্য; যঈফাহ/৪৬৩৬, ৫৮৭০; যঈফুল জামে‘ হা/১৯৩৫; যঈফ তারগীব হা/৮৮৫।
২৬. ইবনুল জাওযী, আয-যু‘আফা ৩/১১১, রাবী নং ৩২৬৮।
২৭. আল-মুগনী ২/৬৪৮, রাবী নং ৬১৩৭।
২৮. যঈফা হা/৪৬৩৬, ৫৮৭০; ইবনু হাজার, লিসানুল মীযান ৬/০৮, রাবী নং ২৫; যাহাবী, মীযান ৪/৮৩, রাবী নং ৮৩৯০।

Contents

তেলাওয়াত করলেন। চল্লিশ আয়াত তেলাওয়াত না করতেই তার জান কবয করা হ'ল। আর শায়খগণ বলতেন, মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করা হ'লে এর মাধ্যমে মৃত্যুর যন্ত্রণা হালকা করা হয়। বর্ণনাকারী ছাফওয়ান বলেন, ঈসা বিন মু'তামির ইবনু মা'বাদের নিকট সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করেছিলেন।[২৯]

ইবনু তায়মিয়াহ ও ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এর সনদ হাসান।[৩০] শায়খ আলবানী বলেন, এ আছারের সনদ ছহীহ।[৩১] তবে বর্ণনাটি যঈফ। কারণ সনদে ছালেহ বিন শুরাইহ নামক রাবী আছে, যাকে আবু যুর'আ মাজহূল বা অপরিচিত বলেছেন।[৩২] গুযাইফ বিন হারেছ একজন ছাহাবী ছিলেন। হাদীছ হাসান হ'লেও তার আমলকে সুন্নাত হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। তবে জীবিত ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করতে চাইলে তার নিকট সূরা ইয়াসীনসহ যে কোন সূরা তেলাওয়াত করা যেতে পারে।

৪. عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ عِنْدَ الْمَيِّتِ سُوْرَةَ الرَّعْدِ

৪. জাবের বিন যায়েদ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, তিনি মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট সূরা রা'দ তেলাওয়াত করতেন।[৩৩]

৫. وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ : مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيُقْرَأُ عِنْدَهُ يس إِلاَّ هَوَّنَ اللهُ عَلَيْهِ-

৫. আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করা হ'লে আল্লাহ সহজে তার জান কবযের ব্যবস্থা করে দেন'।[৩৪]

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, হাদীছটি জাল। উক্ত বর্ণনায় মারওয়ান নামে একজন রাবী আছে, যে হাদীছ জাল করত। ইমাম বুখারী, মুসলিম ও আবু হাতেম তার ব্যাপারে বলেন, সে মুনকারুল হাদীছ। আবু আরূবা হাররানী বলেন, সে হাদীছ জালকারী। সাজী বলেন, সে মিথ্যুক, হাদীছ জালকারী।[৩৫] ইমাম আহমাদ ও ইবনু মাঈন বলেন, মারওয়ান বিশ্বস্ত নয়।[৩৬]

৬. عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ : كَانَتِ الأَنْصَارُ يَقْرَؤُوْنَ عِنْدَ الْمَيِّتِ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ-

৬. শা'বী হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আনছারগণ মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট সূরা বাক্বারাহ তেলাওয়াত করতেন'।[৩৭] এর সনদে মুজালিদ নামে একজন রাবী আছে, যার ব্যাপারে ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, সে শক্তিশালী নয়।[৩৮]

ইমাম আহমাদ, ইমাম বুখারী, উকাইলী, ইবনু হিব্বান, ইমাম নাসাঈ, দারাকুৎনী প্রমুখ তাকে যঈফ বলেছেন। আশাজ তাকে শী'আ বলে অভিহিত করেছেন।[৩৯]

৭. عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَتِ الْأَنْصَارِ إِذَا مَاتَ لَهُمِ الْمَيِّتُ اخْتَلِفُوا إِلَى قَبْرِه يقرءُون عِنْده الْقُرْآن-

৭. শা'বী হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আনছারদের কেউ যখন মারা যেত, তখন তারা বারবার তার কবরের নিকট এসে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করতেন।[৪০]

শায়খ আলবানী বলেন, ইবনু আবী শায়বাহ (রহঃ) 'রোগীর মৃত্যুর সময় আসন্ন হ'লে তার নিকট যা বলতে হবে' নামে অধ্যায় রচনা করেছেন। এ থেকে বুঝা যায়, এটি কবরের নিকট পাঠের বিষয় নয় বরং মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট পাঠের বিষয়। দ্বিতীয়তঃ হাদীছটি যঈফ।[৪১] এ বর্ণনার সনদেও মুজালিদ বিন সাঈদ যঈফ রাবী রয়েছে। যার হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।[৪২]

৮. عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْبَقَرَةُ سَنَامُ الْقُرْآنِ وَذُرْوَتُهُ، وَنَزَلَ مَعَ كُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ثَمَانُونَ مَلَكاً وَاسْتُخْرِجَتْ (اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ فَوُصِلَتْ بِهَا أَوْ فَوُصِلَتْ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ وَ(يس) قَلْبُ الْقُرْآنِ لاَ يَقْرَأُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالدَّارَ الآخِرَةَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ وَاقْرَءُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ-

৮. মা'কিল বিন ইয়াসার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সূরা বাক্বারাহ কুরআনের কুঁজ এবং শীর্ষ চূড়া। তার প্রত্যেক আয়াতের বিনিময়ে আশিজন ফেরেশতা অবতরণ করেন। অতঃপর আয়াতুল কুরসী আরশের নীচ হ'তে বের করে তার সাথে মিলানো হয়। এটা সূরা বাক্বারাহ এবং কুরআনের হৃদয় সূরা ইয়াসীনের সাথে সংযুক্ত করা হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও পরকালের প্রত্যাশায় সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আর তোমরা এটি তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিদের নিকট তেলাওয়াত কর'।[৪৩]

---

২৯. *শু'আইব আরনাউত বলেন, আছার হাসান, আহমাদ হা/১৭০১০।*
৩০. *আল-ইছাবাহ ৫/৩২৪।*
৩১. *ইরওয়া ৩/১৫২; আল-ইখতিয়ারাত ১/৯১ ও ১/৪৪৭।*
৩২. *আল-জারহ ওয়াত তা'দীল ৪/৪০৫, রাবী নং ১৭৭৫; ইবনুল জাওযী, আয-যু'আফা ওয়াল মাতরূকীন ২/৪৯, রাবী ১৬৬৩; যাহাবী, আল-মুগনী ফিয-যু'আফা ১/৩০৪, রাবী নং ২৮৩০; মীযানুল ই'তিদাল ২/২৯৫, রাবী নং ৩৭৯৯।*
৩৩. *ইবনু আবী শায়বাহ হা/১০৯৫৭, ১০৮৫২-* এর সনদের বিশুদ্ধতা জানা যায়নি। তবে ছহীহ নয় বলেই অনুমেয়।
৩৪. *দায়লামী হা/৬০৯৯; যঈফাহ হা/৫২১৯, ৫৮৬১; ইরওয়া হা/৬৮৮।*
৩৫. *যঈফা হা/৫২১৯; মীযানুল ই'তিদাল ৪/৯০, রাবী নং ৮৪২৫।*
৩৬. *আল-ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল ৩/২১০, রাবী নং ৪৯০৯; তারীখু ইবনু মঈন ১/৫৫।*

---

৩৭. *ইবনু আবী শায়বাহ হা/১০৯৫৩, ১০৮৪৮; আহকামুল জানায়েয ১/৯৩।*
৩৮. *আত-তাক্বরীব ২/২২৯।*
৩৯. *তাহযীবুল কামাল ২৭/২৫; মীযানুল ই'তিদাল ৩/৪৩৮, রাবী নং ৭০৭০।*
৪০. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আর-রূহ ১/১১; আহকামুল জানায়েয ১/১৯৩; মিরক্বাত ৩/১২২৮; আবুবকর আল-খাল্লাল, আল-আমরু বিল মা'রূফ, হা/২৪৯; আল-ক্বিরাআত ইনদাল কুবূর হা/০৯।*
৪১. *আহকামুল জানায়েয ১/১৯৩।*
৪২. *তাহযীবুল কামাল ২৭/২৫; মীযানুল ই'তিদাল ৩/৪৩৮, রাবী নং ৭০৭০।*
৪৩. *আহমাদ হা/২০৩১৫; মু'জামুল কাবীর হা/৫৪১,৫১১; যঈফ তারগীব হা/৮৭৮; যঈফাহ হা/৬৮৪৩; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১০৮৪০।*

অত্র বর্ণনাটি দু'টি কারণে যঈফ। প্রথমতঃ এর সনদে দু'জন রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। যেখানে রাবীর নাম উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও বর্ণনাকারীর দুর্বলতার কারণে হাদীছ যঈফ হয়ে যায়। সেখানে অত্র হাদীছে দু'জন রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ এর সনদে ইযতিরাব রয়েছে।[৪৪]

٩. عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ اللَّجْلَاجِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ لِي أَبِي : يَا بُنَيَّ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَلْحِدْنِي، فَإِذَا وَضَعْتَنِي فِي لَحْدِي فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ، ثُمَّ سِنَّ عَلَيَّ الثَّرَى سِنًّا، ثُمَّ اقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِي بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ –

৯. আব্দুর রহমান ইবনুল আ'লা ইবনুল লাজলাজ তার পিতা হ'তে বর্ণনা করে বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেন, হে বৎস! আমি মৃত্যুবরণ করলে আমাকে লাহাদ কবর দিবে (কবরস্থ করবে)। আমাকে যখন কবরে রাখবে তখন বলবে 'বিসমিল্লা-হি ওয়া 'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ'। অতঃপর আমার উপর পূর্ণ মাত্রায় মাটি ঢেলে দিবে। এরপর আমার মাথার নিকট সূরা বাক্বারার শুরু ও শেষের অংশ তেলাওয়াত করবে। কারণ আমি রাসূল (ছাঃ)-কে তা বলতে শুনেছি।[৪৫]

আব্দুর রহমান বিন আ'লা বিন লাজলাজ অপরিচিত রাবী।[৪৬] কারণ তার থেকে মুবাশশির বিন ইসমাঈল ব্যতীত কেউ হাদীছ বর্ণনা করেনি। অতএব অত্র আছারটি দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। আলী বিন মূসা আল-হাদ্দাদ বলেন,

كنت مع أحمد ابن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر، فقال له أحمد: يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة، فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لاحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي ؟ قال: ثقة قال: كتبت عنه شيئا ؟ قال: نعم، قال: فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك، فقال له أحمد: فارجع فقل للرجل يقرأ–

'আমি আহমাদ বিন হাম্বল ও মুহাম্মাদ বিন কুদামা জাওহারীর সাথে কোন এক জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। মাইয়েতের দাফন সম্পন্ন হ'লে জনৈক অন্ধ কবরের নিকট বসে কুরআন তেলাওয়াত শুরু করল। তখন ইমাম আহমাদ তাকে বললেন, ওহে! কবরের নিকট কুরআন তেলাওয়াত বিদ'আত। আমরা যখন কবরস্থান হ'তে বের হ'লাম তখন ইবনু কুদামা ইমাম আহমাদকে বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান! মুবাশশির আল-হালাবীর ব্যাপারে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন, সে বিশ্বস্ত। আপনি তার থেকে কোন কিছু লিখেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন ইবনু কুদামা বললেন, মুবাশশির আব্দুর রহমান বিন আ'লা বিন লাজলাজ তার পিতা হ'তে আমাকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এ মর্মে উপদেশ দিয়েছেন যে, যখন তাকে দাফন করা হবে তখন যেন তার মাথার নিকট সূরা বাক্বারার শুরু ও শেষাংশ তেলাওয়াত করা হয়। আর তিনি বলেন, আমি ইবনু ওমরকে এ মর্মে অছিয়ত করতে শুনেছি। তখন ইমাম আহমাদ তাকে বললেন, ফিরে গিয়ে ঐ লোকটিকে বল, সে যেন কুরআন তেলাওয়াত করে'।[৪৭]

এ বর্ণনার সনদে এমন একজন রাবী আছে, যার পরিচয় জানা যায় না। তাছাড়া ইমাম আহমাদ কি লোকটিকে কবরের নিকট কুরআন তেলাওয়াত করতে বললেন, অথচ তিনি এ বিষয়টিকে বিদ'আত বলেছেন। তাকে কবরের নিকট কুরআন পাঠের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, তা করা যাবে না।[৪৮] আহমাদ থেকে এ ঘটনার বর্ণনার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। কারণ খাল্লালের শায়খ হাসান বিন আহমাদের পরিচয় রিজাল শাস্ত্রের কিতাবে পাওয়া যায় না। অনুরূপ তার শায়খ আলী বিন মূসার পরিচয়ও পাওয়া যায় না। আর যদি ঘটনা সত্য বলেও ধরে নেয়া হয়, তাহ'লে ইমাম আহমাদের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হ'ল কবরের নিকট কুরআন তেলাওয়াত মাকরূহ। আহমাদের ঘটনা সত্য মনে করলেও ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে এরূপ অছিয়ত ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়নি। কারণ আব্দুর রহমান বিন আ'লা বিন লাজলাজ অপরিচিত রাবী।[৪৯] কারণ তার থেকে মুবাশশির বিন ইসমাঈল ব্যতীত কেউ হাদীছ বর্ণনা করেনি। তাছাড়া সনদ সাব্যস্ত হ'লেও তা হবে মাওকূফ। যাতে মূলত কোন দলীল নেই।[৫০]

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত ও তার মুখমণ্ডল ক্বিবলার দিকে ঘুরানোর ব্যাপারে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি।[৫১] ইমাম মালেক (রহঃ) মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট কুরআন তেলাওয়াতকে মাকরূহ মনে করতেন। কারণ এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ এবং এটি সালাফে ছালেহীনের আমল নয়।[৫২]

কবরের নিকট কুরআন তেলাওয়াতের ব্যাপারে ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, আমি কাউকে এরূপ আমল করতে দেখেনি। এখান থেকে বুঝা যায় যে, ছাহাবী ও তাবেঈগণের কেউ এরূপ আমল করেননি। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) কবরের নিকট কুরআন তেলাওয়াতকে বিদ'আত বলতেন।[৫৩]

---

৪৪. *ইরওয়া ৩/১৫০-১৫১; যঈফাহ হা/৬৮৪৩-এর আলোচনা দ্রঃ।*
৪৫. *মু'জামুল কাবীর হা/৪৯১; আবুবকর আল-খাল্লাল, আল-আমরু বিল মা'রূফ, হা/২৪৫; তারীখু দিমাশক ৫০/২৯, ৫৮৪৮৭; বাদরুল মুনীর ৫/৩৩৭; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৪২৪৩।*
৪৬. *মীযানুল ই'তিদাল ৪/৩০৫, রাবী নং ৩৭৯২, ৪৯৩০; আলবানী, আহকামুল জানায়েয ১/১৯২।*
৪৭. *আবুবকর আল-খাল্লাল, আল-আমরু বিল মা'রূফ, হা/২৪৬; আল-ক্বিরাআত ইনদাল কুবূর হা/৩; তারীখু বাগদাদ ৪/১৪৫।*
৪৮. *আবুদাঊদ, আল-মাসায়েল ১/১৫৮।*
৪৯. *মীযানুল ই'তিদাল ৪/৩০৫, রাবী নং ৩৭৯২, ৪৯৩০।*
৫০. *আলবানী, আহকামুল জানায়েয ১/১৯২।*
৫১. *আহকামুল জানায়েয ১/১১, মাসআলা নং ১৫।*
৫২. *আল-ফাওয়াকেহুদ দাওয়ানী ১/২৮৪; শারহু মুখতাছারু খালীল ২/১৩৭।*
৫৩. *ইবনু তায়মিয়াহ, ইক্বতিযাউছ ছিরাতিল মুস্তাক্বীম ১৯/০৫।*

ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, মৃত্যুর পর লাশের নিকট কুরআন তেলাওয়াত করা বিদ'আত।[৫৪] তিনি আরো বলেন, কেবল 'ইবাদতে মালী'র মাধ্যমে মৃতরা উপকৃত হ'তে পারে। তাছাড়া নফল ছালাত আদায় করে বা ছিয়াম পালন করে বা কুরআন তেলাওয়াত করে বা হজ্জ করে তার ছওয়াব মৃতদের জন্য পাঠানো সালাফে ছালেহীনের নীতি নয়। আমাদের সালাফদের নীতি হ'তে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত হবে না।[৫৫] সালাফদের নীতি হ'ল তারা তাদের মৃত আত্মীয়দের জন্য দান-ছাদাক্বা করতেন এবং দো'আ করতেন।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, 'মৃত ব্যক্তির নামে কবরের পার্শ্বে অথবা অন্য কোন স্থানে কুরআন পাঠ করা বিদ'আত'।[৫৬]

মৃত ব্যক্তির জন্য জীবিতদের করণীয় :

মুমূর্ষু ব্যক্তি মারা গেলে তার চোখ দু'টো খোলা থাকলে তা বন্ধ করে দিতে হবে। তার জেন্য দো'আ করতে হবে। কারণ তখন তার জন্য যে দো'আ করা হয় তাতে ফেরেশতাগণ আমীন বলেন। রাসূল (ছাঃ) আবু সালামার জন্য দো'আ করে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ! আপনি তাকে মাফ করুন। হেদায়াতপ্রাপ্তদের মধ্যে তাকে উচ্চ মর্যাদা দিন, তার উত্তরসুরীদের জন্য আপনি তার প্রতিনিধি হৌন। আপনি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা করুন। হে বিশ্ব চরাচরের প্রতিপালক! আপনি তার জন্য তার কবরকে প্রশস্ত করুন এবং সেখানে তার জন্য আলোর ব্যবস্থা করুন'।[৫৭] এরপর গোসল করাবে, কাফন পরাবে এবং ঋণ থাকলে নিকটাত্মীয়রা পরিশোধ করবে। তবে যে কেউ তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করতে পারে। অতঃপর জানাযার ছালাত আদায় করে দাফন কার্য সম্পন্ন করবে। এরপর মাইয়েতের জন্য হাত না তুলেই প্রত্যেকে দো'আ করবে। এ সময় 'আল্লাহুম্মাগফিরলাহু ওয়া ছাব্বিতহু' বলতে পারে।[৫৮] এছাড়া আল্লাহুম্মাগফিরলাহু ওয়ারহামহু.. মর্মে বর্ণিত দো'আটিও পড়তে পারে।[৫৯] তার জন্য তিনদিন শোক পালন করা যাবে। তবে স্ত্রী স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। তবে তার জন্য বিলাপ ও মাতম করা যাবে না।[৬০]

তাদের জন্য দান-ছাদাক্বা করা যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার তিনটি আমল ব্যতীত সবগুলি আমল বন্ধ হয়ে যায় (১) ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ (২) এমন জ্ঞান, যার দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয় (৩) নেক সন্তান, যে পিতার জন্য দো'আ করে'।[৬১] আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মৃত্যুর পরও মুমিন ব্যক্তির যেসব সৎকর্ম ও অবদান তার আমলনামায় যোগ হ'তে থাকবে, সেগুলি হ'ল- (১) ইলম : যা সে শিক্ষা করেছে এবং মানুষের মাঝে প্রচার-প্রসার ও বিস্তার করে গেছে (২) নেক সন্তান : যাকে সে দুনিয়ার রেখে গেছে (৩) কুরআন : যা মীরাছ রূপে সে রেখে গেছে (৪) মসজিদ : যা সে নির্মাণ করে গেছে (৫) মুসাফির খানা : যা সে পথিক-মুসাফিরদের জন্য তৈরী করে গেছে (৬) খাল, কুয়া, পুকুর প্রভৃতি : যা সে খনন করে গেছে (৭) দান : যা সে সুস্থ ও জীবিত অবস্থায় তার মাল হ'তে করে গেছে (এগুলোর ছওয়াব) মৃত্যুর পরও তার নিকট পৌঁছতে থাকবে'।[৬২] তিনি আরো বলেন, মৃত্যুর পর ক্বিয়ামত পর্যন্ত বান্দার সাতটি আমল প্রবহমাণ থাকে। (১) দ্বীনী ইলম শিক্ষাদান (২) নদী-নালা প্রবাহিত করণ (৩) কূপ খনন (৪) খেজুর বৃক্ষ রোপণ (৫) মসজিদ নির্মাণ (৬) কুরআন বিতরণ (৭) এমন সন্তান রেখে যাওয়া, যে পিতার মৃত্যুর পর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে'।[৬৩]

উপসংহার :

কুরআন তেলাওয়াত নেকীর কাজ। প্রত্যেকের উচিৎ জেনে বুঝে কুরআন তেলাওয়াত করা। তবে এ কুরআনের বিধান জীবিত ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, মৃত ব্যক্তির জন্য নয়। তবে কেউ যদি জীবিত থাকাবস্থায় কুরআন নিজে শিখে ও অপরকে শেখায় সেটিই তার আমলনামায় যোগ হ'তে থাকবে। বিশেষতঃ মুমূর্ষু ব্যক্তির পাশে সূরা ইয়াসীন পাঠের বিধান ইসলামে নেই। তবে জীবিত মুসলমান কুরআনের যেকোন সূরা পঠন এবং শ্রবণ করতে পারে। এতে নেকী পাওয়া যাবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির পাশে বা কবরের পাশে কুরআন তেলাওয়াত সম্পূর্ণ বিদ'আত। আল্লাহ আমাদের সকলকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

৫৪. *আল-ইখতিয়ারাত ১/৪৪৭, ৯১।*

৫৫. *মাজমূ' ফাতাওয়া ২৪/৩২৩, মৃত ব্যক্তির অছিয়ত ও নযর পূরণ করার ব্যাপারে হাদীছ পাওয়া যায়। এমনিভাবে দো'আ ও ছাদাক্বা জায়েয হবার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। কিন্তু ছালাত ও ছিয়াম যদি তা অছিয়ত বা নযর না হ'য়ে থাকে তাহ'লে মৃতের পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে, এর কোন দলীল পাওয়া যায় না। আব্দুল্লাহ বিন ওমর বলেন, 'কেউ কারু পক্ষ থেকে ছালাত ও ছিয়াম আদায় করতে পারে না'। (মুওয়াত্ত্বা পৃঃ ৯৪; নাসাঈ, আলবানী, মিশকাত 'ক্বাযা ছওম' অনুচ্ছেদ, হা/২০৩০, ফাৎহুল বারী ১১/১১৫ পৃঃ)। অবশ্য মানতের ছিয়াম থাকলে সে কথা আলাদা।*

৫৬. *যাদুল মা'আদ ১/৫৮৩ পৃঃ।*

৫৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৯ 'জানাযা' অধ্যায়, ৩ অনুচ্ছেদ।*

৫৮. *আবুদাঊদ হা/৩২২১।*

৫৯. *মুসলিম হা/৩৩৬।*

৬০. *আলবানী, আহকামুল জানায়েয ১/১২-২০।*

৬১. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩ 'ইল্ম' অধ্যায়।*

৬২. *ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৯৯ পৃঃ, সনদ হাসান।*

৬৩. *মুসনাদে বাযযার হা/৭২৮৯, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৯১৫।*

Contents

পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বরূপ এবং এর সাথে ইসলামী অর্থনীতির তুলনামূলক আলোচনা

*কামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী**

উপক্রমণিকা :

সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ অর্থনৈতিক অভিশাপ। সমাজতন্ত্র স্বাধীন মানুষকে পরাধীন, যান্ত্রিক ও ইতর বস্তুতে পরিণত করে। পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী অর্থনীতি মানুষকে বল্গাহীন স্বাধীন, নিপীড়ক, স্বার্থপর ও স্বেচ্ছাচারী করে তুলে। আর ইসলামী অর্থনীতি এই দুই মেরুর অর্থ ব্যবস্থার মাঝে সমন্বয় সাধন করে সমৃদ্ধশালী, সার্বজনীন কল্যাণকামী সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা পালন করে। মোটকথা মানব রচিত কোন তন্ত্র-মন্ত্র বা অর্থব্যবস্থা সার্বজনীন হ'তে পারে না। অর্থনৈতিক সফলতা ও মুক্তি একমাত্র আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত সত্যের উৎস কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী অর্থনীতির মাঝেই নিহিত আছে।

সমাজতন্ত্র ইতিমধ্যে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। যেমনি তার আকস্মিক আবির্ভাব, তেমনি আকস্মিক তার তিরোভাব। যেসব দেশ এখনও সমাজতন্ত্রের দাবীদার তারা বহুবার পরিবর্তন, সংযোজন, সংকোচন ও সংশোধনের মাধ্যমে প্রকারান্তরে পুঁজিবাদের নামাবলী গায়ে জড়িয়ে দিয়েছে। আর পুঁজিবাদের ইতিহাস তো শোষণ-নিপীড়ন, বঞ্চনা, অন্যায় যুদ্ধ ও সংঘাতের রক্তস্নাত ইতিহাস। পুঁজিবাদের দর্শন চরম ভোগবাদী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দর্শন। পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থনীতির দর্শন হ'ল জনহিতকর, সুষম ও সর্বযুগোপযোগী দর্শন। যা আবহমানকাল থেকে মানব কল্যাণে অবদান রেখে আসছে। আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লিখিত ত্রিবিধ অর্থনৈতিক দর্শন, কার্যক্রম, কল্যাণ-অকল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

পুঁজিবাদের পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ :

পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রথম ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তিগত মালিকানার সীমাহীন অধিকার। এতে কেবল নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি স্বীয় মালিকানায় রাখারই সুযোগ নয়, তাতে সকল প্রকার উৎপাদন-উপায় এবং যন্ত্রপাতি ইচ্ছামত ব্যবহার ও প্রয়োগেরও পূর্ণ সুযোগ লাভ করা যায়। ব্যক্তি নিজ ইচ্ছামত অবলম্বিত যে কোন পন্থা ও উপায়ে অর্থোপার্জন করতে পারে এবং যে কোন পথে তা ব্যয় এবং ব্যবহারও করতে পারে; যেখানে ইচ্ছা সেখানে কারখানা স্থাপন করতে পারে এবং যতদূর ইচ্ছা মুনাফাও লুটতে পারে। শ্রমিক নিয়োগের যেমন সুযোগ রয়েছে, তাদেরকে শোষণ করে একচ্ছত্রভাবে মুনাফা লুণ্ঠনের পথেও সেখানে কোন বাধা ও প্রতিবন্ধকতা নেই। ব্যক্তি বা গোটা সমাজ মিলিত হয়েও কাউকে কোন প্রকার কাজ হ'তে বিরত রাখতে পারে না- সে অধিকার কারো নেই।[১]

এই ধরনের অর্থ ব্যবস্থা একদিকে সূদখোর, মহাজন, শোষক, কারখানা মালিক ও যালেম জমিদার-জায়গীরদারের সৃষ্টি করে। অপরদিকে মজুর-কৃষকদের এক সর্বহারা বুভূক্ষুদের দল তৈরী করে। এইরূপ অর্থ ব্যবস্থা যে সমাজে কার্যকরী হবে, সেখানে স্বভাবতই সহানুভূতি, সহৃদয়তা, মায়া-মমতা, পারস্পরিক সাহায্য প্রভৃতি মানবীয় ভাবধারা এক বিন্দুও পাওয়া যাবে না। প্রত্যেক ব্যক্তিই আত্মনির্ভর হয়ে জীবন যাপনে বাধ্য হবে, কেউ কারো বন্ধু বা সাহায্যকারী হবে না। অভাবগ্রস্ত ও বুভূক্ষুদের জীবন সংকীর্ণতর হয়ে যাবে। ফলে সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিই জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অন্যান্যদের মুকাবিলায় চরম স্বার্থপর ও প্রতিহিংসামূলক ভূমিকা অবলম্বন করতে বাধ্য হবে।[২]

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই ভয়ানক চিত্র সর্বপ্রথম বৃটেনে আত্মপ্রকাশ করে। এরপর তা ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে 'মূলনীতি' হিসাবে ছড়িয়ে পড়ে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জনসাধারণের কল্যাণ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্নই ছিল না। এজন্য মিল-কারখানায় যেসব পণ্য উৎপাদিত হ'ত সেগুলো ন্যূনতম মজুরিতে সর্বাধিক উৎপাদন এবং ব্যক্তিস্বার্থের নীতিতে উৎপাদন করা হ'ত। ফলে উৎপাদিত পণ্য দ্বারা গুদামগুলো ভরে গেল। অপরদিকে রফতানীর পথ সীমিত হওয়ায় এসব পণ্য গুদামে নষ্ট হ'তে লাগল। কিন্তু পণ্যের এরূপ প্রাচুর্য হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিক ও গরীবরা এসব দ্বারা কোন প্রকার উপকৃত হ'ল না। পণ্য উৎপাদনের প্রাথমিক যুগে যেমন তারা নিজেদের প্রয়োজনে এসব পণ্য কিনতে পারত না, তেমনি প্রাচুর্যের সময়েও তারা এসব কেনার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত রইল।

সুতরাং পুঁজিবাদী ব্যবস্থারূপে এই ভূতের লোভাতুর দৃষ্টি অন্যান্য রাষ্ট্রের উপরও পড়া আরম্ভ হয়। সেসব দেশকে পরাধীনতার শৃংখলাবদ্ধ করার জন্য সে 'আরো চাই' 'আরো চাই' ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে চলে। নিজ দেশের স্বাধীন ব্যবসায়ীদের দাসে পরিণত করার পর 'ভূমির ক্ষুধা' (সাম্রাজ্যবাদী লোভ) নিবারণের জন্য সে দুর্বল দেশ ও জাতিগুলোর সার্বভৌমত্ব হরণ করা শুরু করে। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে ইউরোপীয়দের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পালা আরম্ভ হয়। অবশেষে ভারতের মত বিরাট দেশও তাদের উপনিবেশে পরিণত হয়। অল্পদিনের মধ্যে সারা পৃথিবী বৃটিশ ও অন্যান্য পুঁজিবাদী শক্তির বাণিজ্যিক বাজারে রূপান্তরিত হয়।[৩]

শিল্প বিপ্লবের ফলে উপনিবেশবাদ আরও জেঁকে বসে। বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের আবিষ্কার ও শিল্প উৎপাদনের ক্রমবিকাশমান কলাকৌশলকে বেনিয়ারা নিজেদের স্বার্থে ব্যাপক ও নির্দয়ভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে। এরই ফসল শিল্প বিপ্লব। একই সাথে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হ'ল 'খাও, দাও আর ফূর্তি কর' এই ভোগবাদী দর্শন দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে যান্ত্রিক ও ইতর বস্তুবাদ হয়ে পড়লো সমাজ দর্শনের ভিত। ভোগবাদী জীবন ও বস্তুবাদের সমন্বয়ের আগুনে ঘি ঢালার

* *প্রধান মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদরাসা, জামালপুর।*

১. মাওলানা আব্দুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ষষ্ঠ প্রকাশ ১৪১৭ হিঃ/১৯৯৭ ইং), পৃঃ ২৭-২৮।

২. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৭ম সংস্করণ, ১৪১৮ হি/১৯৯৭ইং), পৃঃ ৬।

৩. মাওলানা হিফজুর রহমান, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় প্রকাশ, ১৪১৮ হিঃ/১৯৯৮ইং), পৃঃ ৩৩৪-৩৩৫।

Contents

কাজটি সম্পন্ন করল অবাধ ও নিরংকুশ ব্যক্তি মালিকানা এবং ধর্মনিরপেক্ষ ধ্যান-ধারণা। প্রথম দিকে চার্চের পুরোহিতরা কিছুটা বাধার সৃষ্টি করতে চাইলেও তাদের সে চেষ্টা রাজন্যবর্গ ও বুর্জোয়া শ্রেণীর চাপে স্রোতের মুখে খড়কুটোর মতো ভেসে যায়। এরই সাথে পরবর্তীকালে যুক্ত হ'ল মানবতার অস্তিত্ববিনাশী ও বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর অফুরন্ত নে'মত ভোগের চরম বাধাসৃষ্টিকারী সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ। পুঁজিবাদ এভাবেই তার শক্তিমত্তা ও দাপট বৃদ্ধি করে চলল। বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ দিয়ে তার শুরু। ক্রমে শিল্প পুঁজি, বিনিয়োগ পুঁজি ইত্যাদি পর্যায় পেরিয়ে সে পৌঁছেছে বহুজাতিক পুঁজির বিশাল বাজারে। এ বাজার তারই রচিত, বিশ্বকে শোষণের জন্যে তারই উদ্ভাবিত কৌশল। এর অপ্রতিহত গতি ও সাফল্যকে ধরে রাখতে পুঁজিবাদের উদ্ভাবিত সর্বশেষ কৌশল হ'ল বিশ্বায়ন (Globalization) ও উদারীকরণ (Liberalization)।[৪]

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য :

পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল- ১. জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গী ২. ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রদর্শন ৩. অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতা ৪. উন্মুক্ত ও অবাধ অর্থনীতি ৫. ব্যক্তির নিরংকুশ মালিকানা ৬. লাগামহীন চিন্তার স্বাধীনতা ৭. গণতন্ত্রের নামে বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন ৮. পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদী।[৫]

পুঁজিবাদের ত্রুটি :

পুঁজিবাদ যেহেতু মানব রচিত মতবাদ সেহেতু এর ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকবে এটাই স্বাভাবিক। নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে পুঁজিবাদের ত্রুটিগুলো তুলে ধরা হ'ল।-

১. অপচয়মূলক প্রতিযোগিতা ২. অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও বেকারত্ব ৩. সম্পদের ত্রুটিপূর্ণ বণ্টন। ৪. একচেটিয়া ব্যবসায়ীর উদ্ভব ও তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা সংহতকরণ। ৫. বাণিজ্য চক্রের পর্যায়ক্রমিক উপস্থিতি এবং ৬. চরম নৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের ক্রম বিস্তৃতি।

পুঁজিবাদের বর্তমান চিত্র :

১. একক পরাশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ ২. চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য বিরাজমান (ধনী-দরিদ্রের জীবন যাপনের ব্যয়সূচক বিগত দুই দশকে ১০:১ হ'তে ৭০:১ এ উন্নীত) ৩. বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের ছলে বিশ্বকে শোষণের কৌশল গ্রহণ ৪. যুগপৎ চরম দারিদ্র্য ও ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন যাপন নিত্যকার দৃশ্য ৫. গণতন্ত্রের ধোঁকা দিয়ে মুষ্টিমেয় বিত্তশালী লোকের শাসন প্রতিষ্ঠা ৬. স্যাটেলাইট ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রবাহ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে পুঁজিবাদী জীবনাদর্শের স্লোপয়জনিং ৭. এনজিও কালচার পত্তনের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে শোষণের বিস্তৃতি ৮. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মোড়ল এবং ৯. ইসলামের মুকাবিলায় সমাজতন্ত্রের সাথে অভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ।[৬]

সমাজতন্ত্রের পরিচয়, স্বরূপ, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ :

পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যে অর্থব্যবস্থা মানব সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছে, তা কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্র। পুঁজিবাদী সমাজের মযলূম শোষিত মানুষকে বুঝ দেওয়া হয়েছে যে, ব্যক্তিগত মালিকানাই সকল প্রকার বিপর্যয়ের মূল কারণ। এর উচ্ছেদেই সকল অশান্তি ও শোষণ-নির্যাতনের চির অবসান ঘটবে। এজন্য কমিউনিজমের অর্থনীতিতে প্রথম পদক্ষেপেই ব্যক্তিগত মালিকানা অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে এবং অর্থ উৎপাদনের সমস্ত উপায়-উপাদান ও যন্ত্রপাতি (Means and Instruments of production) জাতীয় মালিকানা বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ফলে কমিউনিস্ট সমাজে জাতীয় অর্থোৎপাদনের উপায়-উপাদানের উপর রাষ্ট্র পরিচালক মুষ্টিমেয় শাসক গোষ্ঠীর নিরংকুশ কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছে। তারা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিশেষ প্লান-প্রোগ্রাম ও পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল উপায়-উপাদান ব্যবহার করে থাকে। তাদের নির্ধারিত নীতি অবনত মস্তকে মেনে নিতে একান্তভাবে বাধ্য হয় সে সমাজের কোটি কোটি মানুষ।[৭]

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষণ-নির্যাতন শেষ পর্যন্ত শ্রমিক ও গরীব শ্রেণীকেও অধিকার-সচেতন করে তোলে। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে অধিকার আদায়ের জন্য তারা সংগ্রাম শুরু করে। বিভিন্ন স্থানে সংগঠন গড়ে তোলে। এমনকি তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ তাদের প্রতি সমর্থন জানানো শুরু করে। বিংশ শতাব্দীতে সোভিয়েত রাশিয়ার মত বিরাট দেশে মেহনতী মানুষের বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়। এরপর কার্লমার্কসের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ অনুযায়ী আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও কায়েম করা হয়।[৮]

জার্মান ইহুদী কার্লমার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ভাগ্যের অন্বেষণে ঘুরতে ঘুরতে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম হয়ে একসময়ে পৌঁছে যান পুঁজিবাদের তৎকালীন সবচেয়ে বড় ধ্বজাধারী দেশ ইংল্যান্ডে। সেদেশে তখন রবার্ট ওয়েন, থমাস হজকিন্স, সিডনী ওয়েব, চার্লস ফুরিয়ার, সেন্ট সাইমন, লুই ব্লা, জেরেমি বেন্থামের মতো ফেবিয়ান সোস্যালিস্ট, হবসন ও বার্ট্রান্ড রাসেলের মতো গিল্ড সোসালিস্ট ও পিগুর মতো গণদ্রব্য সরবরাহ করার প্রবক্তাদের আলোচনা ও লেখালেখির ফলে বিদগ্ধ মহলে সমাজতন্ত্র নিয়ে বেশ উত্তেজনা ছিল। এই পটভূমিতেই কার্লমার্কস দেখলেন শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট শ্রমিকদের বেদনাবিধুর বিপর্যস্ত মানবেতর জীবন যাপন। আর এরই সমাধানের জন্যে তিনি গ্রহণ করলেন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ তত্ত্ব, ডাক দিলেন শ্রেণী সংগ্রামের। তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ Das Kapital (১৮৬৭) এই সময়েই রচিত। তাঁর Theory of Surplus Value এই পটভূমিতেই উদ্ভাবিত। তাঁর প্রস্তাবিত শ্রেণী সগ্রামের পথ ধরে পরবর্তীকালে রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টির মাধ্যমে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সময়ে শ্রেণীশত্রু উৎখাত ও নির্মূলের

৪. শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ (রাজশাহী : দি রাজশাহী স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফাউণ্ডেশন, ৪র্থ সংস্করণ ২০০৫), পৃঃ ২৯১।
৫. ঐ, পৃঃ ২৯৪।
৬. ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত, প্রবন্ধ, পৃঃ ৩১৭ ও ৩১৯।
৭. ইসলামের অর্থনীতি, পৃঃ ৩০-৩১।
৮. ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, পৃঃ ৩৩৮-৩৩৯ ।

Contents

নামে কত লক্ষ বনি আদম যে বন্দুকের নলের শিকার হয়েছিল, কত লক্ষ লোক ভিটেমাটি হ'তে উৎখাত হয়ে সুদূর সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হয়েছিল তার হদিস মিলবে না কোন দিনই। সমাজতন্ত্র যখন একটা সংগঠিত শক্তির রূপ নেওয়া শুরু করে তখন তার কার্যাবলীর মধ্যে প্রধান হয়ে দাঁড়ায় ব্যক্তি মালিকানা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার উচ্ছেদ, সর্বহারার একনায়কত্বের (Dictatorship of the Proletariat) নামে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, জনগণের মালিকানার নামে উৎপাদনের উপায়-উপকরণে রাষ্ট্রীয় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার এবং ধর্মের আমূল উচ্ছেদ।

রাশিয়ার প্ররোচনায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালানো হয়েছিল পূর্ব ইউরোপীয় দেশ পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া ও যুগোস্লাভিয়ায়। এজন্যে অনেক ক্ষেত্রে রাশিয়া সরাসরি সামরিক মদদ যুগিয়েছে, ট্যাংকের বহর পাঠিয়েছে। একই চেষ্টা চলল কিউবায়, আফ্রিকার কঙ্গো, এ্যাঙ্গোলা, নামিবিয়া ও ইথিওপিয়ায়। এ ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল চীনেও। কিন্তু তাত্ত্বিক নীতি ও আদর্শ পরিবর্তিত হ'তে শুরু করল বাস্তবের কঠিন পরিস্থিতি মুকাবিলা করতে গিয়ে। শতাব্দী প্রাচীন কম্যুনিস্ট মেনিফেস্টো (১৮৪৮) ততদিনে লক্ষ লক্ষ লোককে কবরে পাঠিয়ে দিয়েছে। আরও লক্ষ লক্ষ বনি আদমকে ভিটেমাটি ছাড়া করেছে। কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প বা বাধ্যতামূলক শ্রমশিবিরে যে কত লোক লাপাত্তা হয়েছে তার কোন লেখাজোখা নেই। যাহোক বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে চলার বাসনায় সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী দেশগুলো তাদের পূর্বঘোষিত আদর্শের পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে পুঁজিবাদের সাথে অপোষরফার নীতি গ্রহণ করে। এ উদ্যোগে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যুগোশ্লাভিয়া। পরবর্তীকালে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর সোস্যালিস্ট বা কম্যুনিস্ট পার্টি কর্তৃক গৃহীত সোস্যালিজম বা কম্যুনিজমের নতুন ব্যাখ্যা তাই বহু ক্ষেত্রেই ছিল মার্কসবাদের সাথে দারুণ অসংগতিপূর্ণ।

চীনও এর ব্যতিক্রম নয়। কমরেড মাওসেতুং লং মার্চের মাধ্যমে চীনে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার ডাক দেন। রেড গার্ড আন্দোলনের নামে শুদ্ধি অভিযান চালিয়ে বিরোধী মনোভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবীদের মেথরের স্তরে নামিয়ে আনেন। মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের হত্যা ও পাইকারী হারে বন্দী করেন। উইঘুরদের (চীনে মুসলমানদের উইঘুর ও হুই বলা হয়) নাম-নিশানা মুছে ফেলার সর্বাত্মক উদ্যোগ নেওয়া হয়। সমাজতন্ত্রের ইতিহাস সীমাহীন রক্তপাত, ধ্বংসযজ্ঞ, নির্যাতন, প্রতারণা ও ছলনার ইতিহাস। চীন তার ব্যতিক্রম হবে কি?[৯]

সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যাবলী :

১. দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ২. ধর্মের উৎখাত ৩. ব্যক্তি স্বাধীনতার উচ্ছেদ ৪. নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি ৫. রাষ্ট্রীয় নিরংকুশ মালিকানা ৬. চিন্তার পরাধীনতা ৭. সর্বহারার নামে একদলীয় শাসন ৮. তাত্ত্বিকভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হ'লেও বাস্তবে সাম্রাজ্যবাদী।[১০]

সমাজতন্ত্রের ত্রুটি সমূহ :

১. সম্পদের ভুল মালিকানা ও অসম বণ্টন ২. প্রকৃত চাহিদা নির্ধারণ ও সঠিক মূল্য নিরূপণে ব্যর্থ ৩. ব্যক্তিস্বার্থ পূরণের সুযোগ না থাকায় প্রেষণা অকার্যকর ৪. ভোক্তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হরণ ৫. কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যর্থ এবং ৬. নৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে ব্যর্থ।[১১]

সমাজতন্ত্রের বর্তমান অবস্থান :

১. সমাজতন্ত্রের বর্তমান গতি ক্রমাগত সংশোধনবাদের দিকে।
২. পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলো ক্রমাগত গ্রহণ (সূদ, ব্যক্তি মালিকানা, বাজার ব্যবস্থা, মুনাফা ইত্যাদি)।
৩. শিল্প উৎপাদনে পুঁজিবাদী বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল গ্রহণ।
৪. পার্টি এলিট ও জনসাধারণের মধ্যে শোষণমূলক সম্পর্ক।
৫. পীড়নমূলক, ধোঁকাপূর্ণ, গোজামিলের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পর্যবসিত।
৬. রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি।
৭. অর্থনৈতিক ও সামাজিক শ্রেণীবৈষম্য বিলুপ্ত করতে ব্যর্থ।
৮. পুঁজিবাদের সাথে সহঅবস্থানের নীতি গ্রহণ।
৯. ইসলামের মুকাবিলায় পুঁজিবাদের সাথে অভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ।[১২]

ইসলামী অর্থনীতির পরিচয় :

আল্লাহ্র বিশ্ব-প্রতিপালন নীতির অনুসরণে সৃষ্টির লালন-পালনের জন্য সমুদয় জাগতিক সম্পদের সামগ্রিক এবং কল্যাণধর্মী ব্যবস্থাপনাই ইসলামী অর্থনীতি। সৃষ্টজীবের কল্যাণের জন্য সম্পদের সর্বাধিক উৎপাদন, সুষ্ঠু বণ্টন, ন্যায়সংগত ভোগ বিশ্লেষণই হ'ল ইসলামী অর্থনীতি।[১৩]

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. এস.এম. হাসানুজ্জামান বলেন, Islamic Economics is the knowledge and application of injunctions and rules of the *Shariah* that prevent injustice in the acquisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human beings and enable them to perform their obligations to Allah and the society.

অর্থাৎ ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে শরী'আতের বিধি-নির্দেশ সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও তার প্রয়োগ যা বস্তুগত সম্পদ আহরণ ও বিতরণের ক্ষেত্রে অবিচার প্রতিরোধে সমর্থ যেন এর ফলে

৯. ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ, পৃঃ ২৯১-২৯৩।
১০. ঐ, পৃঃ ২৯৪।
১১. ঐ, পৃঃ ৩১৯।
১২. ঐ, পৃঃ ৩১৮।
১৩. ড. মুহাম্মাদ জামাল উদ্দিন, ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকিং : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (প্রবন্ধ) ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর একুশ বছর পূর্তি সংখ্যা, পৃঃ ১৫৯।

মানবমণ্ডলীর সন্তুষ্টি বিধান করা যায়। ফলে আল্লাহ ও সমাজের প্রতি তারা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্ষম হবে।[১৪]

ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য :

ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিম্নরূপ-

(১) অর্থনীতিতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা : ইসলামী অর্থনীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে 'আদল ও ইহসান' ক্বায়েম করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَـــاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং অশ্লীলতা, অন্যায় কাজ ও অবাধ্যতা হ'তে নিষেধ করেন' *(নাহল ১৬/৯০)*।

(২) অর্থনীতিতে সুনীতি প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি উৎখাত করা : এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা যে সাধারণ নীতি, তা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, الَّذِيْنَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوْا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْرِ 'তারা এমন লোক, আমরা যদি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করি, তাহ'লে তারা ছালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে। আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন' *(হজ্জ ২২/৪১)*।

(৩) নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা : ইসলামী অর্থনীতিতে নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয়েছে। মানুষ তার সম্পদের একচেটিয়া মালিক নয়। বরং সম্পদশালীদের সম্পদে দুঃস্থ-গরীব, নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের হক রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ 'তাদের সম্পদে সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে' *(যারিয়াত ৫১/১৯)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَنُرِيْدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ- 'আর আমরা ইচ্ছা করলাম তাদের প্রতি অনুগ্রহ করব যাদেরকে দেশে দুর্বল করা হয়েছে। তাদেরকে নেতা বানানো ও তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী বানানো' *(ক্বাছাছ ২৮/৫)*।

(৪) কল্যাণকর দ্রব্যের উৎপাদনে উৎসাহিতকরণ ও অকল্যাণকর দ্রব্যের উৎপাদন নিষিদ্ধ করণ : ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের স্বার্থে স্বাস্থ্যসম্মত দ্রব্যের পর্যাপ্ত উৎপাদন নিশ্চিত করা ও সব অকল্যাণকর, অস্বাস্থ্যকর দ্রব্যের উৎপাদন, আমদানী-রফতানী ও ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ- 'নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, বেদী ও শুভাশুভ নির্ণয়ের তীর সমূহ নাপাক ও শয়তানী কাজ। অতএব তোমরা এসব থেকে বিরত থাকো যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও' *(মায়েদাহ ৫/৯০-৯১)*।

আল্লাহ তা'আলা আরোও বলেন, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِه وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ 'তোমাদের উপর হারাম করা হ'ল মৃত, রক্ত, শূকরের গোশত, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গীত পশু, শ্বাসরোধে হত্যা করা পশু, প্রহারে মৃত পশু, পতনে মৃত পশু, শিংয়ের আঘাতে মৃত পশু, হিংস্র জন্তুতে খাওয়া পশু, তবে যা তোমরা যবেহ দ্বারা হালাল করেছ, তা ব্যতীত এবং যে পশু পূজার বেদীতে বলি দেওয়া হয়েছে। আর জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। কেননা এসবই পাপের কাজ' *(মায়েদাহ ৫/৩)*।

উল্লিখিত খাদ্যগুলো অকল্যাণকর তথা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিধায় এগুলোকে হারাম তথা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ 'হারাম খাদ্যে গঠিত শরীর জান্নাতে যাবে না'।[১৫]

সম্পদের সুষম বণ্টন :

ইসলাম সম্পদের সুষম বণ্টনের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ 'ধনৈশ্বর্য যেন কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়' *(হাশর ৫৯/৭)*। এ আয়াতের আলোকে ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য হচ্ছে আইন ও পলিসির মাধ্যমে সম্পদের বিস্তার ও সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ করে তাদের গরীবদের মধ্যে বণ্টন করা হবে'।[১৬]

সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার :

ইসলাম জনকল্যাণের জন্য সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার চায়। এজন্যই ইসলাম পতিত জমি ফেলে রাখা সমর্থন করেনি। মালিকানাবিহীন জমিতে যিনি ফসল উৎপন্ন করবেন, তিনিই তা ভোগ করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন জমি চাষাবাদ করেছে, যা কারো মালিকানা নয়, সে-ই উহার হকদার'। উরওয়া ইবনে যুবায়র তাবেঈ বলেন, ওমর (রাঃ)ও তাঁর খেলাফত কালে এই হুকুম দিয়েছিলেন'।[১৭] একই নীতি

---

১৪. ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ, পৃঃ ৮।

১৫. মিশকাত হা/২৭৮৭।

১৬. বুখারী, মুসলিম, আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, ছহীহ ইবনে খুযাইমা, মিশকাত হা/১৭৭২ 'যাকাত' অধ্যায়।

১৭. বুখারী, মিশকাত হা/২৯৯১ 'অনাবাদী ভূমি আবাদ করা, সেচের পালা ও সরকারী ভূমি দান করা' অধ্যায়।

অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে গণ্য করতে হবে।

এছাড়া সূদ-ঘুষ, শোষণ-যুলুম, মজুদদারী ইত্যাদি রহিতকরণ; যাকাত-ওশর, জিজিয়া, কর্যে হাসানাহ ইত্যাদি ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং সর্বোপরি সকল প্রকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইসলামী শরী‘আতের পূর্ণ বাস্তবায়নই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। এসব মূলনীতি কার্যকরী করা ইসলামী সরকারের কর্তব্য। এসবের কার্যকরী করার ওপরই মুসলিম বিশ্বের প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণ নির্ভরশীল।

সূদ-ঘুষ, ধোঁকামুক্ত অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা :

সূদ পুঁজিবাদের জীয়নকাঠি। এটা সমাজ শোষণের অন্যতম হাতিয়ার এবং মানব সভ্যতার সবচেয়ে নিষ্ঠুর শত্রু। সূদী কারবারের ফলে সমাজের বিত্তশালীরা অসহায়, নিঃস্ব, দরিদ্র, বনু আদমের সম্পদ জোঁকের মত চুষে চুষে খেয়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলে। অন্যদিকে সমাজের হতভাগ্য হতদরিদ্র মানুষগুলো দিন দিন অর্থশূন্য হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরে। তাই ইসলাম এ চির অভিশপ্ত সূদকে চিরতরে নিষিদ্ধ করে ব্যবসা-বাণিজ্য, যাকাত, দান-ছাদাক্বা ও কর্যে হাসানা ভিত্তিক অর্থনীতি প্রবর্তন করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ– ‘হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সূদের পাওনা যা বাকী রয়েছে, তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা সত্যিকারের মুমিন হয়ে থাক। কিন্তু যদি তোমরা তা না কর, তাহ’লে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। আর যদি তোমরা তওবা কর, তাহ’লে তোমরা তোমাদের মূলধনটুকু পাবে। তোমরা অত্যাচার করো না এবং অত্যাচারিত হয়ো না’ *(বাক্বারাহ ২/২৭৮-২৭৯)*। তিনি আরো বলেন, الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ– ‘যারা সূদ ভক্ষণ করে, তারা (ক্বিয়ামতের দিন) দাঁড়াতে পারবে না জিনে ধরা রোগীর ন্যায় ব্যতীত। এর কারণ এই যে, তারা বলে ক্রয়-বিক্রয় তো সূদের মতই। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সূদকে হারাম করেছেন। অতঃপর যার নিকটে তার প্রভুর পক্ষ থেকে উপদেশ এসে গেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তার জন্য পিছনের সব গোনাহ মাফ। তার (তওবা কবুলের) বিষয়টি আল্লাহর উপর ন্যস্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি পুনরায় সূদ খাবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে’ *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الرِّبَا سَبْعُوْنَ جُزْءًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ ‘সূদের ৭০টি গোনাহের স্তর রয়েছে। তার মধ্যে নিম্নতম স্তর হচ্ছে আপন মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া’।[১৮] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেছেন, دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَّثَلَاثِيْنَ زَنْيَةً ‘কোন ব্যক্তি যদি এক দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) সূদ জ্ঞাতসারে গ্রহণ করে, তাতে ছত্রিশবার ব্যভিচারের চেয়েও অনেক বেশী গোনাহ হবে’।[১৯]

ঘুষের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেন, لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ‘তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না’ *(নিসা ৪/২৯)*।

মানুষ মানুষকে ঠকানোর জন্য যেসব পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে থাকে তন্মধ্যে অন্যতম হ’ল প্রতারণা-ধোঁকা। এটি একটি জঘন্য অপরাধ। এর দ্বারা মানব সমাজে সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ধোঁকা দিয়ে অর্থোপার্জন নিষিদ্ধ করেছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ مَا هَذَا. قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ. ثُمَّ قَالَ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا. ‘একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি খাদ্য স্তূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি খাদ্য স্তূপের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে তাঁর আঙ্গুল ভিজা পেলেন। তখন তিনি বললেন, হে খাদ্যের মালিক! ব্যাপার কি? উত্তরে সে (খাদ্যের মালিক) বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! বৃষ্টির পানি লেগে গেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তাহ’লে ভিজা অংশটা শস্যের উপরে রাখলে না কেন? যাতে ক্রেতা তা দেখে ক্রয় করতে পারে। যে প্রতারণা করে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়’।[২০]

ব্যবসা-বাণিজ্য ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তন :

মানব সভ্যতা বিধ্বংসী হাতিয়ার সূদ-ঘুষ, জুয়া, লটারীকে তিরোহিত করে ইসলাম মানব কল্যাণকামী ব্যবসা ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ‘আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল ও সূদকে হারাম করেছেন’ *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَطْيَبُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ ‘নিজ হাতে কাজ করা এবং হালাল পথে ব্যবসা করে যে উপার্জন করা হয় তাই সর্বোত্তম’।[২১]

[ক্রমশঃ]

---

১৮. ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৮২৬, সনদ ছহীহ।
১৯. আহমাদ, মিশকাত হা/২৮২৫, সনদ ছহীহ।
২০. মুসলিম হা/১০২; তিরমিযী হা/১৩১৫; মিশকাত হা/২৮৬০।
২১. তাফসীর কুরতুবী ১৯/৫৬।

Contents

সাংবাদিক নির্মল সেন-কে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত

[নির্মল কুমার সেনগুপ্ত (১৯৩০-২০১৩ খৃ.) বাংলাদেশের রাজনীতি ও সাংবাদিকতা জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। তিনি গোপালগঞ্জ যেলার কোটালীপাড়া উপযেলার দিঘীরপাড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪ বছর বয়স থেকেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৬ সালে পরিবারের সবাই পশ্চিমবঙ্গে চলে গেলেও তিনি এদেশে থেকে যান। জীবনের দীর্ঘ সময় তাঁর কারাগারে কেটেছে। ১৯৬১ সালে দৈনিক ইত্তেফাকে সহকারী সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন। অতঃপর দৈনিক বাংলা সহ বিভিন্ন পত্রিকায় আজীবন সাংবাদিকতা করেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এদেশের সমকালীন সংঘাতপূর্ণ রাজনীতির প্রেক্ষিতে তৎকালীন দৈনিক বাংলায় লেখা 'স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই' নামক একটি উপ-সম্পাদকীয় তাঁকে লেখক হিসেবে প্রভূত খ্যাতি ও পরিচিতি দান করে। 'আমার জীবনে '৭১-এর যুদ্ধ' তাঁর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তাঁর কারাজীবনের (২০০৫-২০০৮) শেষ দিকে দৈনিক ইত্তেফাকে নির্মল সেনের লিখিত কয়েক কিস্তিতে প্রকাশিত 'আমার জীবনে '৭১-এর যুদ্ধ' নামক প্রবন্ধটি পাঠ করার পর তাঁকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে একটি পত্র লেখেন। এর ১৪ দিন পরে তিনি বগুড়া কারাগার হ'তে যামিনে মুক্তি পান। বেরিয়ে আসার পর নানা ব্যস্ততায় চিঠিটি আর তাঁকে পাঠানো হয়নি। ইতিমধ্যে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। চিঠিটির গুরুত্ব বিবেচনা করে আমরা এটি পাঠকবৃন্দের জ্ঞাতার্থে পত্রস্থ করলাম- সম্পাদক]

শ্রদ্ধেয় — *-বগুড়া যেলা কারাগার হ'তে*

বাবু নির্মল সেন, — *১৪.০৮.২০০৮ইং বৃহস্পতিবার*

আমার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেন। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত আপনার লেখা 'আমার জীবনে '৭১-এর যুদ্ধ' প্রায় সবগুলো কিস্তি পড়েছি। দু'একটা বাদ গেলেও যেতে পারে। আজ শেষ কিস্তি পড়ে আপনার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য মনটা উদ্বেলিত হয়ে উঠল।

প্রথমেই বলছি, আপনার বিশাল হৃদয়ের খবর যারা জেনেছিল, তারা আপনাকে ভালবেসেছিল। ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, অঞ্চল সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। আজ জীবনের পড়ন্ত বেলায় আমি (৬১) আপনাকে চিনলাম আপনার লেখার মাধ্যমে। যদিও সাংবাদিক নেতা হিসাবে আপনার পরিচিতি আমাদের কাছে ছিল অনেক পূর্ব থেকেই।

শ্রদ্ধেয় সেন! আপনি আপনার লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য গর্ভধারিণী মায়ের স্নেহ ও ভাইদের আন্তরিক আবেদনকে প্রত্যাখ্যান করে পশ্চিমবঙ্গে না থেকে ফিরে এসেছিলেন স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে নিজ জন্মভূমিতে। আপনি আপনার আদর্শের জন্য পাকিস্তান আমলে জেল খেটেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশে আপনার স্বপ্ন বাস্তবায়নের নিশ্চিত আশা আপনার ছিল। কিন্তু যেসব বাধা আপনি পেয়েছেন ইতিপূর্বে পাকিস্তানী শাসকদের কাছ থেকে, ভিন্ন মাত্রায় প্রায় একই রূপ বাধা পেয়েছেন স্বাধীন বাংলাদেশের শাসকদের কাছ থেকে। কারণ পাকিস্তানী শাসক ও বাংলাদেশী শাসকদের চেহারায় অমিল থাকলেও, মানসিকতায় অমিল ছিল না। শোষক ও যালেমদের চরিত্র দল মত ও স্থান কাল নির্বিশেষে সকল যুগে একই। সে যুগের ফেরাঊন-নমরূদ, আবু জাহলরা যে নষ্ট চরিত্রের অধিকারী ছিল, এ যুগের বুশ-ব্লেয়ার, গান্ধী-সাদ্দামরা একই চরিত্রের অধিকারী। বাংলাদেশে যারা ক্ষমতায় এসেছিল বা যাদেরকে ক্ষমতায় বসানো হয়েছিল, তারা ছিল অত্যাচারী শোষক পুঁজিবাদী বিশ্ব মোড়লদের হাতের পুতুল। আজও তারাই আছে। আপনার কান্না শোনার মত কান তাদের কোথায়? আপনি মযলূমদের হৃদয়ের বেদনা বুঝেছেন ও তাদের বোবা কান্না ভাষায় প্রকাশ করেছেন এবং চেয়েছিলেন তার প্রতিকার। কিন্তু পাননি। নির্বাচনী যুদ্ধে জয়লাভ করে ক্ষমতা দখল করাই কি এর প্রতিকার? ওটা তো শোষকদের পাতানো ফাঁদ। যাতে মানুষ ক্ষমতা পাবার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে এবং জন কল্যাণের সকল সুচিন্তা হারিয়ে যায়। তাছাড়া মযলূমদের অধিকাংশ গোলামী মানসিকতার ধারক। শোষিত ও বঞ্চিত হওয়াটাকেই অনেকে তাদের ভাগ্য ভেবে নিশ্চিন্ত হয়েছে। স্যার স্যার বলতে আর স্যালুট দিতেই ওরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে বা অভ্যস্ত বানানো হয়েছে। কিন্তু একদিক দিয়ে শোষক ও শোষিতদের একটা অদ্ভুত মিল আছে। আর তা হ'ল দু'হাতে দুনিয়া কামানোর মানসিকতা। ভোটার ও ভোটপ্রার্থী দু'জনে এদিক দিয়ে সমান। তাই এই ভোগবাদী মানসিকতার পরিবর্তন ব্যতীত সমাজের আমূল পরিবর্তন কি আদৌ সম্ভব? আপনার ত্যাগী মানসিকতার আমরা প্রশংসা করি। আর কেবল সেজন্যই আপনাকে শ্রদ্ধা জানাই।

এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, এই ভোগবাদী মানসিকতা দূর হবে কিভাবে? পুলিশ-র‍্যাব আর জেল-যুলুমের ভয় দেখিয়ে কি এটা রোধ করা যাবে? ধনিক শ্রেণী তাদের ধনের একটা অংশ কি এমনিতেই দরিদ্র শ্রেণীকে দিয়ে দিবে? ধনী বা গরীব কেউ কি অল্পে তুষ্ট হবে?

শক্তিশালী যালেমকে শক্তিহীন দুর্বলের উপরে অন্যায় ও যুলুম থেকে বিরত রাখবে কে? কেবল মানবিক মূল্যবোধ দিয়েই কি সেটা সম্ভব? তাছাড়া জন্মগতভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে পশুসুলভ চরিত্র। কে তার পশুত্বকে নিবৃত্ত করবে? বাম নেতৃবৃন্দের কাছে এর কোন জওয়াব নেই। ডানদের কাছে জওয়াব থাকলেও তাদের অধিকাংশ কপট বিশ্বাসী ও কার্যক্ষেত্রে বিরোধী।

শ্রদ্ধাস্পদ নির্মল বাবু!

আমরা কেউ আপনা আপনি দুনিয়াতে সৃষ্টি হইনি। আমাদের অবশ্যই একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। যিনি আসমান-যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যকার সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও ব্যবস্থাপক। ধোঁয়া দেখে যেমন আগুনকে চেনা যায়, ফল দেখে যেমন গাছকে

চেনা যায়, তেমনি সৃষ্টি দেখে স্রষ্টাকে চেনা যায়। তিনিই আল্লাহ। মানুষ তার সেরা সৃষ্টি এবং একমাত্র জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান প্রাণী। মানুষকে তিনি ভাল-মন্দ ও পাপ-পুণ্য বিচার করে একটাকে বেছে নেবার স্বাধীনতা দিয়েছেন। আর এতেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার হয়ে থাকে। মানুষ তার ভবিষ্যৎ ভাল-মন্দের খবর রাখে না। তাই আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়ে মানুষের নিকট তাঁর ইলাহী হেদায়াত তথা সত্যবিধান সমূহ পাঠিয়েছেন। সবশেষে মরু আরবের নিরক্ষর নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট মানব জাতির চিরন্তন পথ নির্দেশিকা হিসাবে পবিত্র 'কুরআন' নাযিল হয়। যাতে রয়েছে অতীত জাতিসমূহের ইতিহাস, রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস সমূহ, রয়েছে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের চিরস্থায়ী কল্যাণের নির্দেশনা। সর্বোপরি তাতে রয়েছে পরকালীন জীবনে পুরস্কার ও শাস্তির ঘোষণা। মানুষের দায়িত্ব হ'ল তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তা যথাযথভাবে নিজের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে বাস্তবায়ন করা। যাতে খুব সহজে সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয়।

যেমন গরীবের রক্ত শোষণের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হ'ল সূদী প্রথা। বহু পূর্বে প্লেটো এ বিষয়ে কঠোর বক্তব্য রেখে গেছেন। সকল নবী-রাসূল এর বিরুদ্ধে বলে গেছেন। আল্লাহ একে হারাম করেছেন। কিন্তু মুসলিম-অমুসলিম সকল রাষ্ট্রে সূদ চালু আছে চক্রবৃদ্ধি হারে। তাহ'লে কিভাবে শোষণ বন্ধ হবে? কূয়ার পচা বিড়াল উঠিয়ে না ফেলে কেবল পানি সেচা হচ্ছে। ফলে পানির পচন থেকেই যাচ্ছে। ১৯২০ সালে মার্কিন কংগ্রেস তাদের দেশে সূদ বন্ধের আইন করেছিল। যা Prohilition law নামে খ্যাত। কিন্তু তাতে সূদের প্রচলন হু হু করে বেড়ে গিয়েছিল। ফলে ১৯৩৩ সালে সূদ আবার আইন সম্মত করতে বাধ্য হয় মার্কিন সরকার। এই ব্যর্থতার কারণ, তাদের জনগণের বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটেনি। তাদের পুঁজিবাদী মানসিকতার পরিবর্তন না ঘটিয়েই আইনের পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল। তাই জনগণ তা মানেনি।

এবার দেখুন খ্রিষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে মদীনায় সূদ বন্ধের ইতিহাস। সূদে অভ্যস্ত মানুষগুলো সমাজনেতাদের মনগড়া আইনের দাসত্ব পরিত্যাগ করে আল্লাহ্র দাসত্ব গ্রহণ করল। তাদের সে দাসত্বে ও বিশ্বাসে কোন খাদ ছিল না। এরি মধ্যে সূদ নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান এলো আল্লাহ্র নিকট থেকে তার শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে। ছাহাবী আবু তালহার বাড়ীতে তখন খানা-পিনার বিরাট অনুষ্ঠানে সিরিয়া থেকে আমদানী করা উন্নতমানের মদ পরিবেশিত হচ্ছিল। হঠাৎ রাস্তা দিয়ে যাওয়া ঘোষকের কণ্ঠ শোনা গেল, 'মদ হারাম করা হয়েছে'। ব্যস, শুরু হ'ল মদের ভাণ্ড ভেঙ্গে ফেলার প্রতিযোগিতা। মদীনার রাস্তায় রাস্তায় মদের স্রোত বইতে লাগল। যারা কিছু খেয়েছিল, তারা গলায় আঙ্গুল ঢুকিয়ে বমি করতে লাগল। কানে শোনা মাত্রই পরিবর্তন! কিভাবে সম্ভব হ'ল?

নির্দেশ এলো, 'যে পেট ভরে খায় আর তার প্রতিবেশী না খেয়ে থাকে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়'। রাসূলের এই নির্দেশ মেনে নিয়ে মুসলমান নিজে না খেয়ে প্রতিবেশীকে খাওয়াতে লাগল। জনৈকা মহিলা চোরের পক্ষে সুফারিশ এলে বলে দিলেন, 'আমার মেয়ে ফাতেমা যদি চুরি করে, তাহ'লে শাস্তি স্বরূপ আমি তার হাত কেটে দেব'। জানা গেল, জনৈক রাজস্ব কর্মকর্তা নিজের জন্য উপঢৌকন নিয়েছেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে ডেকে বললেন, তুমি বাড়ীতে গিয়ে তোমার পিতৃগৃহে অবস্থান কর। দেখি কে তোমাকে উপঢৌকন দেয়? এর ফলে দেখা গেল স্বয়ং খলীফা থেকে শুরু করে সাধারণ ব্যক্তি পর্যন্ত সূদ-ঘুষ ও সকল প্রকার দুর্নীতি থেকে তওবা করল। ফল দাঁড়ালো এই যে, ওমর (রাঃ)-এর মাত্র ১০ বছরের শাসনকালের মধ্যে ২২ লাখ বর্গমাইলের বিশাল আরব উপদ্বীপে দরিদ্র মানুষ দূরে থাক 'যাকাত' নেয়ার মত একজন ফকীর-মিসকীনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। অথচ আজ বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ নাগরিক মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও এখানে মানুষ না খেয়ে ঘুমায়। রচিত হয় 'বাসন্তী'দের কাপড় বিহনে জাল পরার ইতিহাস। যা ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষের সময় ঘটেছিল। কারণ তো একটাই, আমরা কপট বিশ্বাসী হয়ে গেছি। যা বলি তা করি না। যা দাবী করি, তা বুঝি না।

জ্ঞান তাপস নির্মল বাবু!

আপনার বয়স এখন ৭৫। আপনি কি মনে করেন মৃত্যুর পরেই মানুষের যাত্রা শেষ? যে মানুষের সেবার জন্য আসমান ও যমীনের সবকিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, সেই মানুষ সর্বাধিক একশ' বছরের মধ্যেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছে। যার মধ্যে যালেম যুলুম করেও প্রশংসা পাচ্ছে। অন্যদিকে নিরপরাধ মযলূম বদনামগ্রস্ত হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছে। তাহ'লে যালেমের যুলুমের শাস্তি এবং মযলূমের যথাযথ পুরস্কার পাবার উপায় কি?

প্লেটো বা এরিষ্টটলের দর্শনে এর কোন জবাব নেই। তারা বলেছেন মানুষ মরে গিয়ে পরম সত্তার মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। যা স্রেফ কাল্পনিক কথা। হিন্দু দর্শনে রয়েছে 'জন্মান্তরবাদ' ও বৌদ্ধ দর্শনে রয়েছে 'নির্বাণবাদ'। সবটারই ফলাফল শূন্য। এইসব দর্শনের ফলে মানুষ হয়ে পড়ে স্বেচ্ছাচারী। কেননা মরার পরেই যখন সব শেষ, তখন সে যা খুশী তাই করবে, এটাই স্বাভাবিক। এইসব নাস্তিক্যবাদী দর্শনের প্রভাবে একদল মানুষ হয়ে পড়ে সংসার বিরাগী। আরেক দল মানুষ হয়ে পড়ে চরম স্বেচ্ছাচারী ও ভোগবাদী।

খ্রিষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে 'ইসলাম' এসে মানুষকে অভয় বাণী শুনায় যে, 'হে মানুষ! এ জীবন তোমার শেষ নয়। যে রূহ আল্লাহ্র নিকট থেকে তোমার মায়ের গর্ভে এসেছিল। যেখান থেকে বুদ্ধিমান মানবশিশু আকারে ভূমিষ্ট হয়ে তুমি দুনিয়ার পরীক্ষাগারে পরীক্ষা দিচ্ছ। অতঃপর নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল পূর্ণ করে পুনরায় ফিরে যাবে সেখানে, যেখান থেকে তোমার রূহটা এসেছিল। অতঃপর সেখানে যালেম তার শাস্তি পাবে

Contents

ও মযলূম তার প্রতিদান পেয়ে ধন্য হবে। বস্তুতঃ সেটাই হ'ল পরজগত। যা হবে সীমাহীন শান্তির অথবা তার বিপরীত।

স্রষ্টা আর সৃষ্টি কখনো এক নয়। সৃষ্টি কখনো স্রষ্টার সত্তায় লীন হয়ে যাবে না। জন্মান্তরের নামে একজনের পাপ-পুণ্যের ফলাফল অন্যে পাবে না। নির্বাণবাদের নামে মানুষ জীবন-যন্ত্রণা থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। বরং আনন্দ ও বেদনা নিয়েই মানুষের জীবন। যার ভাল ও মন্দের পুরস্কার ও প্রতিফল সে পাবেই। জান্নাত অথবা জাহান্নাম হবে তার সেই ফলাফলের চিরস্থায়ী ঠিকানা।

উক্ত বিশ্বাস যে ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে লালন করে, সেই-ই হ'তে পারে প্রকৃত অর্থে পূর্ণ মানুষ। সেই মানুষের কাছে সকল মানুষ নিরাপদ। বর্তমান দুনিয়ামুখী রাজনীতি ও অর্থনীতি মানুষকে স্বার্থপর হিংস্র জীবে পরিণত করেছে। এ অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজন মানুষের চিন্তাজগতে পরিবর্তন আনা। দুনিয়ার উদ্দেশ্যে নয়, আখেরাতের উদ্দেশ্যে দুনিয়ার সকল কাজ করা। তাহ'লেই ভোগবাদী মানুষ ত্যাগী মানুষে পরিণত হবে। অতএব আল্লাহ ও আখেরাতে জবাবদিহিতায় বিশ্বাসী মানুষই কেবল দুনিয়া ও আখেরাতে সত্যিকারের সফলকাম মানুষ।

দেশীয় শোষক গোষ্ঠী ও বিদেশী শকুনদের চক্রান্তে আমি ও আমার সাথীগণের অনেকে আজ কারা নির্যাতিত। আমরা আপনার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি। আর সেজন্যই আপনাকে আহ্বান জানাই আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র ধর্ম 'ইসলাম' কবুল করার জন্য। যে আল্লাহ আপনার মধ্যে উন্নত মানবিক চেতনা দান করেছেন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হউন এবং তাঁর নিকটে আত্মসমর্পণ করুন। মৃত্যুর পর যে চিরস্থায়ী জীবনের দ্বারপ্রান্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, সেই পরকালীন জীবনে যেন আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও অনুগ্রহ লাভে আমরা ধন্য হ'তে পারি, সেজন্য মৃত্যুর আগেই মহান আল্লাহকে অন্তর থেকে কবুল করে নিয়ে আসুন আমরা বলি, *আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।* 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর দাস ও তাঁর প্রেরিত রাসূল'।

ইতি-
আপনার হিতাকাংখী
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

Contents

খুবায়েব বিন আদী (রাঃ)

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ভূমিকা : ছাহাবায়ে কেরামের সীমাহীন ত্যাগ ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে সার্বজনীন ও শাশ্বত জীবনাদর্শ ইসলাম পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তাঁরা নির্দ্বিধায় নিজেদের জান-মাল কুরবানী করে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখে গেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা জীবন বাজি রেখে বা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছেন। সাক্ষাৎ মৃত্যুর কথা জেনেও তাঁরা কখনও পিছপা হননি। দ্বীনের খেদমত ও সহায়তায় জীবনোৎসর্গ করেছেন হাসিমুখে। এজন্য তাঁরা ইসলামের ইতিহাসে সোনালী মানুষ হিসাবে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। যাঁরা নিজেদের জীবনকে আল্লাহ্র রাস্তায় বিলিয়ে দিয়ে শাহাদতের অমিয় সুধা পান করেছেন, খুবায়েব বিন আদী (রাঃ) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এ নিবন্ধে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

নাম ও বংশ পরিচয় : তাঁর নাম খুবায়েব, পিতার নাম আদী। তাঁর পূর্ণ বংশ পরিক্রমা হচ্ছে খুবায়েব বিন আদী বিন বানী জাহজাবী বিন আওফ বিন কিফলাহ্ বিন আওফ বিন আমর বিন আওফ আল-আনছারী।[১] কেউ তাঁর বংশ পরিচয় এভাবে উল্লেখ করেছেন, খুবায়েব বিন আদী বিন আমের বিন মুজদা'আহ বিন জাহজাব আল-আনছারী।[২] কারো মতে, তাঁর বংশক্রম হ'ল- খুবায়েব বিন আদী বিন বানী আমর বিন আওফ আল-আনছারী আল-আওসী।[৩] তার জন্ম ও শৈশব-কৈশোর সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

জিহাদে অংশগ্রহণ : তিনি বদর ও ওহোদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[৪] অতঃপর ৪র্থ হিজরীতে সারিয়া রাজী'তে অংশগ্রহণ করেন ও শাহাদত বরণ করেন।

শাহাদত বরণের ঘটনা : ৪র্থ হিজরীর ছফর মাসে কুরায়েশরা ষড়যন্ত্র করে 'আযাল ও ক্বাররাহ (عَضَلٌ وَالْقَارَّةُ) গোত্রের সাতজন লোককে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে পাঠায়। তারা গিয়ে আরয করে যে, আমাদের গোত্রের মধ্যে ইসলামের কিছু চর্চা রয়েছে। এক্ষণে তাদেরকে দ্বীন শিক্ষাদানের জন্য ও কুরআন পড়ানোর জন্য কয়েকজন উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন ছাহাবীকে পাঠালে আমরা উপকৃত হ'তাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সরল বিশ্বাসে তাদের গোত্রে 'আছেম বিন ছাবিত (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ৬ জন মুহাজির ও ৪জন আনছারসহ ১০ জনের একটি মুবাল্লিগ দল প্রেরণ করেন।[৫] তবে ইমাম বুখারী উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) দশ ব্যক্তিকে গোয়েন্দা হিসাবে সংবাদ সংগ্রহের জন্য পাঠান।[৬] ঐ দলের নেতা 'আছেম ছিলেন ওমরের শ্বশুর এবং 'আছেম বিন ওমরের নানা। তারা রাবেগ ও জেদ্দার মধ্যবর্তী রাজী' নামক ঝর্ণার নিকটে পৌঁছলে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী হুযায়েল গোত্রের শাখা বনু লেহিয়ানের ১০০ তীরন্দায তাদের উপর হামলা করে। এতে 'আছেম সহ ৮জন শহীদ হন এবং খুবায়েব বিন 'আদী ও যায়েদ বিন দাছেনাহকে তারা মক্কায় নিয়ে বিক্রি করে দেয়।[৭]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তাঁরা উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী হাদাআত নামক স্থানে পৌঁছলে হুযায়েল গোত্রের লেহইয়ান শাখার প্রায় দু'শত তীরন্দাযকে তাঁদের পিছু ধাওয়া করার জন্য পাঠায়। এরা তাঁদের চিহ্ন দেখে চলতে থাকে। ছাহাবীগণ মদীনা হ'তে সঙ্গে নিয়ে আসা খেজুর যেখানে বসে খেয়েছিলেন। অবশেষে এরা সে স্থানের সন্ধান পেয়ে যায়। তখন তারা বলল, ইয়াছরিবের খেজুর। অতঃপর এরা তাঁদের পদচিহ্ন দেখে চলতে থাকে। 'আছেম ও তাঁর সাথীগণ এদের দেখে একটি উঁচু স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তখন কাফিররা তাঁদের ঘিরে ফেলল এবং তাঁদেরকে বলতে লাগল, তোমরা অবতরণ কর ও স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব বরণ কর। আমরা তোমাদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, তোমাদের মধ্য হ'তে কাউকে আমরা হত্যা করব না। তখন দলনেতা 'আছেম ইবনু ছাবিত (রাঃ) বললেন, أَمَّا أَنَا فَوَاللهِ لاَ أَنْزِلُ الْيَوْمَ فِى ذِمَّةِ كَافِرٍ، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ. 'আল্লাহ্র কসম! আমি তো আজ কাফিরদের নিরাপত্তায় অবতরণ করব না। হে আল্লাহ! আমাদের পক্ষ থেকে আপনার নবীকে সংবাদ পৌঁছে দিন'। অবশেষে কাফিররা তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করল। আর তারা 'আছেম (রাঃ) সহ সাত জনকে শহীদ করল। অতঃপর অবশিষ্ট তিনজন খুবায়েব আনছারী, যায়েদ ইবনু দাছিনা (রাঃ) ও অপর একজন তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করে তাদের নিকট অবতরণ করলেন। কাফিররা তাঁদেরকে আয়ত্তে নিয়ে তাদের ধনুকের রশি খুলে ফেলে তাঁদের বেঁধে ফেলল। এ সময়ে তৃতীয় ব্যক্তি বলে উঠলেন, هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ، وَاللهِ لاَ أَصْحَبُكُمْ، إِنَّ لِى بِهَؤُلاَءِ أُسْوَةً. 'এযে গোড়াতেই বিশ্বাসঘাতকতা! আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না। যারা শহীদ হয়েছেন আমি তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করব'। কাফিররা তাঁকে শহীদ করে ফেলে এবং খুবায়েব ও ইবনু দাছিনাকে নিয়ে চলে যায়। অবশেষে তাঁদের উভয়কে মক্কায় বিক্রি করে দেয়।[৮]

খুবায়েবকে ক্রয়কারী : খুবায়েবকে হত্যার জন্য ৮০ মিছক্বাল স্বর্ণ মতান্তরে ৫০টি উটের বিনিময়ে খরীদ করেন হুজায়ের বিন আবু ইহাব তামীমী, যিনি বদর যুদ্ধে নিহত হারেছ বিন 'আমের-এর সহোদর ভাই ছিলেন।[৯] কারো মতে, হারেছ বিন

---

১. *ইবনু আবদিল বার্র, আল-ইস্তি'আব ১/১৩০ পৃঃ।*
২. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৩/১৫৩।*
৩. *ছালাহুদ্দীন আছ-ছাফাদী, আল-ওয়াফী বিল ওয়াফিয়াত, (বৈরূত : দারু ইইয়াইত তুরাছ ১৪২০/২০০১ খ্রিঃ), ১৩/১৭৮ পৃঃ।*
৪. *সীরাতে ইবনে হিশাম, ১/৩০০, টীকা নং ২; আল-ইছাবাহ ১/৪১৪; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৩/১৫৩।*
৫. *অন্য বর্ণনায় এসেছে, মারছাদ বিন আবী মারছাদ আল-গানাভী-র নেতৃত্বে। দ্রঃ ইবনু হিশাম ২/১৬৯।*
৬. *বুখারী হা/৩০৪৫, ৩৯৮৯।*
৭. *ইবনু হিশাম ২/১৭৬।*
৮. *বুখারী হা/৩০৪৫, ৩৯৮৯।*
৯. *আল-ইস্তি'আব ১/১৩০; তাকীউদ্দীন আল-মাকরীযী, ইবনু হিশাম ২/১৭২; ইমতাউল আসমা' (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৪২০হিঃ/১৯৯৯খ্রিঃ), ১/১৮৬।*

আমের বিন নওফেলের মেয়ে ১০০ উটের বিনিময়ে খুবায়েবকে ক্রয় করে।[১০] মা'মার ইবনু শিহাব সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হারেছ ইবনু আমের ইবনে নওফেলের বংশধররা খুবায়েবকে ক্রয় করে নেয়।[১১] ইমাম বুখারী উল্লেখ করেন যে, হারেছ বিন আমেরের পুত্ররা খুবায়েবকে ক্রয় করে নেয়। কারণ বদর যুদ্ধের দিন খুবায়েব (রাঃ) হারিছ ইবনু আমিরকে হত্যা করেছিলেন। খুবায়েব (রাঃ) কিছু দিন তাদের নিকট বন্দী থাকেন।[১২]

শূলে বিদ্ধ করার স্থান ও হত্যাকারী : হারাম এলাকা থেকে বের করে ৬ কি. মি. উত্তরে 'তানঈম' নামক স্থানে ছাফওয়ান বিন উমাইয়ার গোলাম নিসতাস ইবনুদ দাছিনাকে হত্যা করে। অতঃপর একই দিনে খুবায়েবকে সেখানে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়।[১৩] ইমাম বুখারী উল্লেখ করেন যে, তারা খুবাইবকে শহীদ করার উদ্দেশ্যে হারাম-এর নিকট হতে হিলের দিকে নিয়ে বের হয়ে পড়ল।[১৪] ওক্ববা বিন হারেছ বিন 'আমের খুবায়েবকে এবং ছাফওয়ান বিন উমাইয়া বিন খালাফ যায়েদকে হত্যা করে বদর যুদ্ধে তাদের স্ব স্ব পিতৃহত্যার বদলা নেয়।[১৫] কিন্তু আব্বাদ ইবনু আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের স্বীয় পিতার সূত্রে উক্ববা হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি খুবায়েবকে হত্যা করিনি। কেননা তখন আমি ছোট ছিলাম। তবে বনু আব্দুদ দারের মিত্র আবু মায়সারা একটি ছোট বর্শা নিয়ে আমার হাতে ঢুকিয়ে দেয়। অতঃপর সে বর্শা সহ আমার হাত ধরে খুবায়েবকে আঘাত করে তাকে হত্যা করে'।[১৬]

শূলে চড়ার আগে খুবায়েব দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করেন এবং বলেন, আমি ভীত হয়েছি, এই অপবাদ তোমরা না দিলে আমি দীর্ঘক্ষণ ছালাত আদায় করতাম। তিনিই প্রথম এই সুন্নাতের সূচনা করেন। অতঃপর কাফেরদের জন্য বদ দো'আ করেন এবং মর্মন্তুদ কবিতা বলেন, যা ছহীহ বুখারী সহ বিভিন্ন হাদীছ ও জীবনী গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। খুবায়েবের সেই বিখ্যাত দো'আটি ছিল নিম্নরূপ- اَللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلاَ تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا– 'হে আল্লাহ! তুমি এদেরকে এক এক করে গুণে রাখ। তাদেরকে এক এক করে হত্যা কর এবং এদের একজনকেও অবশিষ্ট রেখো না'। অতঃপর তাঁর পঠিত সাত বা দশ লাইন কবিতার বিশেষ দু'টি লাইন ছিল নিম্নরূপ-

وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا* عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللهِ مَصْرَعِي

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ * يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

'আমি যখন মুসলিম হিসাবে নিহত হই তখন আমি কোন পরোয়া করি না যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আমাকে কোন্ পার্শ্বে শোয়ানো হচ্ছে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই আমার মৃত্যু হচ্ছে। তিনি ইচ্ছা করলে আমার খণ্ডিত টুকরা সমূহে বরকত দান করতে পারেন'।[১৭]

খুবায়েবের সাথী যায়েদ বিন দাছেনাকে হত্যার পূর্বে আবু সুফিয়ান তাকে বললেন, তুমি কি এটাতে খুশী হবে যে, তোমার স্থলে আমরা মুহাম্মাদকে হত্যা করি এবং তুমি তোমার পরিবার সহ বেঁচে থাক? তিনি বলেন, لاَ وَاللهِ الْعَظِيمِ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْدِيَنِي بِشَوْكَةٍ يُشَاكُهَا فِي قَدَمِه 'কখনোই না। মহান আল্লাহ্র কসম! আমি চাই না যে, আমার স্থলে তাঁর পায়ে একটি কাঁটারও আঘাত লাগুক'। একথা শুনে বিস্মিত আবু সুফিয়ান বললেন, مَا رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ أَحَدًا يُحِبُّ أَحَدًا كَحُبِّ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا 'মুহাম্মাদের সাথীরা মুহাম্মাদকে যেরূপ ভালোবাসে সেরূপ কাউকে আমি দেখিনি'।[১৮]

মৃত্যুর পূর্বে খুবায়েবের শেষ বাক্য ছিল- اَللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ بَلَّغْنَا رِسَالَةَ رَسُولِكَ، فَبَلِّغْهُ الْغَدَاةَ مَا يُصْنَعُ بِنَا 'হে আল্লাহ, আমরা তোমার রাসূলের রিসালাত পৌঁছে দিয়েছি। এক্ষণে তুমি তাঁকে আমাদের সাথে যা করা হচ্ছে, সে খবরটি পৌঁছে দাও'।[১৯]

ওমর (রাঃ)-এর গভর্ণর সাঈদ বিন 'আমের (রাঃ) যিনি খোবায়েবের হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তিনি উক্ত মর্মান্তিক ঘটনা স্মরণ করে মাঝে-মধ্যে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেতেন। তিনি বলতেন, খোবায়েবের নিহত হবার দৃশ্য স্মরণ হ'লে আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারি না। আল্লাহ্র পথে কতবড় ধৈর্যশীল তিনি ছিলেন যে, একবার উহ্ পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি। বন্দী অবস্থায় তাঁকে থোকা থোকা আঙ্গুর খেতে দেখা গেছে। অথচ ঐসময় মক্কায় কোন আঙ্গুর ছিল না'।[২০]

দাফন : বীরে মা'উনার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে বেঁচে যাওয়া একমাত্র ছাহাবী 'আমর বিন উমাইয়া যামরী প্রহরীদের লুকিয়ে অতীব চতুরতার সাথে খুবায়েবের লাশ এনে সসম্মানে দাফন করেন।[২১]

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) উল্লেখ করেন যে, নবী করীম (ছাঃ) মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ ও যুবায়ের ইবনুল আওয়ামকে প্রেরণ করেন খুবায়েব (রাঃ)-কে শূলের কাষ্ঠ থেকে নামানোর জন্য। তাঁরা দু'জন তানঈমে পৌঁছে ৪০ জন নেশাগ্রস্ত মাতাল লোক দেখতে পান। তাঁরা খুবায়েবকে নামান এবং যুবায়ের তাকে স্বীয় ঘোড়ায় উঠিয়ে নেন। তাঁর দেহ তখনও সজীব ছিল, কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয়নি। এ সময়

---

১০. *ইমতাউল আসমা', ১/১৮৬।*
১১. *আল-ইস্তি'আব ১/১৩০।*
১২. *বুখারী হা/৩০৪৫, ৩৯৮৯।*
১৩. *আল-বিদায়াহ ৪/৬৫-৬৬।*
১৪. বুখারী হা/৩০৪৫।
১৫. *ইবনু হিশাম ২/১৭৬।*
১৬. *আল-বিদায়াহ ৪/৬৬; সীরাতে ইবনে কাছীর ৩/১৩০; রওযুল উনফ, ৬/১৩২।*

---

১৭. *ইবনু হিশাম ২/১৭৬; বুখারী হা/৩০৪৫, ৩৯৮৯।*
১৮. *সীরাতে ইবনে হিশাম, ২/১৭২; সীরাতুল হালাবিয়া, ৩/১৬৪; সীরাতু ইবনে কাছীর ৩/১২৫।*
১৯. *ইবনু হিশাম ২/১৭২।*
২০. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৩৯৪।*
২১. *আর-রহীকুল মাখতূম, ১/২৬৬; আল-বিদায়াহ ৪/৬৬।*

মুশরিকরা এসে তাঁদেরকে ধমক দিল ও সতর্ক করল। তারা সন্নিকটে চলে আসল, তখন যুবায়ের (রাঃ) খুবায়েবের লাশ ফেলে দিলেন। যমীন লাশকে গিলে ফেলল। ফলে তার নামকরণ হ'ল بليع الأرض 'যমীন কর্তৃক গ্রাসকৃত'।[২২]

খুবায়েবের অনুপম ব্যবহার : খুবায়েব যুলকা'দা মাসে বন্দী হন। এটা ছিল হারাম মাস। এজন্য তাকে বনু আব্দে মানাফের দাসী মু'আবিয়ার বাড়ীতে বন্দী রাখা হয়।[২৩] অন্য বর্ণনায় আছে, হুজায়েরের দাসী, যিনি পরে মুসলমান হন, তার বাড়ীতে খুবায়েবকে বন্দী রাখা হয়। তিনি বলেন যে, খোবায়েব আমার বাড়ীতে আটক ছিল। একদিন আমি তাকে বড় এক থোকা আঙ্গুর খেতে দেখি। অথচ তখন মক্কায় কোন আঙ্গুর ছিল না। তিনি বলেন, হত্যার সময় উপস্থিত হ'লে তিনি আমাকে বলেন, আমার জন্য একটা ক্ষুর পাঠিয়ে দিন, যাতে হত্যার পূর্বে আমি ক্ষৌরকর্ম করে পবিত্রতা অর্জন করতে পারি। তখন আমি আমার বাচ্চাকে দিয়ে তাঁকে একটা ক্ষুর পাঠিয়ে দিলাম। পরক্ষণে আমি বলে উঠলাম, হায়! আমি এটা কি করলাম? আল্লাহ্র কসম! লোকটি নিজের হত্যার বদলে আমার বাচ্চাকে হত্যা করবে। অতঃপর সে বাচ্চার হাত থেকে ক্ষুরটি নিয়ে বলল, তোমার জীবনের কসম! তোমার মা যেন আমার বিশ্বাসঘাতকতার ভয় না করেন, যখন তিনি তোমাকে এই ক্ষুরসহ আমার কাছে পাঠিয়েছেন। অতঃপর সে বাচ্চাকে ছেড়ে দিল'।[২৪]

ইবনু শিহাব (রহঃ) বলেন, আমাকে ওবায়দুল্লাহ ইবনু আয়ায অবহিত করেছেন, তাঁকে হারিছের কন্যা জানিয়েছে যে, যখন হারিছের পুত্রগণ খুবায়েব (রাঃ)-কে শহীদ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিল, তখন তিনি তার কাছ থেকে ক্ষৌর কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে একটা ক্ষুর ধার চাইলেন। তখন হারিছের কন্যা তাকে একখানা ক্ষুর ধার দিল। সে সময় ঘটনাক্রমে আমার ছেলে আমার অজ্ঞাতে খুবায়েবের নিকট চলে যায় এবং আমি দেখলাম যে, আমার ছেলে খুবায়েবের উরুর উপর বসে আছে এবং খুবায়েবের হাতে রয়েছে ক্ষুর। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। খুবায়েব আমার চেহারা দেখে বুঝতে পারলেন যে, আমি ভয় পাচ্ছি। তখন তিনি বললেন, তুমি কি এ ভয় কর যে, আমি শিশুটিকে হত্যা করব? কখনও আমি তা করব না। আল্লাহ্র কসম! আমি খুবায়েবের মত উত্তম বন্দী কখনো দেখিনি। আল্লাহ্র শপথ! আমি একদা দেখলাম, তিনি লোহার শিকলে আবদ্ধ অবস্থায় ছড়া হ'তে আঙ্গুর খাচ্ছেন, যা তাঁর হাতেই ছিল। অথচ এ সময় মক্কায় কোন ফলই পাওয়া যাচ্ছিল না। হারিছের কন্যা বলতো, এ তো ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হ'তে প্রদত্ত জীবিকা, যা তিনি খুবায়েবকে দান করেছেন।[২৫]

২২. *আল-ইছাবাহ, ২/২২৬ পৃঃ; আয-যুরকানী, শারহুয যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, ২/৪৯৩।*
২৩. *ইমতাউল আসমা', ১/১৮৬।*
২৪. *ইবনু হিশাম ২/১৭২।*
২৫. *বুখারী হা/৩০৪৫, ৩৯৮৯।*

অন্য বর্ণনায় এসেছে, কুরায়েশরা খোবায়েবকে হারেছ বিন 'আমেরের বাড়ীতে কয়েকদিন বন্দী রাখে। এ সময় তাকে কোন খাদ্য বা পানীয় দেওয়া হয়নি। একদিন হঠাৎ হারেছ-এর ছোট্ট বাচ্চা ছেলেটি ধারালো ছুরি নিয়ে খেলতে খেলতে তার কাছে চলে আসে। তিনি তাকে আদর করে কোলে বসান। এ দৃশ্য দেখে বাচ্চার মা চিৎকার করে ওঠেন। তখন খোবায়েব বলেন, মুসলমান কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না।

ইবাদত-বন্দেগী : তিনি ছিলেন আল্লাহভীরু, ধার্মিক, আবেদ ও তাপস। তিনি রাত্রে দীর্ঘ ক্বিরাতে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করতেন।[২৬] সুন্নাত পালনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অতি আন্তরিক ও সদা সচেতন। যেমন তিনি ক্ষৌরকর্মের জন্য মৃত্যুর পূর্বে হারেছের কন্যার নিকটে ক্ষুর চেয়ে নেন। এছাড়া তিনি হারাম-হালালের ব্যাপারে অতি সজাগ ও হুঁশিয়ার ছিলেন। যেমন হুজায়েরের দাসী যখন জিজ্ঞেস করে তোমার কোন প্রয়োজন আছে কি? তখন তিনি বলেন, আমি তোমার নিকটে ৩টি বিষয় কামনা করি। ১. তুমি আমাকে মদ পান করাবে না, ২. দেব-দেবীর নামে উৎসর্গিত বা যবেহকৃত জিনিস আমার থেকে দূরে রাখবে, ৩. তারা যখন আমাকে হত্যা করতে চাইবে, তখন তুমি আমাকে অবহিত করবে।[২৭]

মানাকিব ও কারামাত : খুবায়েবের মর্যাদা সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, তিনি শাহাদতের অমিয় সুধা পান করেছেন। আর তাঁর কারামাত হ'ল মক্কায় যখন কোন ফল পাওয়া যেত না, তখন তিনি আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক হিসাবে আঙ্গুরের থোকা থেকে ছিড়ে ছিড়ে খেয়েছেন।[২৮]

খুবায়েব (রাঃ)-এর জীবনীতে উপদেশ ও শিক্ষা : খুবায়েব (রাঃ)-এর শাহাদতের ঘটনায় অনেক উপদেশ রয়েছে। এসব উপদেশ মুসলিম মিল্লাতের জন্য অনুসরণীয়। তার মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ আল্লাহ্র দ্বীন ও রাসূলের সহযোগিতার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

২. বন্দীত্ব বরণে কল্যাণ মনে করলে মুসলিম ব্যক্তি তাৎক্ষণিক হত্যার কবল থেকে রক্ষার জন্য কাফির-মুশরিকের নিকটে বন্দীত্ব বরণ করতে পারে।

৩. মুশরিকদের শিশু সন্তান ও মুশরিক শিশুদের হত্যা করা থেকে বিরত থাকা।

৪. এ ঘটনায় কারামাতে আওলিয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে। যেমন (ক) বিনা মওসুমে খুবায়েরের আঙ্গুর ফল খাওয়া (খ) আছেম বিন ছাবিতের লাশকে হেফাযত করা। যখন কুরাইশ কাফিরদেরকে এ সংবাদ পৌছানো হয় যে, 'আছেম (রাঃ)-কে শহীদ করা হয়েছে, তখন তারা তাঁর কাছে এক লোককে পাঠায়, যাতে সে ব্যক্তি তাঁর লাশ হ'তে কিছু অংশ কেটে নিয়ে আসে, যাতে তারা তা দেখে চিনতে পারে। কারণ বদর যুদ্ধের দিন 'আছেম (রাঃ)

২৬. *ইমতাউল আসমা', ১৩/২৭৬; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৬/৪৩।*
২৭. *ফৎহুল বারী ৭/৩৮২; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১/২৪৯।*
২৮. *বুখারী হা/৩০৪৫।*

কুরাইশদের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। 'আছেমের লাশের (রক্ষার জন্য) মৌমাছির ঝাঁক প্রেরিত হল, যারা তাঁর দেহ আবৃত করে রেখে তাদের ষড়যন্ত্র হ'তে হিফাযত করল। ফলে তারা তাঁর শরীর হ'তে এক খণ্ড গোশতও কেটে নিতে পারেনি'।[২৯]

(গ) তাদের দো'আয় রাসূলের নিকটে গোয়েন্দা দলের সংবাদ পৌঁছানো। যেমন 'আছেম (রাঃ) দো'আ করেন, اَللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ. 'হে আল্লাহ! আমাদের পক্ষ থেকে আপনার নবীকে সংবাদ পৌঁছে দিন'। খুবায়েব (রাঃ) দো'আ করেন, اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ بَلَّغْنَا رِسَالَةَ رَسُولِكَ، فَبَلِّغْهُ الْغَدَاةَ مَا يُصْنَعُ بِنَا 'হে আল্লাহ! আমরা তোমার রাসূলের রিসালাত পৌঁছে দিয়েছি। এক্ষণে তুমি তাঁকে আমাদের সাথে যা করা হচ্ছে, সে খবরটি পৌঁছে দাও'।[৩০]

৫. আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে যে কোনভাবে পরীক্ষা করতে পারেন। এর মাধ্যমে ঐসব মুসলিমদের সম্মানিত করতে ও তাদেরকে পুরস্কৃত করতে চান। কেননা মুমিনদের জন্য আল্লাহ্র নিকটে প্রত্যাবর্তনই উত্তম, দুনিয়ায় বেঁচে থাকার চেয়ে।

৬. স্বভাবগত সুন্নাতের প্রতি লক্ষ্য রাখা যরূরী, সেটা যেকোন প্রতিকূল অবস্থায়ই হোকনা কেন।

৭. যুদ্ধক্ষেত্রে অনুসন্ধানকারী দল থাকা যরূরী। এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) বিশেষ গুরুত্ব দিতেন।

৮. শত্রুদের জন্য নিজেদের পরিচয় প্রকাশক কোন জিনিস ছেড়ে যাওয়া থেকে মুসলিম বাহিনীকে সতর্ক ও সাবধান হ'তে হবে। যেমন 'আছেম বিন ছাবিতের দলের ফেলে যাওয়া খেজুরের আঁটি দেখে মুশরিকরা তাদের গতিপথ জেনে যায়।

৯. তীরন্দাযী যে যুদ্ধক্ষেত্রে অনন্য শক্তি, এ ঘটনা তার প্রমাণ। এতে কাফেররা ৭ জন মুসলিম মুজাহিদকে তীর নিক্ষেপে শহীদ করে। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ 'নিশ্চয়ই শক্তি হচ্ছে তীরন্দাযীতে'।[৩১]

১০. মুসলিমের সুন্দর আচরণ ও উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশের মাধ্যমে ইসলামের অনুপম আদর্শের প্রকাশ ঘটে। যেমন খুবায়েব (রাঃ) বনু হারেছের জনৈক মহিলার বাড়ীতে বন্দী থাকাবস্থায় তার ছেলেকে হাতের কাছে পেয়েও অক্ষত অবস্থায় ছেড়ে দেন। তিনি নিহত হবেন এটা জানার পরও তিনি প্রতিশোধ নেননি। যে কারণে মহিলা অকপটে স্বীকার করেন, وَاللهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيْرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ 'আল্লাহ্র কসম! আমি খুবায়েবের চেয়ে উত্তম কোন বন্দি কখনও দেখিনি'।[৩২]

১১. আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন। যেমন আল্লাহ খুবায়েবকে রিযক দান করেছিলেন।

১২. কুরাইশরা 'হারামকে' সম্মান করত। তারা মুশরিক হওয়া হারামের মধ্যে বন্দীদেরকেও হত্যা করতো না, বরং তারা তাদেরকে হারাম এলাকার বাইরে নিয়ে যেত। তারা হারাম মাসেও কাউকে হত্যা করতো না।

১৩. মুসলিম ব্যক্তির নিহত হওয়ার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা শরী'আত সম্মত। খুবায়েব (রাঃ)ই প্রথম এ সুন্নাত চালু করেন।

১৪. মুসলমানদের জন্য কাফিরদের বিরুদ্ধে দো'আ করা বৈধ। যেমন খুবায়েব (রাঃ) দো'আ করেন

اَللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلاَ تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا-

১৫. কোন কোন কাফের তাদের বিরুদ্ধে কৃত মুসলমানদের দো'আকে ভয় করে। এজন্য দেখা যায়, খুবায়েব (রাঃ)-এর হত্যা কাণ্ডের সময় উপস্থিত অনেকেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে। তাদের উপরে খুবায়েবের দো'আ বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি এটা ছিল তাদের কারো কারো ইসলাম গ্রহণের প্রাথমিক কারণ।

১৬. হত্যার সময় কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করা যায়। যেমন খুবায়েব (রাঃ) করেছিলেন। যা খুবায়েবের ঈমানী শক্তি ও দ্বীনের উপরে দৃঢ়তার প্রমাণ বহন করে।

১৭. এতে মুসলমানের দো'আ কবুল হওয়া এবং জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর তাদের সম্মানিত হওয়ার প্রমাণ মেলে। যেমন- 'আছেম-এর লাশ আনার জন্য কুরায়েশ নেতারা লোক পাঠান। কিন্তু আল্লাহ তার লাশের হেফাযতের জন্য এক ঝাঁক ভীমরুল প্রেরণ করেন। ফলে মুশরিকরা তার লাশের নিকটে যেতে পারেনি। কেননা 'আছেম আল্লাহ্র নিকটে অঙ্গীকার দিয়েছিলেন, لاَ يَمَسَّهُ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَمَسَّ مُشْرِكًا أَبَدًا فِي حَيَاتِه 'যেন কোন মুশরিক তাকে স্পর্শ না করে এবং তিনিও কোন মুশরিককে তাঁর জীবদ্দশায় কখনো স্পর্শ না করেন'। পরে ওমর (রাঃ) বলেন, مَنَعَهُ اللهُ بَعْدَ وَفَاتِه، كَمَا امْتَنَعَ مِنْهُ فِي حَيَاتِه 'আল্লাহ তাঁকে মুশরিকের স্পর্শ থেকে মৃত্যুর পরেও হেফাযত করেছেন, যেমন তাকে জীবিত অবস্থায় হেফাযত করেছিলেন'।[৩৩]

আর আল্লাহ মুসলমানদের হত্যা করা থেকে কাফেরদের বাধা দেন না। কেননা তিনি শাহাদতের মাধ্যমে মুসলমানদের সম্মানিত করতে চান।

১৮. এ ঘটনায় আরো প্রমাণিত হয় যে, খিয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা কাফেরদের বৈশিষ্ট্য। যেমন তারা আব্দুল্লাহ বিন তারেককে হত্যা করে এবং খুবায়েব ও যায়েদকে কুরাইশদের নিকটে বিক্রি করে দেয়।[৩৪]

---

২৯. বুখারী হা/৩০৪৫, ৩৯৮৯।
৩০. ইবনু হিশাম ২/১৭২।
৩১. মুসলিম হা/১৯১৭; আবু দাউদ হা/২৫১৪; মিশকাত হা/৩৮৬১।
৩২. বুখারী হা/৩০৪৫, ৩৯৮৯, ৪০৮৬।
৩৩. ইবনু হিশাম ২/১৭১।
৩৪. ফাতহুল বারী ৭/৩৮৩-৮৪; মুহাম্মাদ আলী আছ-ছাল্লাবী, আস-সীরাতুন নাবাবিয়াহ, ১/৫৩৫-৩৭।

Contents

উপসংহার : খুবায়েব (রাঃ)-এর শাহাদতের ঘটনা মুসলিম উম্মাহর জন্য স্মরণীয় এক অনন্য ঘটনা। আত্মত্যাগের এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। অসীম সাহসী, ইবাদত গুযার, সুন্নাতের পাবন্দ ও ইসলামের উপর দৃঢ়পদ এ ছাহাবীই মৃত্যুকালে নফল ছালাত আদায়ের সুন্নাত চালু করেন। তিনিই প্রথম মুসলিম, যাকে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। তাঁর জীবনী থেকে মুসলিম জাতির জন্য অনেক শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। এগুলি আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারলে আমরা ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে সফলতার সোনালী সোপানে আরোহণ করতে পারব; সফলতা লাভ করতে পারব জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পেয়ে; কামিয়াবী হাছিল করতে পারব জান্নাতে দাখিল হয়ে। আল্লাহ আমাদের সকলকে উভয় জীবনে সফলতা দান করুন-আমীন!

Contents

ঝিলাম-নীলামের দেশে

*আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব**

জীবনের গতিপথ যে হিসাব মেনে চলে না, তার প্রমাণ ইদানিং একদম হাতে নাতে পেয়ে যাচ্ছি। মারী হিল্‌সে যাব ভাবছি ক'দিন ধরেই, কিন্তু আজ-কালের ঘূর্ণাবর্ত ভেদ করতে না পেরে ভাবনাটা দোদুল্যমান থাকে। হাড়কাঁপানো শীতের এক ভোর। আত-তাহরীকের সাময়িক প্রসঙ্গ কলামটি লিখতে বসেছি। কখন শেষ হবে জানি না। স্কাইপের বার্তাঘরটা ঘন ঘন হলুদবর্ণ হচ্ছে, ছোটভাই নাজীবের বিরামহীন তাগাদা, এত সময় লাগে কেন! ট্রেসিং বের করে কখন নিষ্ক্রান্ত হবে, সেই অপেক্ষায় রীতিমত ছটফট করছে। ওদিকে পেশোয়ার এগ্রিকালচারাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালী ছাত্র রাহীল আরশাদ পেশোয়ার থেকে রওনা দিয়েছে। মারীতে বরফবারী শুরু হয়েছে আর আমি যাচ্ছি শুনে আর স্থির থাকতে পারেনি। পরীক্ষার চাপ মাথায় নিয়েই ছুটে আসছে। অবশেষে একটানে লেখাটা শেষ করে বেলা ১০টা নাগাদ ভারমুক্ত হলাম আলহামদুলিল্লাহ। মেইল করে রেডি হলাম ঝটপট। বেরিয়ে পড়লাম দশ মিনিটের মধ্যে। আব্দুর রহমান ভাইয়েরও যাওয়ার কথা। কিন্তু সকাল থেকেই তাঁর মোবাইলে কবরের নিস্তব্ধতা। অগণিতবার রিং করার পর শেষ পর্যন্ত রিসিভ হ'ল। এক ব্যক্তি নাকি ভুল করে তাঁর কক্ষের দরজায় তালা আটকিয়ে কোথায় গিয়েছিল। তাতেই যত বিড়ম্বনা। মাত্রই তালা খুলে ঘরে ঢুকেছেন। মাথায় হাত পড়ল আমার। পিন্ডির যে প্রান্তে থাকেন, সেখান থেকে আসতে আরও ঘন্টাখানিক লাগবে! ফায়যাবাদ বাসস্টান্ডে নেমে কিছুক্ষণ পায়চারী করতেই রাহীল উপস্থিত। দু'জনে মিলে নির্মানাধীন ফ্লাইওভারের নীচে অলস গল্প-গুজব করতে থাকি আর জনমানুষের কীর্তিকলাপ দেখি। একসময় মুরব্বী উপস্থিত হলেন হাঁটু লম্বা উইন্টার কোট চাপিয়ে ইতিউতি তাকাতে তাকাতে। চেহারায় অনুশোচনার লেশমাত্র নেই। উদাসীন পথিকের মনের কথা ধরতে গিয়ে ফের কোন বিপদে পড়ি, সেই ভয়ে আমরা কথা বাড়াই না। 'বাবা বাঙ্গাল' হিসাবে ইদানিং তার বেশ নাম-ডাক হয়েছে। চেহারায় অমন আনমনা ঋষিভাবটা তাই বেশ মানিয়েছে।

প্রসঙ্গত, 'বাবা বাঙ্গাল' বলতে পাকিস্তানীরা অজ্ঞান। তথাকথিত 'কালা যাদু'র হাত থেকে রেহাই পেতে কি ধনী কি গরীব, দলে দলে সবাই কবিরাজের বাড়িতে ছোটেন। আর কবিরাজ মানেই এখানে এক ডাকে পরিচিত বাঙ্গালী কবিরাজরা। করাচী কেন্দ্রিক এই বাবা বাঙ্গালদের ব্যবসার প্রসার রীতিমত ঈর্ষণীয়। পাকিস্তানে আসার পর এই বাবাদের নামডাক শুনে আমি হতবাক হয়েছিলাম। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, বাঙালী মানেই সম্ভবত এদের অনেকের কাছে 'বাবা বাঙ্গাল'। একদিন আমি নিজেই এমন এক বিব্রতকর ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিলাম। হোস্টেলে ওঠার পর একদিন পার্শ্ববর্তী রুমের এক পাকিস্তানী ছাত্র এসে প্রসঙ্গ ছাড়াই নিজের শারীরিক সমস্যা বর্ণনা করে চিকিৎসা চাইল। জানতে চাইলাম, আমাকে এসব বলার কারণ কি? সে বলল, আমি শুনেছি বাঙালীরা ঝাড়ফুঁকে খুব পারদর্শী, তারা কালা জাদু ঝাড়াতে পারে। আমি হেসে বললাম, 'বাঙালী ব্ল্যাক ম্যাজিকের চিকিৎসা করে, সেটা তোমাদের দেশে এসেই প্রথম জেনেছি, দেশে থাকতে আমি এসব কোনদিন শুনিনি'। কিন্তু সে বিশ্বাসই করল না। বোধহয় ভাবল, আমি কৌশলে এড়াতে চাচ্ছি।

করাচীর অলি-গলিতে দেখেছি বাবা বাঙ্গালদের নামে অসংখ্য চিকা মারা। ইসলামাবাদ থেকে ট্রেনে লাহোর যাওয়ার পথে চোখে পড়েছে দেয়ালে দেয়ালে 'আমেল আকাশ', 'শাদী মে রাকাওট... মহাব্বাত মে নাকামী...হার মাসআলা কি হাল' ইত্যাদি চটকদার বিজ্ঞাপনের সমাহার। অবশ্য এই ব্যবসা এখন আগের মত আর একচেটিয়া নেই। এতে ভাগ বসিয়েছে প্রতারক চক্র। অর্থাৎ আসল বাবাদের জায়গা দখল করছে নকল বাবারা। জাতে পাকিস্তানী হলেও বাঙ্গালীদের খ্যাতি ব্যবহার করে তারা নিজেরাই 'বাবা বাঙ্গাল' হয়ে বসেছে। আর চুটিয়ে ব্যবসা করে যাচ্ছে সিন্ধু ও পাঞ্জাবের গঞ্জে-শহরে। দিন দিন দৌরাত্ম বাড়ছে নকল বাবাদের। ফলে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে আসল বাবাদের সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিতে হচ্ছে, 'আসল বাবা বাঙ্গাল চিনে নিন'। চিকিৎসাপ্রার্থীরা তাই চোখ-কান খোলা রাখেন। তারপরও প্রায়শই বিভ্রান্ত হয়ে সেকস্ত হতে হচ্ছে তাদের। আব্দুর রহমান ভাই অবশ্য এই টাইপের 'বাবা' নন। তিনি নিঃস্বার্থ জনসেবা করেন। শারঈ পদ্ধতিতে ঝাড়-ফুঁক এবং দো'আ দেন। বিনিময়ে একটি পয়সাও নেন না। দুঃখের ব্যাপার, মানুষ তার এই মহানুভবতার মূল্য দেয় না। বরং তাকে ইচ্ছামত ব্যবহার করে। অনেক সময় দূরবর্তী কোন স্থানে রোগী দেখতে গেলে যাতায়াত ভাড়াটা পর্যন্ত পান না। মনের দুঃখে তাই অনেকবার এই 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো' জনসেবা ছেড়ে দেবার কথা ভেবেছেন, কিন্তু পারেননি।

লোকাল মাইক্রোতে আমরা রওয়ানা হলাম মারীর উদ্দেশ্যে। ইসলামাবাদ থেকে ৫০ কিলোমিটারের দূরত্ব। পৌঁছতে সোয়া ঘন্টা লাগে। গত দু'দিন প্রচুর তুষারপাত হয়েছে। ঘরবাড়ী, গাছপালা সব ধবধবে সাদা। রাস্তায় স্তূপাকারে জমে থাকা বরফ ঠেলে মল রোডে উঠে আসলাম। আকাশে ঘন কালো মেঘ। বিদ্যুতের চমক, সেইসাথে গর্জনও। খানিক বাদে 'মুষলধারে' তুষারপাত শুরু হ'ল। তুলোর মত নেমে আসতে লাগল অজস্র তুষারকণা। নেই রিমঝিম শব্দ, কিন্তু তাতে কি! মায়াময় স্বপ্নের জাল বোনার কাজটা থেমে থাকে না। শুভ্র মারীর শুভ্র বসনে কালিমার লেশমাত্র নেই আর। উপরে ওঠার রাস্তাগুলো ভয়াবহ পিচ্ছিল। দেহটাকে সামলে উঠে পড়লাম পাহাড়ের উপর এক মসজিদে। যোহর-আছরের ছালাত আদায় করলাম সেখানে। মসজিদে হিটার ছিল। তাই বেরিয়ে আসা মাত্রই বাতাসের শীতল ঝাপটায় আক্ষরিক অর্থেই হাড়

*এম.এস (হাদীছ), ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।

Contents

পর্যন্ত কেঁপে উঠল। ধাতস্থ হ'তে ঢের সময় লাগল। তাড়াহুড়ো করে মল রোডের একটি হোটেলে ঢুকে পড়লাম। সেখানে ঐতিহ্যবাহী 'চিকেন-কড়াই' পর্ব সেরে প্রকৃতির সাথে মিতালী গড়বার নিয়তে হাঁটা শুরু করলাম কাশ্মীর পয়েন্টের দিকে। জনমানব খুব একটা নেই। ধুসর মেঘেরা আকাশ থেকে নেমে এসে মর্ত্য ছুঁয়েছে। হিম হিম কুয়াশায় ঢেকে দিয়েছে শ্বেত-শুভ্র ধরণী। ঘন ম্যাপল, ওয়ালনাট, ফার, পাইনের বনে কোন পাখির কলকাকলী নেই। নেই কাঠপোকাদের ঝিঁঝি গান। জমাট মৌনতা। মাঝে মাঝে কেবল গাছের পাতায় পাতায় জমে থাকা তুষার রাস্তায় ঠাস করে পড়ে চমকে দেয়। প্রকৃতির এমন ঠাসবুনট রহস্যময়তায় এক অদ্ভুত বিহ্বলতা চেপে বসে। অচেনা অনুভূতির মন্দ্রিত আবেশে দ্রবীভূত হয়ে হারিয়ে যাই জাগতিক পৃথিবীর বাইরে..বহু দূরে। একটা সময় কেবলই মনে হ'তে থাকে, দুনিয়ার এই সৌন্দর্য যদি এমন বাঁধনহারা, পাগলপারা করে দেয়, তাহলে জান্নাতের সেই সৌন্দর্য কেমন! কল্পনার গতিপথটা অন্তহীন যাত্রায় শামিল হয়। জীবনের পথচলাকে হঠাৎ বড় দীর্ঘ মনে হতে থাকে। শিশুসুলভ কৌতুহলে বড় ছটফট করতে থাকে মনটা... সেই অপার সৌন্দর্যে অবগাহণের অধীর প্রতীক্ষায় ...যা কোন চোখ কখনও দেখেনি, কোন কান কখনও শুনেনি, কোন অন্তর কখনও কল্পনাও করেনি। *সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি*।

দূরে কোথাও আছরের আযান পড়লে টনক নড়ে। ঘড়িতে সময় দেখলাম। এত আগে আহলেহাদীছ মসজিদ ছাড়া কোথাও আযান হয় না। নিশ্চিতভাবে এখানে কোথাও আহলেহাদীছ মসজিদ আছে। তবে কাছাকাছি এমন কাউকে পেলাম না যার কাছে জানা যায় মসজিদের অবস্থান। আবার মল রোডে ফিরে আসি। কিছু কেনাকাটা করে আড্ডায় আসলাম। আমাদের প্লান ছিল রাতে এ্যাবোটাবাদে থাকব। বালাকোটের এহসান এলাহী ভাইয়ের কাছ থেকে জেনেছিলাম, গালিয়াতের যে অংশটি আহলেহাদীছ অধ্যুষিত, সেখানে মুরতাযা এবং মুছতফা নামে দুই ভাই আছেন। যাদের কাছে বালাকোট জিহাদের কিছু স্মৃতি সংরক্ষিত আছে। যেমন জিহাদের পতাকা এবং শাহ ইসমাঈল (রহ.)-এর ব্যবহৃত কিছু জিনিস। তাদের বাড়িতে গিয়ে সেই স্মৃতিচিহ্নগুলো স্বচক্ষে দেখে আসা এবং ছবি তুলে নিয়ে আসার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু তার আগেই আব্দুর রহমান ভাইয়ের কাছে তাঁর এক কাশ্মীরী বন্ধুর ফোন এল। দীর্ঘ আলাপের পর আমার কথা শুনে উনি পাকাপাকি দাওয়াত দিয়ে বসলেন।

কাশ্মীর! কাশ্মীর যাওয়ার মওকা খুঁজছি অনেকদিন ধরেই। তাই বলে এমন হঠাৎ সুযোগ! আমি প্রমাদ গুণলাম। একরাশ দুর্ভাবনার বাগড়ায় উচ্ছ্বাসটা অবশ্য গোপন রাখতে হ'ল। কারণ নিয়ম অনুযায়ী অনুমতি ছাড়া বিদেশীদের জন্য কাশ্মীরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। ইসলামাবাদে পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে অনুমতি নিতে হয়। আমি তো নেইনি। অনুমতিপত্র ছাড়াই রওনা দেব? ঢুকতে দেবে? এদিকে অন্তর বলছে, সুযোগ হাতছাড়া করো না। সুতরাং মনস্থির করেই ফেললাম। রাহীলের পরীক্ষা থাকায় ওকে ইসলামাবাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে আমরা লোয়ার টপ্পা মোড়ে এসে মুযাফফরাবাদগামী ওয়াগনের অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মাগরিবের পর গাড়ি এল। প্রায় আড়াই ঘন্টার পথ মারী থেকে। যাত্রা শুরুর পর পাহাড়ের উপরে গাড়ি যত উঠতে থাকে, রাস্তা ততই আঁকাবাঁকা হয়ে নাড়ি-ভুঁড়ি উল্টানোর যোগাড় করতে থাকে। আব্দুর রহমান ভাই সামলাতে পারলেন না। বমনের দমকে দমকে কাহিল হয়ে পড়লেন। পেটে থাকা সর্বশেষ বিন্দুটিও বোধ হয় উঠে গেল। ভয়াবহ এক দুঃস্বপ্নের মত সময়টা কাটল তাঁর। রাত ৮টার দিকে ঝিলাম নদীর উপরে ছোট্ট ব্রীজটা ক্রস করে কোহালা চেকপোস্টে এসে গাড়ি থামল। এখান থেকে মুযাফফরাবাদে ঢুকতে হয়। সবার ন্যাশনাল আইডি কার্ড এক এক করে চেক করতে লাগল প্রহরী। আমার বুক ঢিব ঢিব করছে। আমার কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইডি কার্ড। তাতে স্পষ্ট করে লেখা–বাংলাদেশী। সর্বশেষ ব্যক্তি হিসাবে কম্পিত হস্তে কার্ডটি এগিয়ে দিলাম। পরিচয়পত্রের দিকে নজর বুলিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখার পর কি ভাবল কে জানে! কিন্তু তার মুখে অর্থপূর্ণ বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। দু'কদম এগিয়ে এসে টর্চলাইটের আলো ফেলল সরাসরি আমার দিকে। হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে তাকাই। চেহারার বিবর্ণতা কি দেখে ফেলল বেটা! রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম পরবর্তী বাক্য শোনার জন্য–'বাহার নেকলে, আপ নেহি জা সাকতে'। একইসাথে পরবর্তী করণীয় ভাবছি ঝড়ো গতিতে। নাহ, ধারণা ভুল হল। বিস্ময়করভাবে বিনা বাক্য ব্যয়ে কার্ড ফেরৎ পেলাম। ইশারা পেয়ে গাড়ীও চলতে শুরু করল। আমি মনে মনে পড়লাম *আলহামদুলিল্লাহ*। তবে সংশয় কাটল না। সামনে কি আরও চেকপোস্ট আছে? সেখানে আটকাবে না তো!

অবশেষে আর কোন বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই মুযাফফরাবাদ শহরে পৌঁছে গেলাম *ফালিল্লাহিল হাম্দ*। রাতের আঁধারে চারিদিকে পাহাড় ঘেরা শহরটাকে তারা ঝিলমিল আকাশের মত দেখায়। সেদিকে তাকিয়ে প্রসন্নচিত্তে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। কাশ্মীরভূমে নিরাপদে পৌঁছবার স্বস্তি। স্ট্যান্ডে এসে গাড়ী থেকে নামার পর উমায়ের ভাইয়ের ফোন এল। একটু পর উনি উনার ভগ্নিপতি হেলাল ভাই সহ গাড়ি নিয়ে উপস্থিত হলেন। অতিশয় ভদ্রলোক উমায়ের ভাই। সেই সাথে অতি সুদর্শন এবং সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী। পরিবহন ব্যবসায় যুক্ত আছেন। তাঁর অতিরিক্ত তা'যীমে আমি চরম বিব্রতবোধ করি। শহরের অন্য প্রান্তে উনার বাসায় এসে পৌঁছতে রাত ১০টা বাজল। খেতে বসে কাশ্মীরী পদের রান্নায় অনেকদিন পর ঘরোয়া খাবারের স্বাদ পেলাম। তবে খাওয়া শেষে ঐতিহ্যবাহী চিনিবিহীন 'নামকিন' চায়ে এক চুমুক দিতেই সব স্বাদ ভুলে যেতে হ'ল মুহূর্তেই। কাশ্মিরীরা এই লবণাক্ত চায়ে কী এমন মজা পায়, তা আমার বোধে আসে না। আগেও ২/৩ বার অভিজ্ঞতা হয়েছে এই চা পানের। প্রতিবারই ওয়াদা

Contents

করেছি–আর নয় এই শেষ। কিন্তু সামনে এলে মনে করি এবার বোধহয় স্বাদটা অন্য রকম হবে, দেখিই না এক চুমুক দিয়ে। অতঃপর বিরক্তির সাথে ফের ওয়াদাবদ্ধ হই, ইহ জনমে আর না, ভদ্রতা করেও না। আমার এক সঊদী বন্ধু মুহসিন আমার রুমে আসলে প্রায়ই সঙ্গে নিয়ে আসে সঊদী ট্রাডিশনাল সবুজ কাহওয়া। সুবহানাল্লাহ! ছোট্ট ছোট্ট কাপে সেকি তিক্ততা। বিস্ময় নিয়ে তার তিক্ত চায়ে চুমুক দেয়া তৃপ্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকি আর ভাবি মহান আল্লাহর সৃষ্টির কী অনুপম বৈচিত্র্য! একজনের কাছে যা পিত্তসম তিক্ত, অপরজনের কাছে তা মধুসম অমৃত!

রাতে শোয়ার সময় উমায়ের ভাই জানালেন আমরা আগামীকাল 'লাইন অফ কন্ট্রোল' অর্থাৎ ভারত-পাকিস্তান সীমান্তরেখা দেখতে যাচ্ছি, যেখান থেকে পাকিস্তানী কাশ্মীর এবং ইণ্ডিয়ান কাশ্মীর বিভক্ত হয়েছে। মনটা আনন্দে চঞ্চল উঠে, একইসঙ্গে তটস্থও হয়। লাইন অফ কন্ট্রোলের কাছে বিদেশীদের যাওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, এমনকি যারা অনুমতি নিয়ে আসে কাশ্মীরে, তাদের জন্যও। উনারা হয়ত সেভাবে জানেন না। আমিও ব্যাপারটি চেপে গিয়ে চুপটি করে রইলাম। দেখিই না কি হয় সামনে। মনে মনে আওড়াই–পথে যখন নেমেই পড়েছ পথিক, পথের শেষ না দেখে ক্ষান্তি দিয়ো না।

পরদিন সকালে ৯টার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে বের হলাম। হেলাল ভাই তাঁর কারটি নিয়ে সকাল সকালই হাযির হয়েছিলেন। উমায়ের ভাইয়ের ফুটফুটে আদুরে কন্যা ইংলিশ মিডিয়ামের ক্লাস ওয়ান পড়ুয়া হাফছাও আমাদের সহযাত্রী হ'ল। মুযাফফরাবাদ থেকে উত্তর-পূর্বদিকে অপরূপ সৌন্দর্যের আধার বিখ্যাত নীলাম ভ্যালি। আমাদের গন্তব্য এই নীলাম ভ্যালির বুকের উপর দিয়েই। শহর থেকে বের হওয়ার পথে সবুজের চিহ্ন বিহীন ছাইকালো খাড়া পাহাড়ের মধ্য দিয়ে শুরু হ'ল আমাদের যাত্রা। কাশ্মীর মানেই আমার কল্পনায় পাইন, ফারের ঢেউ খেলানো সবুজ গালিচা, মুক্ত নীল আকাশের নীচে ঝলমলে বরফাবৃত পর্বতচূড়া; গিরিখাদের গহ্বরে স্বচ্ছ কাঁচপনা লেক আর হর্ষোৎফুল্ল জুনিপার, টিউলিপের রঙ ছড়ানো উপত্যকা। কিন্তু এমন কল্পনায় হোচট খেতে হয় শুরুতেই। কারণ সময়টা এখন ঘোর শীতকাল। গাছ-পালা পত্র-পল্লব বিহীন। যমীনের উপর ঘাসের চিহ্ন নেই প্রায়। পাহাড় গাত্র গাঢ় খয়েরী বা ছাইয়ের মত কালো বর্ণ। কুয়াশার প্রকোপে তা বড্ড স্যাঁতসেতে দেখায়। খানিকটা আশাহতই বোধ করি।

(ক্রমশঃ)

Contents

হাদীছের গল্প

আল্লাহ্র রহমত ব্যতীত কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না

আল্লাহ ক্ষমাশীল। তিনি ক্ষমা করাকে পসন্দ করেন। তিনি বান্দাদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(যুমার ৩৯/৫৩)*। বনী ইসরাঈলের জনৈক ব্যক্তি একশ' ব্যক্তিকে হত্যা করে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন *(বুখারী হা/৩৪৭০; মুসলিম হা/২৭৬৬; মিশকাত হা/২৩২৭)*। নিম্নে আল্লাহ্র ক্ষমার একটি ঘটনা বর্ণনা করা হ'ল।-

যমযম বিন জাওস আল-ইয়ামামী হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আবু হুরায়রা (রাঃ) আমাকে বললেন, হে ইয়ামামী! তুমি অবশ্যই কোন লোককে বলবে না যে, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না বা আল্লাহ তোমাকে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আমি বললাম, হে আবু হুরায়রা! যখন আমাদের কেউ রাগান্বিত হয়, তখন সে তার ভাই বা সাথীকে এরূপ কথা বলে থাকে। আবু হুরায়রা (রাঃ) তাকে বললেন, তুমি এমন কথা বলবে না। কারণ আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, বনী ইসরাঈলে দু'জন লোক ছিল। তাদের একজন অত্যন্ত ইবাদতগুযার ছিল। অন্যজন ছিল নিজের প্রতি যুলুম করে পাপে লিপ্ত। কিন্তু তাদের একে অপরের মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছিল। ইবাদতগুযার ব্যক্তি তার অপর সাথীকে সর্বদা অপকর্মে লিপ্ত থাকতে দেখে বলত, তুমি পাপ কাজ থেকে বিরত থাকো। উত্তরে সে বলত, আমাকে আমার প্রভুর উপর ছেড়ে দাও। তোমাকে কি আমার উপর পাহারাদার হিসাবে পাঠানো হয়েছে?

ইবাদতগুযার ব্যক্তি একদিন তাকে এমন গোনাহে লিপ্ত হতে দেখল যা তার কাছে বড় গোনাহ মনে হল। তখন সে তাকে বলল, তোমার জন্য আফসোস! তুমি পাপ কাজ থেকে বিরত থাকো। উত্তরে সে বলল, আমাকে আমার প্রভুর উপর ছেড়ে দাও। তোমাকে কি আমার উপর পাহারাদার হিসাবে পাঠানো হয়েছে? তখন সে বলল, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ তোমাকে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের উভয়ের নিকটে ফেরেশতা পাঠিয়ে তাদের জান কবয করার ব্যবস্থা করলেন। এরপর তাঁর নিকট তাদের একত্রিত করে ইবাদতগুযার ব্যক্তিকে বললেন, তুমি কি আমার রহমত সম্পর্কে জানতে? কিংবা তুমি কি জানতে আমার হাতে কি পরিমাণ ক্ষমতা রয়েছে? এরপর ফেরেশতাদের সম্বোধন করে বললেন, একে তোমরা জাহান্নামে নিয়ে যাও। আর পাপীকে বললেন, তুমি যাও এবং আমার রহমতের বরকতে জান্নাতে প্রবেশ কর। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, যার হাতে আমার প্রাণ তার কসম, সে এমন কিছু উক্তি করেছে, যার মাধ্যমে সে তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয় বরবাদ করেছে' *(আহমাদ হা/৮২৭৫; আবুদাউদ হা/৪৯৭৫; ছহীহুল জামে' হা/৪৪৫৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আমার ক্রোধের উপর আমার রহমত বিজয়ী হয়েছে' *(বুখারী হা/৭৫৫৩; মুসলিম হা/২৭৫১)*।

শিক্ষা : আল্লাহ্র ক্ষমার ব্যাপারে কাউকে হতাশাব্যঞ্জক কথা বলা যাবে না। কারণ আল্লাহ তাঁর রহমতের বারিধারায় কাকে সিক্ত করবেন এবং কার আমল তাঁর নিকট গৃহীত হবে তা তিনিই ভাল জানেন। আল্লাহ্র রহমত ব্যতীত কেবল স্বীয় আমল দ্বারা কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। এজন্য সর্বাস্থায় আল্লাহ্র রহমতের আশা নিয়ে সৎকর্ম করে যেতে হবে। কখনো নিরাশ হওয়া যাবে না *(বুখারী হা/৫৬৭৩; মুসলিম হা/২৮১৬; মিশকাত হা/২৩৭১)*।

উম্মে হাবীবা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

Contents

চিকিৎসা

আঙ্গুরের উপকারিতা

আঙ্গুর স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী ফল। যা খেলে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে ব্যাপকভাবে। এতে আছে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য দরকারি খনিজ ও ভিটামিন। সুস্বাদু এ ফলের আছে নানা খাদ্য ও ভেষজ গুণ। আঙ্গুরে রয়েছে ভিটামিন কে, সি, বি$_১$, বি$_৬$ এবং খনিজ উপাদান ম্যাংগানিজ ও পটাশিয়াম। আঙ্গুর কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়াবেটিস, অ্যাজমা ও হৃদরোগের মতো রোগ প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

আঙ্গুরের বীজ ও খোসায় অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা হৃৎপিণ্ড এবং রক্তনালিগুলোকে বুড়িয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। আঙ্গুরের সেলুলাস ও চিনি কোষ্ঠকাঠিন্য রোধে সহায়ক। রক্ত সঞ্চালনের ভারসাম্যহীনতা দূর করতে আঙ্গুরের জুস খুবই উপকারী। আঙ্গুরের ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস নিয়মিত রক্ত সঞ্চালনের সহায়ক ও ইনসুলিন বৃদ্ধি করে। আঙ্গুরের জুসে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্টিইনফ্লামিটিরির মতো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে, যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রদাহ দূর করে। এই প্রদাহ ক্যানসার রোগ সৃষ্টির প্রধান কারণ হ'তে পারে। এছাড়া উচ্চ রক্তচাপ, ডায়রিয়া, ত্বক ও মাইগ্রেনের সমস্যা দূর করতেও আঙ্গুর সহায়তা করে।

কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় : আঙ্গুরে টরোস্টেলবেন নামে এক ধরনের যৌগ থাকে, যা কোলস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে।

হাড় শক্ত করে : আঙ্গুরে প্রচুর পরিমাণে তামা, লোহা ও ম্যাংগানিজের মতো খনিজ পদার্থ থাকে, যা হাড়ের গঠন ও হাড় শক্ত করতে কাজ করে।

অ্যাজমা প্রতিরোধ করে : আঙ্গুরের ঔষধি গুণের কারণে এটি অ্যাজমার ঝুঁকি থেকে রক্ষা করে এবং ফুসফুসে আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়ায়।

বদহজম দূর করে : নিয়মিত আঙ্গুর খেলে বদহজম দূর হয়। অগ্নিমন্দ্যা দূর করতেও আঙ্গুর কার্যকর।

মাথাব্যথা : হঠাৎ করে মাথাব্যথা শুরু হয়ে গেলে আঙ্গুর খেলে আরাম বোধ হয়।

চোখের স্বাস্থ্য : চোখ ভালো রাখতে আঙ্গুর কার্যকর। বয়সজনিত কারণে যারা চোখের সমস্যায় ভুগছেন, তাদের জন্য ভালো দাওয়াই এই ফল।

ক্যানসার : ক্যানসারের ঝুঁকিতে আছেন এমন রোগীরা খেতে পারেন আঙ্গুর। গবেষণায় দেখা গেছে, আঙ্গুরের উপাদানগুলো ক্যানসার সৃষ্টিকারী কোষের বিরুদ্ধে কাজ করতে সক্ষম।

কিডনির জন্য : আঙ্গুরের উপাদানগুলো ক্ষতিকারক ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা সহনশীল অবস্থায় রাখে। সেই সঙ্গে কিডনির রোগ-ব্যাধির বিরুদ্ধেও কাজ করে।

ত্বকের সুরক্ষায় : আঙ্গুরে থাকা ফাইটো কেমিক্যাল ও ফাইটো নিউট্রিয়েন্ট ত্বকের সুরক্ষায় কাজ করে। এতে আছে প্রচুর ভিটামিন সি। এটি ত্বকের উজ্জ্বলতা ধরে রাখে।

বয়সের ছাপে বাধা : শরীরের ফ্রি রেডিকেলস ত্বকে বলিরেখা ফেলে দেয়। আঙ্গুরে থাকা ভিটামিন সি ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এই ফ্রি রেডিকেলের বিরুদ্ধে লড়ে, শরীরে বয়সের ছাপ পড়া প্রতিরোধ করে।

ডায়াবেটিস রোগীর জন্য করণীয়

সাধারণ করণীয় :

* তিন বেলার খাবার ভাগ করে ৫-৬ বারে খাবেন।
* মাটির নিচে হয় এমন সবজি কম খাবেন (কচু, আলু, মুলা, গাজর, শালগম, ওলকপি)। মিষ্টি কুমড়া কম খাবেন।
* মাটির উপরের সব সবজি খাওয়া যাবে।
* কামড়ে খাওয়া যায় এমন ফল খাওয়া যাবে (আপেল-নাসপাতি অর্ধেক, বরই ৫-৬টা, ছোট কলা ১টা, বড় অর্ধেক, আমড়া, পেয়ারা, কামরাঙ্গা, জলপাই, জামরুল, কাচা শসা ইচ্ছে মতো)।
* রসালো ফল (কমলা, আঙ্গুর, আনার, আনারস, লিচু, আম, কাঁঠাল, তরমুজ, পাকা বেল, পেঁপে, জাম্বুরা ইত্যাদি) কম খাবেন।
* চিনি/গুড় দিয়ে তৈরী মিষ্টি জাতীয় খাবার খাবেন না।
* চর্বি জাতীয় খাবার (গরু/খাসির গোশত, চিংড়ি মাছ, মগজ, কলিজা, নারকেল, ডিমের কুসুম) কম খাবেন।

হাঁটার নিয়মাবলী : * প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট হাঁটবেন। প্রথম ৫-১০ মিনিট স্বাভাবিক গতিতে, মধ্যের ৫-১০ মিনিট দ্রুতগতিতে এবং শেষের ৫-১০ মিনিট পুনরায় স্বাভাবিক গতিতে হাঁটবেন। * সপ্তাহে কমপক্ষে ৫ দিন হাঁটবেন। পরপর ২ দিন হাঁটা বন্ধ করা যাবে না।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা : * শরীর দুর্বল লাগলে, বমি হ'লে, হার্ট এ্যাটাক হ'লে, হঠাৎ শ্বাস কষ্ট হ'লে, গর্ভাবস্থায়, যে কোন সার্জারী করতে হ'লে, সে সময় রক্তের সুগার পরিমাপ করতে হবে।

* প্রতিমাসে অন্ততঃ ১ বার রক্তের সুগার পরীক্ষা করাবেন।
* ৬ মাস পর পর Serum Creatinine & Uric Acid পরীক্ষা করাবেন।
* ১ বৎসর পর পর HbAlc & Fasting Lipid Profile পরীক্ষা করবেন।
* নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা করবেন।
* প্রতি বৎসর একবার চোখ পরীক্ষা করবেন।
* ৪৫ বছরের ঊর্ধ্বের রোগী প্রতি বৎসর ECG করাবেন।
* সম্ভব হ'লে বাড়ীতে গ্লুকোমিটার দিয়ে সপ্তাহে ১দিন ৪ বার (খালি পেটে, নাশতা, দুপুরের খাবার ও রাতের খাবারের ২ ঘণ্টা পরে) রক্তের সুগার পরীক্ষা করে লিখে রাখবেন এবং পরবর্তী ভিজিটে রিপোর্ট নিয়ে চিকিৎসকের সাথে দেখা করবেন।

খাদ্য তালিকা ও সময় :

১. সকালের নাশতা (৮-৯ টা) : * হাতে বানানো রুটি ২/৩/৪ টা, * সবজি ইচ্ছে মতো, * ডিমের সাদা অংশ ১টা, * চিনি ছাড়া চা।

২. পূর্বাহ্ন (১০-১১ টা) : * ১টা রুটি+সবজি অথবা ১কাপ মুড়ি অথবা ১ কাপ চিড়া ভিজানো, * মিষ্টি ছাড়া বিস্কুট ৩/৪ টা, * সাথে যে কোন ১টি ফল।

৩. দুপুরের খাবার (২-৩ টা) : * ভাত ২/৩/৪ কাপ শরীরের ওযন অনুযায়ী, * সবজি ইচ্ছে মতো, * ডাল ১ কাপ, * মাছ/গোশত ২ টুকরা।

৪. বিকালের নাশতা (৫-৬ টা) : * মুড়ি ১ কাপ+দুধ ১ কাপ (স্বর ছাড়া) অথবা বিস্কুট চিনি ছাড়া ৩/৪ টা। * ফল ১টা।

৫. রাতের খাবার (৮.৩০-৯টা) : * হাতে বানানো রুটি ২/৩/৪ টা, * সবজি ইচ্ছে মতো, * ডাল ১ কাপ, * মাছ/গোশত ২ টুকরা।

** ডা. এস.এম.এ. মামূন*
কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল
রাজারবাগ, ঢাকা।

Contents

আঙ্গুর চাষ ও পরিচর্যা

আমাদের মাটি ও জলবায়ু আঙ্গুর চাষের জন্য উপযোগী, এটা সম্প্রতি প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দু'চারটি আঙ্গুর গাছ থাকলেও সেটা পরিবারের আওতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আঙ্গুর চাষের চেষ্টা চালানো হয় ১৯৯০ সালে গাযীপুরের কাশিমপুরস্থ বিএডিসি'র উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে।

আঙ্গুর গার্হস্থ্য পর্যায়ে, মাঠে এককভাবে এবং মিশ্র ফল বাগানের অন্যতম ফল গাছরূপে চাষ করা যায়। এর রোপণ দূরত্ব ১০ ফুটের মতো, সে কারণে এটি আম কিংবা কাঁঠালভিত্তিক মিশ্র ফল বাগানের তৃতীয় শস্যরূপে স্থান পেতে পারে।

জাত : আমাদের দেশে এ যাবত তিনটি উৎপাদনশীল আঙ্গুর গাছের জাত নির্বাচন করা হয়েছে। (১) জাককাউ (২) ব্ল্যাক রুবী ও (৩) ব্ল্যাক পার্ল। তিনটি জাতই গ্রীষ্মকালীন এবং পরে তিনটি রংয়ে রূপান্তরিত হয়ে যথাক্রমে হালকা বাদামি, কালো ও করমচা রং ধারণ করে। ফলন আসতে সময় লাগে প্রায় দু'বছর। মিষ্টতার পরিমাণ ১৮ থেকে ২০ শতাংশ। মাটির পিএইচ ৬.৫-৭.৫ হ'লে আঙ্গুর দ্রুত মিষ্টি হয়। গাছের দীর্ঘায়ু বিবেচনা করে মাচায় লোহার তারের ব্যবস্থা করা ভালো। মাচায় ওঠা পর্যন্ত আঙ্গুর গাছের পার্শ্ব শাখা ভেঙে দিতে হবে।

জমি নির্বাচন : আঙ্গুর চাষের জন্য দো-আঁশযুক্ত লালমাটি, জৈবিক সার সমৃদ্ধ কাঁকর জাতীয় মাটি এবং পাহাড়ের পাললিক মাটিতে আঙ্গুর চাষ ভাল হয়। জমি অবশ্যই উঁচু হ'তে হবে যেখানে পানি দাঁড়িয়ে থাকবে না এবং প্রচুর সূর্যের আলো পড়বে এমন জায়গা আঙ্গুর চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

জমি তৈরি ও রোপণ পদ্ধতি : ভালভাবে চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুর করতে হবে। তারপর ৭০×৭০×৭০ সে. মি. মাপের গর্ত করে তাতে ৪০ কেজি গোবর, ৪০০ গ্রাম পটাশ, ৫০০ গ্রাম ফসফেট এবং ১০০ গ্রাম ইউরিয়া গর্তের মাটির সাথে মিশিয়ে ১০/১৫ দিন রেখে দিতে হবে। যেন সারগুলো ভালোভাবে মাটির সাথে মিশে যায়। তারপর সংগৃহীত চারা গোড়ার মাটির বলসহ গর্তে রোপণ করে একটি কাঠি গেড়ে সোজা হয়ে ওঠার সুযোগ করে দিতে হবে এবং হালকা পানি সেচ দিতে হবে। শাখা-কলমের বেলায় প্রায় এক ফুট দীর্ঘ শাখা-খণ্ডের এক-তৃতীয়াংশকে মাটির নিচে কাত করে পুঁতলে ভালো হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আঙ্গুর চারা লাগানোর উপযুক্ত সময় মার্চ-এপ্রিল মাস।

সার প্রয়োগ : আঙ্গুর যেহেতু লতানো গাছ তাই এর বৃদ্ধির জন্য সময়মতো বাড়তি সার প্রয়োগ করতে হবে। রোপণের ১ মাসের মধ্যে বাড়বাড়তি না হ'লে গোড়ার মাটি আলগা করে তাতে ৫ গ্রাম ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করা দরকার। ১-৩ বছরের প্রতিটি গাছে বছরে ১০ কেজি গোবর, ৪০০ গ্রাম পটাশ, ৫০০ গ্রাম ফসফেট এবং ১০০ গ্রাম ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। পটাশ সার ব্যবহারে আঙ্গুর মিষ্টি হয় এবং রোগ বালাইয়ের উপদ্রব কম হয়। বয়স্ক গাছের জন্য প্রতি বছর এপ্রিল মাসে দুই কেজি তেলের খৈল, এক কেজি হাড় চূর্ণ এবং এক পোয়া সালফেট অব পটাশ ব্যবহার করা যায়।

আঙ্গুরগাছের পরিচর্যা :

গাছের কাণ্ড ছাঁটাই : রোপণের পরবর্তী বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে মাচায় ছড়িয়ে থাকা আঙ্গুর গাছের কাণ্ড ছেঁটে দিতে হবে। কাণ্ড ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে আঙ্গুর গাছের ফলন বৃদ্ধি হয় এবং ফুল ঝরে পড়া কমে যায়। ছাঁটাইয়ের ৭ দিন আগে এবং পরে গোড়ায় হালকা সেচ দিতে হয়। গাছ রোপণের পর মাচায় ওঠা পর্যন্ত প্রধান কাণ্ড ছাড়া অন্য সকল পার্শ্বের শাখা ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

প্রথম ছাঁটাই : মাচায় কাণ্ড ওঠার ৩৫/৪৫ সে.মি. পর প্রধান কাণ্ডের শীর্ষদেশ কেটে দিতে হবে, যাতে ঐ কাণ্ডের দুই দিক থেকে দু'টি করে চারটি শাখা গজায়। **দ্বিতীয় ছাঁটাই :** গজানো চারটি শাখা বড় হয়ে ১৫-২০ দিনের মাথায় ৪৫/৬০ সে.মি. লম্বা হবে, তখন ৪টি শীর্ষদেশ কেটে দিতে হবে, যেখান থেকে আরও পূর্বের ন্যায় দু'টি করে ১৬টি প্রশাখা গজাবে। **তৃতীয় ছাঁটাই :** এই ১৬টি প্রশাখা ১৫/২০ দিনের মাথায় ৪৫/৬০ সে.মি. লম্বা হবে, তখন আবার এদের শীর্ষদেশ কেটে দিতে হবে যাতে প্রতিটি প্রশাখার দু'দিকে দু'টি করে ৪টি নতুন শাখা এবং এমনিভাবে ১৬টি শাখা থেকে সর্বমোট ৬৪টি শাখা গজাবে। অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই যে ৬৪টি শাখা গজাবে এমন কোন কথা নেই। এই শাখার গিরার মধ্যেই প্রথমে ফুল এবং পরে এই ফুল মটর দানার মত আকার ধারণ করে আঙ্গুর ফলে রূপান্তরিত হবে। প্রথম বছর ফল পাবার পর শাখাগুলোকে ১৫/২০ সে.মি. লম্বা রেখে ফেব্রুয়ারী মাসে ছেঁটে দিতে হবে। ফলে বসন্তের প্রাক্কালে নতুন নতুন শাখা গজাবে এবং ফুল ধরবে। এই পদ্ধতি ৩/৪ বছর পর্যন্ত চলবে এবং ফলের স্থিতি লাভ করবে।

আঙ্গুর গাছের বিভিন্ন পরিচর্যার মধ্যে একটি হ'ল ডাল ছাঁটাই। প্রতিবার ফুল ধরার পর ডাল বা শাখাটি পুরনো হয়ে যায় এবং ঐ ডাল বা শাখায় আর ফুল-ফল ধরে না। এসব পুরনো ডাল বা শাখা গাছে থাকলে নতুন শাখা-প্রশাখা গজায় না।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে প্রতি একরে ৪৩৬টি আঙ্গুর গাছে লাগানো যায় এবং জাতিতে ভিন্নতায় গড়ে প্রতি গাছে প্রতিবছর ৪ কেজি হিসাবে এক একরে মোট ১৭৪৪ কেজি আঙ্গুর উৎপাদন করা সম্ভব।

আঙ্গুর ফল পুষ্ট হওয়ার পর পাকা অবস্থায় গাছ থেকে পাড়তে হয়। আগে পেড়ে ফেললে পরে আর পাকে না। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে আঙ্গুর গাছ ছাঁটাই করলে মার্চ-এপ্রিলে ফল পাওয়া যায়। তবে দেরিতে ফল সংগ্রহ করলে আকাশ একটানা মেঘলা থাকা বা বৃষ্টির কারণে ফল টক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ গরমে আঙ্গুর ফলে চিনিজাতীয় পদার্থ বেড়ে যায়। ফল ঠিকমতো বড় ও মিষ্টি না হলে, ফল ধরার পর প্রতি লিটার পানিতে ৫০ মিলিলিটার ইথরেল ও ১০০ মিলিগ্রাম জিবারেলিক অ্যাসিড পাউডার (জিবগ্রো ৫জি বা বারান্টো-৮০%) একত্রে মিশিয়ে ১৫ দিন পরপর দুই থেকে তিনবার স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যেতে পারে।

বছরে দুবার ফুল আসে। মার্চ ও জুলাই মাসে তা আঙ্গুরে রূপান্তরিত হয়। ফুল আসার পর থেকে আঙ্গুর মিষ্টি হ'তে সময় লাগে ১২০ দিন বা চার মাস। নির্দিষ্ট সময়ের আগে আঙ্গুর কাটলে টক লাগবে। ফুল আসার ৭০-৮০ দিনের মধ্যে সবুজ অবস্থায় আঙ্গুর স্পঞ্জের ন্যায় নরম হবে। এটা আঙ্গুরের পরিপক্বতা বুঝায়। পরবর্তীকালে ৪০ দিন সময় নিবে আঙ্গুর মিষ্টির পর্যায়ে যেতে।

ফুল থাকা অবস্থায় কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ নিষেধ। আঙ্গুরের থোকায় হাত লাগানো উচিত নয়, এতে চামড়ার উপরের সাদা পাউডার হাতের ছোঁয়ায় উঠে যায় এবং পোকার আক্রমণ সহজতর হয়। থোকায় আঙ্গুর যখন মুগ ডালের আকারে থাকে তখন ছোট অবস্থায় কিছু আঙ্গুর বাছাই করে ফেলে দেয়া ভাল। যাতে আঙ্গুরের সাইজ সুন্দর থাকে। আঙ্গুর পাকার সময় বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকায় মাচার উপরে পলিথিন সীট দিয়ে আবৃত করে দিতে হবে যাতে গাছে বৃষ্টির পানি না লাগে। লাগলে পাকা আঙ্গুর ফেটে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট সময়ে তিনটি পরিচর্যা নিয়মিতভাবে করতে হবে।

(ক) প্রতি বছর জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে গাছের গোড়ায় মাটি হালকাভাবে কুপিয়ে আলগা করে তাতে অনুমোদিত সার প্রয়োগ করে শুধুমাত্র একবার বেশি করে পানি দিতে হবে।

(খ) জানুয়ারী মাসের ৪র্থ সপ্তাহে ঘুমন্ত গাছের শাখা-প্রশাখা ছাঁটাই করে দিতে হবে। ছাঁটাইকৃত ডালগুলো কেটে পরে মাটিতে পুতে পানি দিলে পুনরায় নতুন গাছ হবে।

(গ) ফেব্রুয়ারী মাসের ১ম সপ্তাহে সামান্য গরম আরম্ভ হবার সাথে সাথে গাছের গোড়ায় পানি সেচ দিতে হবে, যে পর্যন্ত না বৃষ্টি হয়। পানি দেবার ১০ দিনের মধ্যে গাছে নতুন শাখা-প্রশাখা গজাবে এবং তাতে ফুল দেখা দিবে। যা পরবর্তীতে আঙ্গুরে রূপান্তরিত হবে।

॥ সংকলিত ॥

Contents

কবিতা

আহলেহাদীছ কি?

মুহাম্মাদ নাজমুল হক
নারায়ণগঞ্জ।

আহলেহাদীছ হ'ল কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী
আহলেহাদীছ হ'ল নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডা উত্তোলনকারী।
আহলেহাদীছ হ'ল ত্বাগূতের বিরুদ্ধে আপোষহীন অহি-র আন্দোলন
আহলেহাদীছ হ'ল হক প্রতিষ্ঠায় বিপ্লবী এক বিস্ফোরণ।
আহলেহাদীছ হ'ল সবদিক ছেড়ে অহি-র পথে থাকা
আহলেহাদীছ হ'ল হকের পথে মানবতাকে ডাকা।
আহলেহাদীছ নয় মতবাদ, একটি পথের নাম
আহলেহাদীছ হ'ল হক প্রতিষ্ঠার নিরন্তর সংগ্রাম।
আহলেহাদীছ হ'ল নিরপেক্ষভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মানা
আহলেহাদীছ হ'ল কুরআন-হাদীছকে শরী'আতের উৎস জানা।
আহলেহাদীছ হ'ল সার্বিক জীবনে তাক্বওয়া অবলম্বন করা
আহলেহাদীছ হ'ল সৃষ্টিকে স্রষ্টার বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করা।
আহলেহাদীছ হ'ল চরমপন্থা ছেড়ে মধ্যপন্থা ধরা
আহলেহাদীছ হ'ল মতভেদ ভুলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।
আহলেহাদীছ হ'ল নির্যাতন সয়েও হকের পথে চলা
আহলেহাদীছ হ'ল সদা-সর্বদা হক কথা বলা।
আহলেহাদীছ নির্ভেজাল এক ইসলামী আন্দোলনের নাম
আহলেহাদীছ হ'ল অহীভিত্তিক সমাজ গঠনের বৈপ্লবিক সংগ্রাম।

তাবলীগী ইজতেমা

মুহাম্মাদ আবুল ফযল খন্দকার
নলডাঙ্গা, নাটোর।

মুসলিম নওজোয়ানরা আজ
আসছে দল বেঁধে ছুটে।
বেদ্বীন কাফিরদের জোট ভাঙ্গতে
আসছে তারা জুটে।
দূর-দূরান্ত থেকে আসছে সবাই
জান্নাতী এই আঞ্জামে
সুর-মিতালী চারিদিকে
সিক্ত আজ মনে-প্রাণে।
তাকবীরের ঐ উঠছে আওয়ায
গগন বিদারী।
ত্বাগূতী রাজ ধ্বংস হচ্ছে
হচ্ছে সত্য বিজয়ী।
শিরক-বিদ'আত মানবতার
এক মহামরণ যন্ত্রণা।
করো না আপোষ বাতিলের সাথে
হবে না কখনো হীনমনা।
তুমি বিদ'আতের বিরুদ্ধে অগ্নিবারুদ
কালবৈশাখী ঝড়।
তোমার দাপটে মিথ্যাবাদীদের
কাঁপে হৃদয় ও অন্তর।
মিথ্যা দলনে তুমি হবে নাকো বিলীন
মুক্তির হাসি সত্যর শশী
জ্বলবে চিরদিন।
তুমি ৯১-এর দাওয়াতী প্রেরণা
হক প্রচারের চেতনা
এ দাওয়াত কবুল করে কামিয়াব হয়েছে
বহু সংস্কারমনা।
সব যালিমের প্রাণ করে খান খান
হবে সতত তোমার জয়
আল্লাহ তোমার সঙ্গে আছেন
করবে না কভু ভয়।
দাওয়াতের ময়দানে নেই
তোমার কোন তুলনা
হক প্রচারে তুমি অমর হও
হে তাবলীগী ইজতেমা!

হায়রে বৈশাখ

মুহাম্মাদ মোমতায আলী খান
ঝিনা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

বৈশাখে হয় সবে আজব বাঙ্গালী
মেখে রং সেজে সঙ বিচিত্র বর্ণালী।
কেউ হয় বাঘ-সিংহ
কেউবা বিড়াল-কুকুর
জাতির বিবেক কাটছে ধীরে
অতি চালাক ইঁদুর।
আমরা মুসলিম না বাঙ্গালী
কাটেনি আজো দ্বন্দ্ব,
জ্ঞান-পাপীদের কূট-তর্ক জালে
বাড়ছে স্রেফ সন্দ।
সারাবছর খোঁজ থাকে না
বৈশাখে হয় বাঙ্গালী,
পান্তা-ইলিশ খাবার জোশে
করে বৃথা পকেট খালি।
সংস্কৃতির 'স' জানে না
লোক সে বড় সংস্কৃতিবান (?)
ইসলামী তাহযীব মানে না
তবুও পরিচয় তার মুসলমান (?)

প্রার্থনা

ইউসুফ আল-আযাদ
বাশাইল, টাংগাইল।

তোমার কাছে দু'হাত তুলে করি মুনাজাত
শান্তি-সুখে কাটে যেন সবারই দিন-রাত।
কেউ যেন রয়না দুঃখে এই ধরণীর বুকে
সবার হৃদয় ভরে দিও তোমার দেয়া সুখে।
থাকতে যেন পারি সবাই সবার সাথে মিলে
তোমার প্রেমের আলো দিও আমার মরা দিলে।
তোমার প্রেমের সুধা দিয়ে সিক্ত কর দিল
প্রেমের ছোঁয়ায় খুলে দিও বন্ধ মনের খিল।
আমার মুখের কথা যেন হয় না কভু তিক্ত
মুখের কথা করে দিও মধু দিয়ে সিক্ত।
মধুর মতো মিষ্টি কর মুখের যত ভাষা,
পূরণ করে দিও প্রভু মনের যত আশা।
আমার মনের মাঝে দিও ফুলের বাগ
হৃদয় হ'তে মুছে দিও সকল কালো দাগ।
মন বাগিচার শাখে শাখে দিও হাযার ফুল
সাহস দিও মনের মাঝে শোধরাতে সব ভুল।
তোমার পথে থাকতে দিও ডাকতে দিও আর
খুলে দিও বন্ধ মনের দ্বার।

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. যাঁরা ঈমানের সাথে নবী করীম (ছাঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ঈমানের উপর অটল থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন।
২. আবু বকর (রাঃ), ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ), ওছমান বিন আফ্ফান (রাঃ), আলী বিন আবী ত্বালেব (রাঃ), আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ), সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ), সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ), আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ), ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহ (রাঃ), যুবায়ের বিন আওয়াম (রাঃ)।
৩. আবু বকর (রাঃ), ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ), ওছমান বিন আফ্ফান (রাঃ), আলী বিন আবী তালেব (রাঃ)।
৪. আলী বিন আবী তালেব (রাঃ)-এর। ৫. ওছমান বিন আফ্ফান (রাঃ)-কে।
৬. ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)। ৭. জা'ফর বিন আবী তালেব (রাঃ)।
৮. হানযালা (রাঃ)-কে। ৯. হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)।
১০. সা'দ বিন মু'আয (রাঃ)

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১. পঞ্চগড়। ২. কক্সবাজার। ৩. বান্দরবান।
৪. চাঁপাই নবাবগঞ্জ। ৫. তেঁতুলিয়া। ৬. টেকনাফ।
৭. থানচি। ৮. শিবগঞ্জ। ৯. বাংলাবান্দা।
১০. ছেড়াদ্বীপ।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১. কোন ছাহাবীকে জান্নাতের আটটি দরজা থেকেই আহ্বান করা হবে?
২. কোন ছাহাবীকে সাইয়েদুশ্ শুহাদা বলা হয়?
৩. কোন ছাহাবীকে রাসূল (ছাঃ) ইসলামের প্রথম দাঈ (শিক্ষক) হিসাবে মদীনায় প্রেরণ করেন?
৪. কোন ছাহাবী নবী করীম (ছাঃ)-এর চাচা ও দুধ ভাই ছিলেন?
৫. রাসূল (ছাঃ) মি'রাজে গিয়ে কোন ছাহাবীর পায়ের আওয়ায শুনতে পান?
৬. কোন ছাহাবী ইসলামের প্রথম মুওয়ায্যিন ছিলেন?
৭. নবী করীম (ছাঃ)-এর কতজন মুওয়ায্যিন ছিলেন?
৮. রাসূল (ছাঃ) কোন ছাহাবীর নিকট থেকে কুরআন তেলাওয়াত শুনেছেন?
৯. কোন ছাহাবী সূরা বাক্বারা তেলাওয়াতকালে আসমান থেকে ফেরেশতা নাযিল হয়েছিল?
১০. কোন ছাহাবীকে তরজুমানুল কুরআন ও রইসুল মুফাস্সিরীন বলা হ'ত?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১. বাংলাদেশে কয়টি সমুদ্র বন্দর রয়েছে?
২. বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর কোনটি?
৩. চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
৪. কোন সালে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে?
৫. চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
৬. চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরকে বলা কি হয়?
৭. বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর কোনটি?
৮. মংলা সমুদ্র বন্দর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
৯. মংলা সমুদ্র বন্দর কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
১০. মংলা সমুদ্র বন্দরে বড় জাহাজের মাল কোথায় খালাস করা হয়?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

ডাংগীপাড়া, পবা, রাজশাহী ১৪ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় ডাংগীপাড়া মিছবাহুল উলূম এবতেদায়ী মাদরাসায় শাখা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখার প্রধান উপদেষ্টা ও মাদরাসার প্রধান শিক্ষক আব্দুল্লাহিল কাফী-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন ও রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক আকমাল হুসাইন। অনুষ্ঠানে সাত সদস্য বিশিষ্ট সোনামণি পরিচালনা পরিষদ ও বালক-বালিকাদের পৃথক পৃথক শাখা গঠন করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক ইবরাহীম খলীল।

চকপাঁচপাড়া, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ ২২ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার ত্রিশাল থানাধীন চকপাঁচপাড়া আল-জামি'আতুস সালাফিইয়াহ মাদরাসা সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের খত্বীব মাওলানা আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হুসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, অত্র যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আব্দুল কাদির ও যেলা 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ আলী প্রমুখ।

ভুগরইল, পবা, রাজশাহী ২রা ফেব্রুয়ারী, বুধবার : অদ্য বাদ আছর ভুগরইল পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আবু হানীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১১ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর সোনামণি আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (কমপ্লেক্স)-এর 'সূর্যমুখী' শাখার উদ্যোগে দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে সাধারণ ও ইসলামী জ্ঞান প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি মারকায এলাকার পরিচালক ফরহাদ হুসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম, যয়নুল আবেদীন ও হাফেয হাবীবুর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল হাসীব। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করে মারকায এলাকার সহ-পরিচালক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। উক্ত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী নূরুল ইসলাম, দ্বিতীয় স্থান অধিকারী মুহাম্মাদ হাসান ও তৃতীয় স্থান অধিকারী ইবরাহীমকে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া সকল প্রতিযোগীকে সান্ত নামূলক পুরস্কার প্রদান করা হয়।

Contents

স্বদেশ

‘বৃক্ষ মানব’ খুলনার আবুল বাজনদার

খুলনার পাইকগাছা উপযেলা সদরে দেশে প্রথমবারের মত বৃক্ষ মানব নামক বিরল রোগে আক্রান্ত রোগীর খোঁজ পাওয়া গেছে। আবুল বাজনদার নামে ২৬ বছর বয়স্ক এই যুবকের আক্রান্ত দুই হাতের তালু ও ১০ আঙুলে গাছের শেকড়ের মতো দেখতে শক্ত অঙ্গ গজিয়েছে। প্রায় ১০ বছর ধরে এই রোগে আক্রান্ত এই ভ্যানচালক। চিকিৎসার জন্য তিনি ভারতে এবং দেশে বিভিন্ন চিকিৎসকের দ্বারস্থ হয়েছেন। কিন্তু কোন উন্নতি হয়নি বরং ক্রমেই অবনতি হচ্ছে।

এখন তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসারত। হাসপাতালের পরিচালক ড. সামন্ত লাল সেন জানান, গোটা বিশ্বে এখন পর্যন্ত আবুলসহ তিনজন মানুষের এই রোগ হয়েছে, যা ‘বৃক্ষ মানব’ রোগ হিসাবে পরিচিত। এর আগে ২০০৮ সালে ইন্দোনেশিয়ায় এক বৃক্ষ মানবের শরীরে কয়েকবার অপারেশনের মাধ্যমে তাকে সারিয়ে তোলা হয়েছে। ডেবে কোসওয়ারা নামের ঐ ব্যক্তির শরীরেও গাছের মতো অংশ গজায়। চিকিৎসকরা জানান, এইচপিভি নামক এক প্রকার ভাইরাসের কারণে এই রোগ হয়। অপারেশনের মাধ্যমে এর চিকিৎসা সম্ভব। তবে তা ব্যয় বহুল।

জুম‘আর খুৎবা নিয়ন্ত্রণ করবে সরকার!

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক সামীম মো. আফজাল সম্প্রতি বিভিন্ন গণমাধ্যমে বলেছেন, বাংলা বক্তব্যকালে অনেক সময় রাজনৈতিক প্রসঙ্গ টানা হয়। খতীবরা বাংলায় যে ওয়ায করেন, সেখানে যেন তারা আরবী খুৎবার সারমর্মটি বলেন। মসজিদ আল্লাহর ঘর। সেখানে কুরআন-হাদীছ পরিপন্থী অথবা কোন রাজনৈতিক দলের কথাবার্তা যেন তারা না বলেন, এ ব্যাপারে খতীবদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে বলে জানান ইফা মহাপরিচালক।

তিনি আরও জানান, খুৎবা আরবীতেই দিতে হবে। এটা মেনডেটরি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নিয়ম জেনে লাভ নেই, এই উপমহাদেশে ইসলামের শুরু থেকে আরবীতেই খুৎবা দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। তবে সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে খুৎবার আগে এর সারমর্ম বাংলায় বলতে পারেন। সামাজিক সমস্যাবলীও থাকতে পারে। তবে অবশ্যই রাজনৈতিক কোনও কিছু থাকবে না।

এদিকে দেশের সব মসজিদের খতীব এবং জুম‘আর খুৎবা সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখার জন্য যেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। গত বছরের নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এ নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে বলে জানান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। তারা বলেন, মসজিদগুলোকে যেন রাজনৈতিক প্রচারণার কাজে ব্যবহার করা না হয়, সে জন্যই ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সরকার এ উদ্যোগ নিয়েছে।

[এটি সরকারের মারাত্মক ভুল পদক্ষেপ হবে। আমরা এ থেকে ফিরে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। ডিজি ছাহেব খুৎবার মর্মই বুঝেন না। তাঁকে জেনে-বুঝে কথা বলার আবেদন জানাচ্ছি’ (স.স.)]

বিদেশ

দাড়ি রাখা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো

দাড়ি রাখা কি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো? নাকি এটা নানারকম রোগ-জীবাণুর আস্তানা? এ নিয়ে নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে বিজ্ঞানী ও গবেষকদের মধ্যে। একদল বিজ্ঞানী বলছেন, ক্লিন শেভড পুরুষের চেয়ে দাড়িওয়ালাদের মুখে রোগ-জীবাণু বেশী, এমন কোন প্রমাণ তারা পাননি। যারা দাড়ি রাখেন, তারা এর মধ্যে নানা রোগ-জীবাণু বহন করে চলেছেন এমন ভয় অনেকের মধ্যেই কাজ করে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি হাসপাতালে সম্প্রতি এ নিয়ে গবেষণা চালানো হয়। তাদের গবেষণার ফল অনেককেই অবাক করেছে। ‘জার্নাল অব হসপিটাল ইনফেকশনে’ প্রকাশিত এই গবেষণার ফলে বলা হচ্ছে, দাড়িওয়ালাদের চেয়ে বরং দাড়ি কামানো পুরুষের মুখেই বেশী রোগ-জীবাণু পাওয়া গেছে। গবেষকরা বলছেন, মেথিসিলিন-রেসিস্ট্যান্ট স্টাফ অরিয়াস বলে, যে জীবাণু অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী, সেটি দাড়িওয়ালাদের চাইতে দাড়ি কামানোদের মুখে তিনগুণ বেশী মাত্রায় পাওয়া গেছে। এর কারণ কি? গবেষকরা বলছেন, দাড়ি কামাতে গিয়ে মুখের চামড়ায় যে হালকা ক্ষত হয়, তা ব্যাকটেরিয়ার বাসা বাঁধার জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরী করে। অন্যদিকে দাড়ি সংক্রমণ ঠেকাতে সাহায্য করে। দাড়িতে এমন কিছু ‘মাইক্রোব’ আছে, যা ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে সাহায্য করে।

[ইসলামের প্রতিটি বিধানই মানুষের জন্য কল্যাণকর। অতএব বেশী মাথা না ঘামিয়ে মেনে চলার মধ্যেই মঙ্গল নিহিত (স.স.)]

যোগব্যায়াম বাধ্যতামূলক হ’লে ছালাতও শেখাতে হবে

-মাওলানা সাজ্জাদ নোমানী

‘অল ইণ্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল’ বোর্ডের সদস্য মাওলানা সাজ্জাদ নোমানী বিজেপি পরিচালিত ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে নাগরিকদের ওপর হিন্দুত্ব চাপিয়ে দেয়ার অভিযোগ তুলেছেন। মাওলানা নোমানী এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ভারতীয় নাগরিকদের উপর সূর্য নমস্কার, যোগব্যায়াম, বন্দে মাতরম সঙ্গীত গাওয়া ইত্যাদি বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে মূলতঃ হিন্দু সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে।

তিনি বলেন, ‘আগামী ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারী ‘মুসলিম পার্সোনাল ল’ বোর্ডের পক্ষ থেকে গ্রেটার বোম্বাইয়ের নিকটবর্তী মুম্ব্রা শহরে ‘বিশ্বাস বাঁচাও, সংবিধান বাঁচাও’ নামে দু’দিন ব্যাপী সম্মেলন করা হবে। এ বিষয়ে দেশজুড়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। যদি বিজেপি সরকার ছাত্র এবং সরকারী কর্মীদের হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত যোগব্যায়াম এবং সূর্য নমস্কার করতে বাধ্য করে, তাহ’লে সরকারকে তাদের ‘ছালাত’ পড়ানোও শেখাতে হবে।

একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতি এবং ধর্মের উপরে হিন্দুত্ব চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন মাওলানা নোমানী।

নতুন আতঙ্ক জিকা ভাইরাস : বিশ্বজুড়ে যরূরী অবস্থা

বিশ্বব্যাপী বিশেষতঃ ল্যাটিন আমেরিকা জুড়ে বর্তমানে যে ভয়াবহ ভাইরাসের তাণ্ডব দেখা যাচ্ছে তার নাম হ’ল জিকা। এটা একেবারেই অচেনা রোগ। উপসর্গও খুব অস্পষ্ট। ফলে এ রোগে আক্রান্ত হ’লে নির্ণয় করাও সহজ নয়। নিঃশব্দে মস্তিষ্ক শেষ করে দেয় জিকা ভাইরাস, যা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা অসম্ভব।

Contents

এডিস মশা থেকে সাধারণত জিকা ভাইরাস মানুষের দেহে ছড়িয়ে থাকে। এছাড়া যৌন সংসর্গের মাধ্যমে জিকা ভাইরাস ছড়ায় বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এটি মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে প্রাথমিক অবস্থায় জ্বর, হাত-পায়ের জয়েন্টে ব্যথাসহ নানা ছোটখাটো কিছু শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয়। কিন্তু তা কম সময়ের মধ্যে সেরেও যায়। তবে মূল বিপত্তি ঘটে গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে। কারণ মাইক্রোসেফালী বা অস্বাভাবিক আকৃতির মাথা নিয়ে হাযার হাযার শিশুর জন্মের জন্য এই ভাইরাসটিকেই দায়ী করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত এ রোগটির কোন প্রতিকার নেই, প্রতিষেধকও নেই।

জিকা ভাইরাস দুই আমেরিকার ২৪টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে বলে দি প্যান আমেরিকান হেলথ অর্গানাইজেশন জানিয়েছে। এতে আক্রান্তের সংখ্যা ৪০ লাখ। ব্রাজিলে ছোট মাথা নিয়ে শিশুর জন্মত্রুটির যে মহামারী দেখা দিয়েছে, তার পিছনেও এই ভাইরাসটিকে দায়ী করা হচ্ছে। শুধু ব্রাজিলেই এই ভাইরাসের কারণে ৪০ হাযার শিশু বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হয়ে জন্ম নিয়েছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মা এই ভাইরাসে আক্রান্ত হ'লে তাতে গর্ভের শিশুও আক্রান্ত হয় এবং শিশু ছোট মাথা নিয়ে জন্ম নেয়। ফলে এসব শিশুর বুদ্ধিমত্তার ঘাটতি থাকে, শারীরিক বৃদ্ধি কম হয়, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হ'তে পারে।

ল্যাটিন আমেরিকাজুড়ে বিস্ফোরিত হওয়ার পর রোগটি নিয়ে উদ্বেগে পড়েছে গোটা বিশ্বও। দক্ষিণ আমেরিকার পর সম্প্রতি জিকা ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় বিশ্বময় যরূরী অবস্থা ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

এডিস মশার বিস্তার ঘটে ১৯৪৭ সালে উগান্ডার জিকা জঙ্গলে বানরের শরীরে প্রথম ভাইরাসটি শনাক্ত হয়েছিল। পরে জঙ্গলের নামানুসারে ভাইরাসটির নামকরণ করা হয় জিকা। ১৯৫২ সালে জিকাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বতন্ত্র ভাইরাস হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

গবেষকরা বলছেন, নগরায়ন ও বনাঞ্চল উজাড়ের মতো কার্যক্রম এই ভাইরাসের দ্রুত বিস্তারে ভূমিকা রাখছে। ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক অ্যামি ভিট্রর বলেন, এই ভাইরাসের উত্থান ও বিস্তার সরাসরি পরিবেশ বিপর্যয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তিনি বলেন, যখন বন-জঙ্গলের আধিক্য ছিল তখন এ ধরনের রোগ বনের পশু ও মশার মধ্যে চক্রাকারে আবর্তিত হ'ত। মানুষ যখন বনভূমি উজাড় করতে শুরু করে তখন প্রাকৃতিক এই সিস্টেমটি ভেঙে পড়ে এবং মানুষের মধ্যে এসব রোগের সংক্রমণ শুরু হয়। কীটপতঙ্গের স্বাভাবিক আবাস ভেঙে দেয়ার ফলে তারা এখন লোকালয়ে চলে আসছে।

ইউরোপে ১০ হাযার শরণার্থী শিশুকে যৌনকর্মী বানানো হচ্ছে!

অভিভাবকহীন অন্তত ১০ হাযার শরণার্থী শিশু ইউরোপে পৌঁছার পর নিখোঁজ রয়েছে বলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) অপরাধবিষয়ক গোয়েন্দা সংস্থা ইউরোপোল জানিয়েছে। ইউরোপোলের প্রধান ব্রায়ান ডোনাল্ড জানিয়েছেন, হাযার হাযার শরণার্থী শিশু ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তালিকাভুক্ত হওয়ার পর তাদের আর হদিস মিলছে না। কেবল ইতালীতেই ৫ হাযার শিশু নিখোঁজ রয়েছে। এছাড়া সুইডেনে খোঁজ নেই আরো ১ হাযার শিশুর। তা হ'লে কি ইউরোপে হারিয়ে যাওয়া ১০ হাযার শরণার্থী শিশুকে যৌনকর্মী বানানো হচ্ছে? কারণ সংশ্লিষ্ট দেশের কর্মকর্তারা বলছেন, 'শিশুরা হারিয়ে গেছে'।

ডোনাল্ড আরও জানান, ইউরোপে শরণার্থীদের যে ঢল নামে, তা অবৈধভাবে ব্যবহারের জন্য ২০১৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে অপরাধী চক্র গড়ে ওঠে। তিনি বলেন, আমরা জানি না ঐ শিশুরা কোথায়। তবে কিছু তথ্যপ্রমাণ দেখে মনে হচ্ছে ওদের যৌনকর্মী হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেইসঙ্গে অনেককে পাচারও করে দিচ্ছে দুষ্কৃতকারীরা। কারণ ইতিমধ্যে জার্মানী, হাঙ্গেরী এবং ফ্রান্সের বিভিন্ন যৌনপল্লীতে ইউরোপোল কিছু নিখোঁজ শরণার্থী শিশুর সন্ধানও পেয়েছে। যাদেরকে কয়েক হাত ঘুরে ঐ পেশায় আনা হয়েছে।

এদিকে শিশুবিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন জানায়, শুধু ২০১৫ সালেই ইউরোপে প্রায় ২৬ হাযার শরণার্থী শিশু এসেছে। এছাড়া যে ১০ লাখের বেশি শরণার্থী গত বছর ইউরোপে প্রবেশ করেছে, তাদের ২৭ শতাংশই শিশু ও কিশোর। ইউরোপে প্রবেশের পর থেকেই তারা অদৃশ্য হয়ে যায়।

যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে প্রতিবেদন

৫ বছরে সিরীয় গৃহযুদ্ধে নিহত ৪ লাখ ৭০ হাযার

সিরিয়ায় প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের বাহিনী ও বিদ্রোহীদের মধ্যে গত পাঁচ বছর ধরে চলা গৃহযুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ। এই সংখ্যা জাতিসংঘ ঘোষিত সংখ্যার দ্বিগুণ। এর বাইরে বাস্তুচ্যুত হয়েছে ৪৫ শতাংশ সিরীয়। সিরিয়া যুদ্ধে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি বিষয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'সিরিয়ান সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চের (এসসিপিআর) একটি প্রতিবেদনে এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, যুদ্ধের বিভীষিকায় পড়ে সিরিয়ার জাতীয় সম্পদ ও অবকাঠামো প্রায় পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। নিহত হয়েছে ৪ লাখ ৭০ হাযার লোক।

'আরব বসন্ত' নামে পরিচিত স্বৈরাচারবিরোধী তথাকথিত গণ-অভ্যুত্থানের জোয়ার সিরিয়াতেও এসে লাগে ২০১১ সালে। ওই বছরের মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় পাঁচ বছরে এই জোয়ারের সামান্যতম কোন সুফল না মিললেও এই সময়ে হতাহত হয়েছে বিরাটসংখ্যক জনগোষ্ঠী। প্রতিবেদন অনুযায়ী আহতের সংখ্যা ১৯ লাখ এবং দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ২৫ হাযার ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার।

কৃষ্ণগহ্বরে মিটবে সারা বিশ্বের বিদ্যুৎ চাহিদা : হকিং

বিশিষ্ট পদার্থবিদ অধ্যাপক স্টিফেন হকিংয়ের মতে, ছোট কৃষ্ণগহ্বরগুলো বিদ্যুৎকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়। তিনি দাবী করেছেন, মহাবিশ্বের পর্বতাকৃতির একটি কৃষ্ণগহ্বর গোটা পৃথিবীর বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে পর্যাপ্ত শক্তি সরবরাহ করতে পারে। মহাবিশ্বে অনেক কৃষ্ণগহ্বর রয়েছে, কিন্তু বিশাল আকৃতির কৃষ্ণগহ্বর শনাক্ত করা কঠিন। তবে অপেক্ষাকৃত ছোট পর্বতাকৃতির একটি কৃষ্ণগহ্বর থেকে নিঃসৃত রশ্মি বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা যাবে এবং পৃথিবীর শক্তির যোগান দেবে। অধ্যাপক হকিং তার এক বক্তৃতায় বলেন, 'পর্বতাকৃতির একটি কৃষ্ণগহ্বর প্রায় ১০ মিলিয়ন মেগাওয়াট হারে তেজস্ক্রিয় ও গামা রশ্মি বিচ্ছুরণ করবে, যা সারা বিশ্বের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে পর্যাপ্ত হবে। তবে বিশাল ক্ষমতার সঙ্গে বিশাল ঝুঁকিও রয়েছে। কারণ যদি কৃষ্ণগহ্বরের ভয়ঙ্কর ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তাহ'লে এটি পৃথিবীর মাঝে ডুবে যেতে পারে। তাই কৃষ্ণগহ্বর থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেকে এর শক্তি কাজে লাগাতে হবে।

Contents

মুসলিম জাহান

জোর করে ১৩ হাযার পুরুষের দাড়ি কেটে দিয়েছে পুলিশ

তাযিকিস্তানে ১৩ হাযার পুরুষের দাড়ি কেটে দিয়েছে পুলিশ। একইসাথে সেখানে ধর্মীয় পোশাক বিক্রির দায়ে ১৬০টি দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিদেশী প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অংশ হিসাবে সরকার এ কাজ করেছে। দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিমের খাতলুন অঞ্চলের পুলিশ প্রধান বাহরুম শরীফযাদা এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ১৭ হাযার মুসলমান নারী ও বালিকাকে হিজাব পরিধান থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়েছে। তারা এ পদক্ষেপকে চরমপন্থার বিরুদ্ধে লড়াই বলে দাবী করেছে। প্রতিবেশী আফগানিস্তান থেকে যাতে তাযিকিস্তানে চরমপন্থার বিকাশ ঘটাতে না পারে, সেজন্য দেশটির সেক্যুলার সরকার অনেক দিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গত সপ্তাহে দেশটির পার্লামেন্টে বিয়ের সময় আরবী কোনো শব্দ উচ্চারণ করা যাবে না বলে প্রস্তাব দেওয়া হয়। ধারণা করা হচ্ছে, শিগগিরই প্রেসিডেন্ট এতে অনুমোদন দিবেন। প্রসঙ্গত, বেসরকারী হিসাবে তাযিকিস্তানের ২ হাযারেরও বেশী তরুণ সিরিয়ায় আইএসের হয়ে লড়াই করছে।

[স্বাভাবিক ধর্মীয় বিধান মানতে বাধা দেওয়াটাই মূলতঃ চরমপন্থী কাজ। ধর্ম নিরপেক্ষ সরকারের এই একচোখা নীতি সেদেশে ধর্মীয় চরমপন্থাকে আরও উসকে দিবে। অতএব অবিলম্বে এ থেকে বিরত হৌন (স.স.)]

মোবারকবিরোধী বিপ্লবের পাঁচ বছর : স্বৈরশাসনের যাঁতাকলে মিসর

মিসরে হোসনী মোবারকের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া গণ-আন্দোলনের পাঁচ বছর পূর্তি হয়েছে গত মাসে। বিক্ষোভের জেরে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন মোবারক। কিন্তু আগের চেয়ে নিষ্ঠুর চেহারায় ফিরে গেছে দেশটি। আরও কঠোর স্বৈরশাসনের যাঁতাকলে পড়েছে মিসরবাসী। বিরোধী দলগুলোর ওপর চলছে চরম দমন-নিপীড়ন। ফলে চরমপন্থার উত্থানও হচ্ছে আশঙ্কাজনকভাবে।

২০১১ সালে রুটি, স্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের দাবীতে লাখ লাখ মানুষ মোবারকের বিরুদ্ধে বিপ্লব শুরু করে। ১৮ দিনের গণ-আন্দোলনে ৩০ বছরের স্বৈরশাসনের পতন ঘটে। মুক্তি পায় মিসরবাসী। কিন্তু গণতন্ত্রের স্বাদ পেতে না পেতেই ২০১৩ সালের জুলাইতে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ মুরসিকে ক্ষমতাচ্যুত করেন তৎকালীন সেনাপ্রধান সিসি। সব বিরোধী মতকে দমন করে ২০১৪ সালে একতরফা নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট হন তিনি। সিসির বিরোধিতা করায় মুসলিম ব্রাদারহুডের কয়েক শ' নেতা-কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। হাযার হাযার নেতা-কর্মীকে কারাবরণ করতে হয়েছে। বাদ যায়নি বাম ও ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোও। মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলছে, মিসরে মানবাধিকার লঙ্ঘন ভয়াবহ আকার নিয়েছে। দেশটি পুলিশী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। কায়রোভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক গামাল ইদ বলেন, দেশের ভেতরে সংঘাত-সংঘর্ষ আরও বেড়েছে। এখনকার মানবাধিকার পরিস্থিতি হোসনী মোবারক কিংবা মুসলিম ব্রাদারহুডের শাসনামল থেকেও শোচনীয়। অন্যদিকে দমন-নিপীড়নের ফলে দেশটিতে উগ্রবাদ ছড়িয়ে পড়ছে। তবে দীর্ঘদিনের আন্দোলন, প্রতি আন্দোলন, হানাহানিতে ক্লান্ত অনেক মিসরবাসীই সাফাই গাইছেন সিসির পক্ষেই।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

নওগাঁয় মশা তাড়ানোর যন্ত্র আবিষ্কার

দেশীয় প্রযুক্তিতে মাত্র কয়েকশ' টাকা খরচ করে মশা তাড়ানোর যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন নওগাঁ সদর থানার দুবলাহাটি গ্রামের যুবক এস.এম. ইবরাহীম হোসেন রাজু। মাত্র ৪ মাসের গবেষণায় আবিষ্কৃত এই যন্ত্রটির নাম দিয়েছেন 'রাজু মসকিউটো রিপেলার মেশিন'। এটি বাজারজাতের জন্য তিনি ঢাকা ডিপার্টমেন্ট অফ প্যাটেন্ট, ডিজাইন এণ্ড ট্রের্ড মার্কস থেকে রেজিস্ট্রেশন নিয়েছেন।

যন্ত্রটিতে মোবাইল ফোনের ব্যাটারী, একটি ছোট সার্কিট, টেপ, আঠা, ব্যাটারী চার্জার সহ স্বল্প কিছু সাধারণ বস্তু ব্যবহৃত হয়েছে। বিদ্যুৎ ছাড়াই ব্যাটারীর সাহায্যে এটা প্রায় ৬/৮ ঘণ্টা চালানো সম্ভব। একটি ঘরে যন্ত্রটি চালু করার পর ১০ থেকে ১৫ মিনিট পর কাজ শুরু হয়। ঘর যত বড় হবে সময় ততো বেশী লাগবে। যন্ত্রটি ঘরের দরজা-জানালা খোলা বা বন্ধ সব অবস্থাতেই সমানভাবে কার্যকর।

প্রস্তুতকারী এসএম ইব্রাহীম হোসেন রাজু বলেন, মশার শরীর পানি দিয়ে তৈরী। এই চিন্তা থেকেই এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করা হয়েছে। এই যন্ত্রের মাধ্যমে আল্ট্রা-সাউণ্ড নামে শব্দ বা কম্পন উৎপন্ন হবে। যাতে মশার শরীরেও কম্পন তৈরী হবে। ফলে একটি নির্দিষ্ট এলাকা জুড়ে মশা না মরে পালিয়ে যাবে। যন্ত্রটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চালু থাকলেও এর শব্দে মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর কোনো প্রভাব থাকবে না।

মশা তাড়ানোর জন্য যন্ত্রটিতে কোনো প্রকার রাসায়নিক উপাদান বা কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়নি। ফলে এতে পরিবেশ দূষিত হওয়ার মতো কোন কারণ নেই। তিনি জানান, যন্ত্রটির বর্তমান মূল্য ১০০ থেকে ৫০০ টাকা।

সাগরতলে তথ্যভাণ্ডার!

এবার সমুদ্রের তলদেশে ডাটা সেন্টার স্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছে মাইক্রোসফট করপোরেশন। মাইক্রোসফটের একদল গবেষক ৩৮ হাযার পাউন্ড ওযনের ক্যাপসুল আকৃতির কনটেইনারের মধ্যে পুরো একটি ডাটা সেন্টার ভরে ১০৫ দিন অথই জলরাশির নিচে ফেলে রেখেছিলেন। সফল এই পরীক্ষণের মাধ্যমেই এর সম্ভাবনা নিশ্চিত হওয়া গেছে। এখন প্রশ্ন হ'ল সমুদ্রের নিচে ডাটা সেন্টার কেন? কারণ ডাটা সেন্টার আকারে খুব বড় হয়। কোন কোনটা তো পুরো এক ফুটবল মাঠের চেয়েও বড়। তাতে সারি সারি সাজানো সার্ভার থেকেই আসে ইন্টারনেটে পাওয়া সব তথ্য। এই সার্ভারগুলো প্রচুর তাপ উৎপন্ন করে। ঠাণ্ডা করার জন্য কুলিং সিস্টেমের পেছনে ঢালতে হয় বিপুল পরিমাণ অর্থ। সমুদ্রের হিমশীতল পানির নিচে ডাটা সেন্টার করলে প্রাকৃতিক উপায়েই তা ঠাণ্ডা থাকবে। আরেকটি সুবিধা হ'ল, ক্যাপসুলের সঙ্গে টারবাইন লাগানো সম্ভব হ'লে সমুদ্রস্রোত কাজে লাগিয়েই বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। সব দিক থেকেই ধারণাটি খুবই লাভজনক। তবে সামনে একটাই চ্যালেঞ্জ প্রবল পানির চাপ সহ্য করে দীর্ঘদিন ক্যাপসুলগুলো কর্মক্ষম থাকবে কি না!

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

আমীরে জামা'আতের ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ সফর

গত ১৮ই জানুয়ারী সোমবার রাত ১১-টা ২০ মিনিটে পদ্মা এক্সপ্রেস ট্রেনযোগে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** হাদীছ ফাউণ্ডেশনের ম্যানেজার আব্দুল বারীকে সাথে নিয়ে হঠাৎ যরূরী প্রয়োজনে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পরদিন সকাল সাড়ে ৫-টায় কমলাপুর স্টেশনে পৌঁছলে সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ। অতঃপর সকাল সাড়ে ৬-টায় তিনি বংশালস্থ হোটেল আল-রাজজাকে পৌঁছেন। সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ ফযলুল হক, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হাসান ও বংশাল এলাকা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক জনাব আযীমুদ্দীন।

বংশাল, ঢাকা ১৯শে জানুয়ারী মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব বংশালস্থ যেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত দায়িত্বশীল বৈঠকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ঢাকা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কর্মপরিষদ সদস্যদের সাথে বৈঠক করেন। এ সময়ে তিনি যেলা ও মহানগরীতে সংগঠনের কার্যক্রম ও দাওয়াতী কাজের খোঁজ-খবর নেন। তিনি বলেন, একটি সংগঠন বেঁচে থাকে তার আদর্শের উপর। আদর্শহীন সংগঠন লক্ষ্যহীন গাড়ীর মত। তিনি কর্মীদের দৃঢ়ভাবে আদর্শনিষ্ঠ হওয়ার জন্য নিয়মিতভাবে সংগঠনের সাহিত্য পাঠ করার আহ্বান জানান। সেই সাথে সংগঠনের দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক কর্মসূচীগুলি 'কর্মপদ্ধতি' অনুযায়ী যথাযথভাবে পালন করার পরামর্শ দেন।

মহিলা বৈঠক : একই দিন বাদ এশা বংশাল এলাকা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক জনাব আযীমুদ্দীনের বাসায় অনুষ্ঠিত মহিলা বৈঠকে তিনি যোগদান করেন। বৈঠকে সমবেত মহিলাদের উদ্দেশ্যে তিনি বক্তব্য রাখেন ও তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এসময় যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আহসান, সহ-সভাপতি মুশাররফ হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার ও অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর জনাব আযীমুদ্দীনের বাসায় আতিথেয়তা গ্রহণ শেষে রাত সাড়ে ১০-টায় তিনি হোটেলে ফিরে আসেন।

নাযিরাবাজার, ঢাকা ২০শে জানুয়ারী বুধবার : অদ্য বাদ ফজর নাযিরাবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ছালাত শেষে ইমামের পঠিত আয়াত সমূহের উপর সংক্ষিপ্ত 'দরস' পেশ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত। অতঃপর মুছল্লীদের সাথে মুছাফাহা ও কুশল বিনিময় শেষে তিনি যেলা কার্যালয়ে গমন করেন। উল্লেখ্য যে, ফজরের ছালাত আদায়ের জন্য তিনি হোটেল থেকে মসজিদে আসেন।

অতঃপর অফিসে তিনি দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে 'দরসে হাদীছ' পেশ করেন। এরপর দুপুর ২-টায় তিনি নারায়ণগঞ্জের পূর্বাচলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং বিকাল ৪-টায় সেখানে পৌঁছে ১৭ নং সিটি বাংলোতে এলাকাবাসীর আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। অতঃপর পূর্বঘোষিত সুধী সমাবেশে যোগদান করেন।

সুধী সমাবেশ
সকলে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করুন

-আমীরে জামা'আত

পূর্বাচল, নারায়ণগঞ্জ ২০শে জানুয়ারী বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার পূর্বাচলের ১৭নং সেক্টর পিংলান জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পূর্বাচল এলাকার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রাজধানী থেকে বিচ্ছিন্ন জনবিরল এই দূরবর্তী এলাকায় আপনাদের সাথে পরিচিত হতে পেরে আমরা আনন্দিত। বৃষ্টি বিঘ্নিত এই দিনেও আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপক সমাবেশ দেখে আমরা অভিভূত। আপনাদের প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা আতিথেয়তায় আমরা মুগ্ধ। আমাদের মধ্যে পরিচয়ের এই সেতুবন্ধ রচিত হ'ল স্রেফ সাংগঠনিক ও আদর্শিক কারণে। অতএব আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিশুদ্ধ দাওয়াতে আপনারা জামা'আত বদ্ধ হউন এবং ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে এগিয়ে আসুন।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা কেরামত আলী, পূর্বাচল এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ছালাহুদ্দীন মেম্বার, পিংলাক সিটি জামে মসজিদের ইমাম খায়রুল ইসলাম ও পূর্বাচল এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রমুখ।

কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ : পূর্বাচলের প্রোগ্রাম শেষে আমীরে জামা'আত রাত সাড়ে ৮-টায় নারায়ণগঞ্জ যেলার আড়াই হাজার থানাধীন কাঞ্চন বাজার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পৌঁছেন। সেখানে অপেক্ষমাণ মুছল্লীদের নিয়ে তিনি এশার ছালাত আদায় করেন। অতঃপর উপস্থিত মুছল্লী ও পার্শ্ববর্তী হাফেযী মাদরাসার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন।

দায়িত্বশীল বৈঠক : অতঃপর রাত ৯-টায় আমীরে জামা'আত উক্ত মসজিদের সন্নিকটে অবস্থিত যেলা 'আন্দোলন'-এর কার্যালয়ে গমন করেন। সেখানে তিনি যেলা ও এলাকা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীলদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। তিনি যেলা ও এলাকার খোঁজ-খবর নেন এবং সাংগঠনিক কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য দায়িত্বশীলগণকে পরামর্শ ও উপদেশ দেন। একই স্থানে নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলদের সাথে পৃথকভাবে বৈঠক করেন।

শ্যামপুর গমন : কাঞ্চনের প্রোগ্রাম সেরে আমীরে জামা'আত তাঁর অসুস্থ বেহাইকে দেখতে সফরসঙ্গীদের নিয়ে শ্যামপুর গমন করেন। সেখানে তিনি রাতের খাবার গ্রহণ করেন। এসময় আমীরে জামা'আতের সাথে ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা জনাব আলমগীর হোসাইন, অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ, দফতর সম্পাদক ফযলুল হক, মাদারটেক এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ফরীদ মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক জালাল দেওয়ান, ঢাকা যেলা 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান প্রমুখ। অতঃপর রাত সাড়ে ১১-টায় তিনি ঢাকায় হোটেলে ফিরে আসেন।

মালিটোলা, ঢাকা ২১শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ এশা পুরানো ঢাকার মালিটোলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে উপস্থিত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গঠনের পর থেকে পার্শ্ববর্তী সুরীটোলা জামে মসজিদ ও এই মসজিদ ছিল

Contents

সংগঠনের প্রাণকেন্দ্র। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে যাত্রাবাড়ী মাদরাসা থেকে নাযিরাবাজার মাদরাসাতুল হাদীছে কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়। সে সময় 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আহসান ও ডা. আবু যায়েদ প্রমুখ আমাদের পুরানো সাথী। 'মানসী' সিনেমা হলে ইংরেজী ব্লু ফিল্মের বিরুদ্ধে এলাকাবাসীর মিছিলে আমরা আপনাদের সাথে যোগদান করেছি। আমরা আপনাদেরকে পুনরায় সামনে এগিয়ে চলার আহবান জানাচ্ছি। তাঁর ভাষণ শেষে মুছল্লীদের পক্ষ থেকে মুতাওয়াল্লী ছাহেব আমীরে জামা'আতকে ধন্যবাদ জানান। অতঃপর মহল্লার সন্তান ও বর্তমানে ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান ও বংশাল এলাকা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক আযীমুদ্দীন বক্তব্য রাখেন ও অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য, মালিটোলা মসজিদের মুতাওয়াল্লী ডাঃ আবু যায়েদ আমীরে জামা'আতকে জুম'আর ছালাত আদায়ের জন্য ইতিপূর্বে হোটেলে গিয়ে অনুরোধ করেন। সেটা রক্ষা সম্ভব না হওয়ায় তাঁর আবেদনক্রমে তিনি বৃহস্পতিবার এশার ছালাত উক্ত মসজিদে আদায় করেন। ঐ মসজিদে তাঁর ছালাত আদায়ের কথা প্রচারিত হলে পার্শ্ববর্তী আহলেহাদীছ মহল্লা সমূহের মুছল্লীগণ এবং ভাষাণটেক, মাদারটেক প্রভৃতি এলাকা থেকে কর্মীগণ ছুটে আসেন। এছাড়া মহিলারাও দোতলায় উপস্থিত হন। মুছল্লীগণ আমীরে জামা'আতের ১ঘন্টা ২০ মিনিটের বক্তব্য শুনে মুগ্ধ হন এবং ভবিষ্যতে ঢাকায় এলে বিভিন্ন মহল্লার মসজিদ থেকে তাঁকে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

অতঃপর ২২শে জানুয়ারী শুক্রবার দুপুর ২-টার বিমান যোগে রওয়ানা হয়ে বেলা পৌনে ৩-টায় রাজশাহী বিমানবন্দরে অবতরণ করেন ও সোয়া ৩-টায় মারকাযে পৌঁছেন। ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।

সুধী সমাবেশ

গোপালপুর, মোহনপুর, রাজশাহী ২রা ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন গোপালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মোহনপুর উপযেলার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ রেযাউল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফাযুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক এমদাদুল হক, ধুরইল এলাকার সভাপতি আব্দুল বারী, রাজশাহী পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, পিয়ারপুর শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীন ও গোপালপুর শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মোহনপুর উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আবুল কাসেম।

যেলা সম্মেলন

ময়মনসিংহ ২২শে জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ যেলার উদ্যোগে যেলার ত্রিশাল থানাধীন অলহরী খারহর মুন্সিবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে যেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল কাদের এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মাওলানা বেলাল হোসাইন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ ফযলুল হক, টাঙ্গাইল যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার আব্দুল ওয়াজেদ, ময়মনসিংহ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সফীরুদ্দীন প্রমুখ।

ইসলামী সম্মেলন

ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ ১১ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ধোবাউড়া উপযেলার উদ্যোগে মেকিয়ারকান্দা দাখিল মাদরাসা ময়দানে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম মেকিয়ারকান্দা আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আব্দুল হান্নান তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম, ময়মনসিংহ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সফীরুদ্দীন প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি' ময়মনসিংহ যেলার পরিচালক মুহাম্মাদ আলী। উল্লেখ্য, সম্মেলনের এক পর্যায়ে রাত ১০-টায় কেন্দ্রীয় মেহমান পার্শ্ববর্তী মেকিয়ারকান্দা বাজারে নব প্রতিষ্ঠিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদ পরিদর্শনে যান এবং সেখানে উপযেলা কর্মপরিষদের সাথে বৈঠক করেন। এ সময় তিনি সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

পাংশা, রাজবাড়ী ২৮শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজবাড়ী যেলার রঘুনাথপুর এলাকার উদ্যোগে স্থানীয় রঘুনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন ময়দানে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আনীসুর রহমান মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও স্থানীয় সেনগ্রাম ফাযিল মাদরাসার সহকারী অধ্যাপক মাওলানা মকবুল হোসাইন, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ ঈমান আলী প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, বাদ যোহর হ'তে অত্র মসজিদে কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং পরদিন বাদ ফজর সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় মেহমানগণ দরস পেশ করেন। অতঃপর মুহাম্মাদ রাসেলকে পরিচালক করে 'সোনামণি' রাজবাড়ী যেলা কমিটি গঠন করা হয়।

তাবলীগী সভা

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ২৯শে জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চুয়াডাঙ্গা যেলার উদ্যোগে যেলার দামুড়হুদা দশমী গোরস্থান সংলগ্ন জামে মসজিদে মাসিক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম।

Contents

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তরীকুযযামান, সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, একই দিন বাদ আছর যেলার জীবননগর থানাধীন লক্ষ্মীপুর গ্রামে স্থানীয় হানাফী মসজিদ হতে বিতাড়িত নতুন আহলেহাদীছ ভাইদের উদ্যোগে জনাব ওমর ফারূকের বাসার ছাদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। তিনি দ্বীনে হক-এর উপর অবিচল থাকার বিগত দৃষ্টান্তসমূহ তুলে ধরে সকলকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেন এবং যেকোন মূল্যে ছহীহ আক্বীদা ও আমলের উপর টিকে থাকার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ রুকনুদ্দীন ও প্রচার সম্পাদক ক্বামারুযযামান প্রমুখ।

রাজশাহী ৩১শে জানুয়ারী রবিবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে শহরের শিরোইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিরোইল শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। মহানগর 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব নাযিমুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুবীনুল ইসলাম, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক আবুবকর, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন প্রমুখ দায়িত্বশীলগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালক ছিলেন অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুল হাদী।

মারকায সংবাদ

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় মারকাযের ছাত্রদের কৃতিত্ব

গত ২৬শে জানুয়ারী'১৬ মঙ্গলবার বশিরাবাদ আলিম মাদরাসায় (রাজশাহী) 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে উপযেলা পর্যায়ে জাতীয় শিশু-কিশোর ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর ১৬ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে ১০ জন ছাত্র বিভিন্ন বিষয়ে মোট ১৩টি পুরস্কার অর্জন করে। বিজয়ীরা হল :

বিষয়	গ্রুপ- ক	স্থান
ক্বিরাআত	(১) আব্দুল্লাহ রিয়ায (হিফয বিভাগ)	২য়
	(২) মুহাম্মাদ শাকিরুদ্দীন (,,)	৩য়
আযান	(১) মুহাম্মাদ রায়হান আলী (,,)	২য়
	(২) হাবীবুল্লাহ আল-মা'রূফ (,,)	৩য়
	গ্রুপ- খ	
ক্বিরাআত	(১) আব্দুল হাসীব (৫ম শ্রেণী)	১ম
	(২) আব্দুল্লাহ শাকিল (হিফয বিভাগ)	৩য়
আযান	(১) মাযহারুল ইসলাম (৬ষ্ঠ শ্রেণী)	৩য়
হামদ ও না'ত	(১) আব্দুল্লাহ শাকিল (হিফয বিভাগ)	১ম
	(২) আব্দুল হাসীব (৫ম শ্রেণী)	৩য়
উপস্থিত বক্তৃতা	(১) আলাউদ্দীন (৮ম শ্রেণী)	৩য়
রচনা	(১) মিনহাজুল ইসলাম (১০ম শ্রেণী)	১ম
	(২) আলাউদ্দীন (৮ম শ্রেণী)	২য়
	(৩) মুযযাম্মিল হক (,,)	৩য়

মৃত্যু সংবাদ

(১) ক্বারী এলাহী বখ্শ (১১৬) গত ৯ই ডিসেম্বর '১৫ সন্ধ্যা ৬-টায় সাতক্ষীরার তালা থানাধীন ১নং ধানদিয়া ইউনিয়নের পাঁচপাড়া গ্রামে নিজ বাড়ীতে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে যান। পরদিন বাদ যোহর জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান। অতঃপর তাঁকে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

(২) ক্বারী ঈসা (১০০) গত ১০ই জানুয়ারী সকাল ১১-টায় সাতক্ষীরার ঝাউডাঙ্গা ইউনিয়নের উত্তর দেবনগর গ্রামে নিজ বাড়ীতে বার্ধক্য জনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তিনি ৫ পুত্র ও ৩ কন্যা সন্তান রেখে যান। পরদিন সকাল ১০-টায় তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তাঁর বিমাতা ভাই হাফেয আব্দুল হাদী। অতঃপর তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং কাকডাঙ্গা মাদরাসার শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

দু'জনেই কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদরাসায় আমীরে জামা'আতের বাল্যকালের শিক্ষক ছিলেন। দ্বিতীয় জন আমীরে জামা'আতের ঘনিষ্ট আত্মীয় ছিলেন এবং ঢাকা কারাগারে থাকা অবস্থায় তিনি আমীরে জামা'আতকে সেখানে দেখতে যান।

(৩) 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর সাবেক হিসাব রক্ষক ও 'আন্দোলন'-এর নিবেদিতপ্রাণ শুভাকাঙ্খী জনাব মুমতায আলী মোল্লা (৭৬) গত ৫ই ফেব্রুয়ারী সকাল ১১-টায় রাজশাহী মহানগরীর রামচন্দ্রপুরে নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৫ পুত্র ও ২ কন্যা সন্তান রেখে যান। একইদিন বিকাল ৫-টায় টিকাপাড়া কবরস্থান সংলগ্ন ঈদগাহে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। ইমামতি করেন তাঁর ৪র্থ পুত্র মুহাম্মাদ সুলতানুল ইসলাম। অতঃপর তাকে টিকাপাড়া কবরস্থানে দাফন করা হয়। তিনি ইপিআর, বিএডিসি, বরেন্দ্র প্রকল্প ও তুলা উন্নয়ন বোর্ডে চাকুরী করেন এবং এখান থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর জানাযায় 'আন্দোলন'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, রাজশাহী মহানগরী 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম, হাদীছ ফাউণ্ডেশন-এর গবেষণা সহকারী আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীবসহ বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, তার পুত্র সুলতান নিয়মিতভাবে আত-তাহরীকের প্রচ্ছদ সমূহের ডিজাইন ও হা.ফা.বা প্রকাশিত বইসমূহের প্রচ্ছদ করে থাকেন।

[আমরা মাইয়েতগণের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

Contents

মতামত

আন্দোলন

*-মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রধান**

বক্ষ্যমাণ নিবন্ধের শিরোনাম হ'ল 'আন্দোলন'। এটির আভিধানিক অর্থ আলোড়ন। কোন আদর্শকে সাধারণ্যে গ্রহণযোগ্যতা দানের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা বা গনজাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচেষ্টা। ইংরেজী প্রতিশব্দ Movement, Agitation। এদেশের আপামর জনসাধারণের কাছে ফেব্রুয়ারীর 'ভাষা আন্দোলন' বহুল প্রসিদ্ধ। তাছাড়াও শব্দটি উপমহাদেশে জিহাদ আন্দোলন, ওহাবী আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, আহলেহাদীছ আন্দোলন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যবহৃত একটি শব্দ। তাই সাধারণভাবে এর সরল অর্থটি সবার কাছেই সহজবোধ্য বটে। তবে বিপত্তিটা অন্যখানে। আর তা হ'ল এই যে, কোন আন্দোলনের সফলতা, বিফলতা, স্বার্থকতা ও ব্যর্থতা নিয়ে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, তার পূর্বের '৫২-এর ভাষা আন্দোলন-এর প্রত্যেকটিতেই আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও ভূমিকা পালনের কারণে উক্ত আন্দোলন সমূহের সফলতার পিছনে কার্যকর মূল বিষয় ও উপাদান সমূহ আমাদের অজানা থাকার কথা নয়। সেই অভিজ্ঞতা থেকে আন্দোলনের সফলতার কারণ সমূহকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে তা জনসমক্ষে উপস্থাপনের মানসে গত '৭০-এর দশক থেকেই চিন্তা-ভাবনা করে একটি সূত্র দাঁড় করানোর চেষ্টা করে আসছিলাম।

আমাদের ধারণায় আন্দোলনের সফলতার জন্য অত্যাবশকীয় উপাদানগুলি হ'ল যথাক্রমে- (১) আন্দোলনের উদ্দেশ্য বা প্রতিপাদ্য বিষয়টি বৃহত্তর জনগোষ্ঠির স্বার্থে অপরিহার্য হওয়া (২) বজ্র কঠিন নেতৃত্ব (৩) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা (৪) বিরোধীতাকারীদের ক্ষমতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা (৫) বিষয়টির ন্যায্যতা ও সত্যতা নিয়ে কর্মীদের মধ্যে প্রশ্নাতীত বিশ্বস্ততা ও দৃঢ়চিত্ততা বিদ্যমান থাকা (৬) আন্দোলনে নেমে পিছু হটার ন্যূনতম চিন্তা-ভাবনা না থাকা এবং প্রাণ বিসর্জনের নিরেট প্রতিজ্ঞা থাকা।

উপরোক্ত ৬টি অপরিহার্য উপাদানকে আমরা নিম্নোক্ত ৯টি শব্দে BIG PUSHED থিওরী বা বি-৯ থিওরী নামকরণ করতে পারি।

BIG PUSHED দুইটি ইংরেজী শব্দ। অর্থ বড় ধাক্কা বা কঠোর দৃঢ় সংকল্প। প্রথম শব্দটিতে ৩টি বর্ণ এবং দ্বিতীয় শব্দটিতে ৬টি বর্ণ রয়েছে। প্রতিটি বর্ণে অনেকগুলি শব্দ হ'তে পারে। কিন্তু আমরা নিম্নোক্ত শব্দগুলিকে বাছাই করে নিচ্ছি। যেমন B থেকে Brave, I থেকে Intelligent, G থেকে Gentle, P থেকে Practical, U থেকে United, S থেকে Smart, H থেকে Honest, E থেকে Educated, D থেকে Dedicated. যেগুলির অর্থ যথাক্রমে সাহসী, বুদ্ধিমান, ভদ্র, বাস্তববাদী, ঐক্যবদ্ধ, সচেতন, সৎ, শিক্ষিত ও নিবেদিতপ্রাণ। এই নয়টি গুণ একত্রিত হ'লে যেকোন শুভ আন্দোলন সফল হবে বলে বিশ্বাস করি। প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নরূপ :

(১) Brave বা সাহসী। এটা এজন্য যে, নেতা সাহসী না হ'লে কোন আন্দোলনই সাফল্যের মুখ দেখবে না। কাজটি করব কি করব না, এরূপ দোদুল্যমান নেতৃত্ব ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। যেকোন আন্দোলন ও সংগঠনে এমনকি দেশ ও জাতির উন্নয়নে সর্বোচ্চ নেতার জন্য এই গুণটি সর্বাগ্রে প্রযোজ্য। (২) Intelligent বা বুদ্ধিমান। কারণ কেবল সাহসী হ'লেই চলবে না, তাকে বুদ্ধিমান ও কুশলী হ'তে হবে। বাস্তব কর্মকৌশল গ্রহণে পারদর্শী হ'তে হবে। (৩) Gentle বা ভদ্র। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ চালু আছে, Courtesy costs nothing অর্থাৎ ভদ্রতা প্রদর্শনে কোন কিছুই খরচ হয় না। এতে মানুষ মুগ্ধ হবে এবং আন্দোলনের পক্ষে অবস্থান নিবে। (৪) Practical বা বাস্তববাদী। আন্দোলনের পদক্ষেপ সমূহ বাস্তব সম্মত হ'তে হবে। নইলে এ যামানায় বসে যদি কেউ নবাব শায়েস্তা খাঁ-র আমলের টাকায় ৮ মণ চাউল পেতে চায়, তবে সেটা হবে বাস্তবতা বিবর্জিত। তবে আদর্শের বিষয়টি আলাদা। কেননা ইসলামী আদর্শ চিরন্তন ও সর্বযুগীয়। যার কোন পরিবর্তন নেই। (৫) United বা ঐক্যবদ্ধ। কর্মীদের মধ্যে কঠিন ঐক্য ছাড়া কোন আন্দোলনই সফল হবে না। সে ঐক্য হ'তে হবে অটুট ও নিশ্ছিদ্র। (৬) Smart বা সচেতন। প্রত্যেক কর্মীকে আন্দোলন সম্পর্কে সুস্পষ্ট চেতনা সম্পন্ন হ'তে হবে। হুজুগে কর্মী দিয়ে কখনো আন্দোলন সফল হয় না। শুরুতে না গেলেও এইসব কর্মীরা এক সময় আন্দোলন থেকে কেটে পড়বে। (৭) Honest বা সৎ। শতভাগ সৎ সক্রীয় কর্মী ব্যতীত কোন আন্দোলনেই সফলতা আশা করা যায় না। কর্ম ও কর্মীর মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকতে হবে। যাতে কর্মীকে দেখে কর্মকে এবং কর্মকে দেখে কর্মীকে চেনা যায়। (৮) Educated বা শিক্ষিত। যে বিষয়ে আন্দোলন করছি, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা থাকতে হবে। এজন্য নিয়মিতভাবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ আবশ্যক। নইলে কর্মকারকে কুম্ভকারের দায়িত্ব দিলে ফল হবে শূন্য। (৯) Dedicated বা নিবেদিতপ্রাণ। আন্দোলন ও আন্দোলনের নেতার প্রতি সর্বদা উৎসর্গীতপ্রাণ থাকতে হবে। নেতৃত্বের আদেশ ও নিষেধ নির্দ্বিধায় মেনে নিয়ে এবং তা পালনে মরণপণ দৃঢ়তা নিয়ে যথাশক্তি আত্মনিয়োগ করতে হবে।

উপসংহারে বলতে চাই ব্যক্তি জীবনে ছাত্রাবস্থায় ছাত্রদের ন্যায্য দাবী আদায়ের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছি। কখনো সাধারণ একজন কর্মী হিসাবে, কখনো বা নেতৃত্বের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ বাংলা ভাষা আন্দোলন উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে ঘোষিত পতাকা দিবসের মিছিল-

Contents

মিটিং থেকে শুরু করে সেই সময়ের ৩য় শ্রেণীর ক্ষুদে ছাত্র হিসেবে ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৫২-তে সকল মিছিল-মিটিংয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছি। ১৯৫২-এর ২৪শে ফেব্রুয়ারী গ্রেফতার হয়ে গোবিন্দগঞ্জ থানা হাজতে বাস করা যে কত যাতনার ও কত কষ্টের, তা কি আজ চিন্তা-চেতনায় আনা সম্ভব? কোনটাই অযৌক্তিক ছিল না। ছিল না কোথাও পরাজয়ের গ্লানি। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে উপরে বর্ণিত বি-৯ থিওরীর শব্দ সমূহের চয়ন পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে বলে আশা করি।

অবশেষে পাঠকের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের আমি এই অশীতিপর বৃদ্ধ ছহীহ সুন্নাহ্র ইসলামী আন্দোলন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করছি এবং এর সফলতা কামনাতেই আমার আজকের এই নিবন্ধের অবতারণা। আল্লাহ এই আন্দোলনকে কবুল করুন- আমীন!

** [অবসরপ্রাপ্ত বিসিএস সমবায় কর্মকর্তা, '৭১-এর মুক্তিযোদ্ধা; 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পশ্চিম যেলার প্রধান উপদেষ্টা।]*

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২০১) : আবু সুফিয়ানকে কি ছাহাবায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়? তার নামের সাথে 'রাযিয়াল্লাহু 'আনহু' বলা যাবে কি?

-আমীনুল ইসলাম
ইসলামপুর, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : আবু সুফিয়ান (রাঃ) একজন বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ইসলাম কবুল করেন এবং ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ৩১ হিজরীতে ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করেন। ওছমান (রাঃ) তাঁর জানাযার ছালাত পড়ান এবং বাকী' গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। সেকারণ তাকে ছাহাবী গণ্য করা এবং নামের শেষে 'রাযিয়াল্লাহু 'আনহু' বলা যরূরী *(ইবনু হিশাম ২/৪০৩, মুসলিম হা/১৭৮০; ছহীহাহ হা/৩৩৪১; ইস্তী'আব রাবী নং ৩০০৫; বিস্তারিত দ্রঃ সীরাতুল রাসূল (ছাঃ) ২য় সংস্করণ, ৫৩০-৫৩২ পৃঃ)।*

প্রশ্ন (২/২০২) : জানাযার ছালাতে একদিকে বা উভয় দিকে সালাম ফিরানোর ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি?

-যহূরুল ইসলাম, বগুড়া।

উত্তর : অন্যান্য ছালাতের ন্যায় জানাযার ছালাতেও উভয় দিকে সালাম ফিরাতে হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, লোকেরা তিনটি কাজ ছেড়ে দিয়েছে, যেগুলো রাসূল (ছাঃ) করতেন। তার একটি হ'ল, জানাযার ছালাতের সালাম অন্যান্য ছালাতের ন্যায় হওয়া *(বায়হাক্বী কুবরা হা/৭২৩৯, সনদ হাসান, আলবানী, আহকামুল জানায়েয, মাসআলা নং ৮৪)।* তবে শুধু ডান দিকেও সালাম ফিরানো যায় *(দারাকুৎনী হা/১৮৩৯ ও ১৮৬৪; সনদ হাসান, আহকামুল জানায়েয, মাসআলা নং ৮৫)।* উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে উভয়দিকে সালাম ফিরানোর আমলটিই প্রচলিত। তাই এর উপর আমল করাই উত্তম। নইলে ফিৎনা সৃষ্টি হ'তে পারে।

প্রশ্ন (৩/২০৩) : ঈদগাহের মাঠে খেলাধুলা সহ বিজয় দিবস, পহেলা বৈশাখ ইত্যাদি অনুষ্ঠান করা যাবে কি?

-ইউসুফ আলী
কান্তনগর পূর্বপাড়া, নাটোর।

উত্তর : ঈদগাহের মাঠে বিজয় দিবস, পহেলা বৈশাখ ও অন্যান্য দিবস পালনার্থে কোন অনুষ্ঠান করা বৈধ নয়। কারণ অমুসলিমদের অনুকরণে পালিত এসব দিবসের সাথে ইসলামের কোনই সম্পর্ক নেই। খেলাধূলা থেকেও দূরে থাকা কর্তব্য। কেননা এতে ঈদগাহের ধর্মীয় ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়।

প্রশ্ন (৪/২০৪) : মৃত ব্যক্তিকে কবরে শোয়ানোর সঠিক নিয়ম কি? চিৎ করে শোয়ানোর কোন বিধান আছে কি?

-দিদার বখশ,
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : প্রথমতঃ মৃত ব্যক্তিকে পশ্চিম দিকে মুখ করে কবরে রাখা উচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'উভয় জীবনে মানুষের ক্বিবলা হচ্ছে কা'বা' *(আবুদাউদ হা/২৮৭৫, ইরওয়া হা/৬৯০)।* আলবানী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগ হ'তে অদ্যাবধি এরূপ আমলই হয়ে আসছে *(আলবানী, আহকামুল জানায়েয, মাসআলা নং ১০২)।* দ্বিতীয়তঃ ডান কাতে শোয়াবে। এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন দলীল না পাওয়া গেলেও ঘুমানোর সময় ডানকাতে শোয়ার ব্যাপারে ছহীহ হাদীছ রয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩৮৪-৮৫)।* সম্ভবতঃ এর উপরে ভিত্তি করেই বিদ্বানগণ মাইয়েতকে ডান কাতে শোয়ানোকে উত্তম বলেছেন *(আল-মুহাল্লা ৩/৪০৪, মাসআলা ৬১৫)।* উছায়মীন (রহঃ) বলেন, মৃত ব্যক্তিকে চিৎ করে রেখে হাত দু'টি বুকের উপর রাখার বিষয়টি আমরা কোন বিদ্বান হ'তে অবগত নই *(ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃঃ ৪২)।*

প্রশ্ন (৫/২০৫) : খেলাফতের দায়িত্বে থাকা অবস্থায় আবুবকর (রাঃ) কর্তৃক জনৈকা বৃদ্ধার পরিচর্যার ঘটনাটি কি সত্য?

-ওছমান প্রামাণিক, বগুড়া।

উত্তর : ঘটনাটি প্রসিদ্ধ কিন্তু বিশুদ্ধ নয়। এ মর্মে একাধিক ঘটনা বর্ণিত হ'লেও এর কোনটি ভিত্তিহীন, কোনটির সনদ অত্যন্ত যঈফ। যেমন ইবনু আসাকির তার ইতিহাস গ্রন্থে আবু ছালেহ গেফারীর বর্ণনাসূত্রে এ ঘটনাটি সংকলন করেছেন *(তারীখু ইবনু আসাকির ৩০/৩২২)।* অথচ তিনি আবুবকর বা ওমর (রাঃ) এমনকি আলী (রাঃ)-এর যুগও পাননি *(তাহযীবুত তাহযীব ৪/৫৯)।* আরেক বর্ণনাকারী হাজ্জাজ বিন শাদ্দাদ অপরিচিত। ইবনু কাত্ত্বান বলেন, হাজ্জাজ-এর অবস্থা জানা যায় না *(তাহযীবুত তাহযীব ২/২০২)।* অপর বর্ণনাকারী রিশদীন বিন সা'দ অত্যন্ত যঈফ। ইমাম নাসাঈ, আহমাদ, ইবনু সা'দ, আবু হাতেম, আবু যুর'আ প্রমুখ তাকে যঈফ বলেছেন *(তাহযীবুত তাহযীব ৩/২৪০-২৪১)।* এছাড়া ইবনু সা'দ তার ত্বাবাকাতে অনুরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেটি নিতান্তই যঈফ *(ত্বাবাকাতে কুবরা ৩/১৩৮, ৩০/৩২৪; তাহযীবুত তাহযীব ৩/৩২৩-৩২৬)।* অতএব আবুবকর (রাঃ) থেকে এরূপ কোন ঘটনার সত্যতা নেই।

প্রশ্ন (৬/২০৬) : স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর কতদিন পর্যন্ত খোরপোষ দেওয়ার শারঈ নির্দেশনা রয়েছে?

-মুনীরুল শেখ, পাকুড়, ঝাড়খণ্ড, ভারত।

উত্তর : স্বামী স্ত্রীকে রাজঈ তালাক দিলে ইদ্দতকাল পর্যন্ত খোরপোষ দিবে *(নাসাঈ হা/৩৪০৩; ছহীহাহ হা/১৭১১; আল-ইসতিযকার ১৮/৬৯)।* আর তালাকপ্রাপ্তা তিন তালাক বায়েন হয়ে গেলে তাকে কোন খোরপোষ দিতে হবে না *(মুসলিম হা/১৪৮০; মিশকাত হা/৩৩২৪; ছহীহুল জামে' হা/৭৫৫১)।* তবে স্ত্রী গর্ভবতী হ'লে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তালাক প্রদানকারী স্বামীকে তার খোরপোষের ব্যবস্থা করতে হবে ও দুধ পান

Contents

করালে তাকে উপযুক্ত মজুরী দিতে হবে *(ত্বালাক ৬৫/০৪)*। অপর দিকে খোলা' প্রাপ্তা নারী কোন খোরপোষ পাবে না *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৮৮১৪, ১৮৪৯৭)*।

প্রশ্ন (৭/২০৭) : অনেক মুছল্লীকে দেখা যায়, ইমাম রুকূতে যাওয়ার পর জামা'আতে যোগ দিয়ে রাক'আত গণ্য হওয়ার আশায় ইমাম রুকূ থেকে উঠার আগ পর্যন্ত দ্রুত সূরা ফাতিহা পাঠ করে রুকূতে যায়। এরূপ করা শরী'আতসম্মত কি?

-মুহাইমিন, শেখপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত অবস্থায় ইমামের অনুসরণ করার জন্য সরাসরি তাকবীর দিয়ে রুকূতে যেতে হবে। কারণ ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাকে অনুসরণের জন্য *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা যখন ছালাতে আসবে আর ইমামকে রুকূ' অবস্থায় পাবে, তখন রুকূতে যাবে। আর সিজদা অবস্থায় পেলে সিজদায় চলে যাবে *(বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/২৪০৯; ইরওয়া হা/৪৯৬; ছহীহাহ হা/১১৮৮)*।

প্রশ্ন (৮/২০৮) : চোখ-মুখ ঢেকে ছালাত আদায়ে কোন বাধা আছে কি?

-আব্দুল করীম, ঝিনাইদহ।

উত্তর : চোখ-মুখ ঢেকে ছালাত আদায় করা যাবে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের মধ্যে মুখ ঢেকে রাখতে নিষেধ করেছেন *(ইবনু মাজাহ হা/৯৬৬; মিশকাত হা/৭৬৪, সনদ হাসান)*। তবে গায়ের মাহরাম পুরুষ আগমনের সম্ভাবনা থাকলে নারীরা মুখমণ্ডল আবৃত করে ছালাত আদায় করবে *(ফাতাওয়া মারআতুল মুসলিমা ১/৩১৫)*।

প্রশ্ন (৯/২০৯) : 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাওম' অংশটুকু কি আযান প্রচলনের শুরু থেকেই ফজরের আযানের সাথে যুক্ত ছিল, না পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছে?

-মুহাম্মাদ তৈমুর রহমান, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এটা পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছে। বেলাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা তিনি ফজরের আযান দেওয়ার জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আসলেন। তাকে বলা হ'ল যে, তিনি ঘুমিয়ে আছেন। তখন বেলাল (রাঃ) বললেন, اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (ঘুম থেকে ছালাত উত্তম)। অতঃপর এই শব্দাবলী ফজরের আযানের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হ'ল এবং বিষয়টি এভাবেই সাব্যস্ত হয়ে গেল' *(ইবনু মাজাহ হা/৭১৬, সনদ ছহীহ)*। উল্লেখ্য যে, যে কারণেই চালু হোক না কেন আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের অনুমোদন পাওয়া ব্যতীত তা শরী'আত হিসাবে গণ্য হয় না। ওমর (রাঃ) ও অন্যান্য ছাহাবীদের প্রস্তাবক্রমে এমনকি কুরআনের কয়েকটি আয়াতও নাযিল হয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে, ছাহাবীগণের কথাই কুরআন বা হাদীছ। অতএব আযানের বিষয়টি রাসূল (ছাঃ)-এর নিয়মিত সুন্নাত হিসাবে গৃহীত।

প্রশ্ন (১০/২১০) : আমরা জানি বিতর ছালাতের পর অন্য কোন ছালাত নেই। এক্ষণে এসময় জানাযার ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-জুয়েল রেযা, কাঁদাকাটি, সাতক্ষীরা।

উত্তর : বিতরের পর কারণবশতঃ যেকোন ছালাত এসময় আদায় করা যেতে পারে। যেমন রাতের শেষ প্রহরে ঘুম না ভাঙ্গার আশংকা থাকলে রাতের প্রথম ভাগে বিতর ছালাতের পর দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করা যায়, যা তাহাজ্জুদের স্থলাভিষিক্ত হয় *(দারেমী, মিশকাত হা/১২৮৬; ছহীহাহ হা/১৯৯৩)*।

প্রশ্ন (১১/২১১) : মুসলিম বা অমুসলিম দেশের সরকার শরী'আত বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকলে তার বিরুদ্ধে সে দেশের মুসলিম নাগরিক বা প্রবাসীদের করণীয় কি?

-আবুল কালাম, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : এক্ষেত্রে কর্তব্য হ'ল (১) উত্তম পন্থায় অন্যায়ের প্রতিবাদ করা *(মুসলিম হা/৪৯, মিশকাত হা/৫১৩৭)*। (২) দেশে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য জনমত গঠন করা এবং বৈধপন্থায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো *(রা'দ ১৩/১১)*। (৩) বিভিন্ন উপায়ে সরকারকে নছীহত করা *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৬)*। (৪) সরকারের হেদায়াতের জন্য দো'আ করা *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৫৯৯৬)*। (৫) সরকারের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র নিকটে কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করা *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১২৮৯)*। (৬) প্রয়োজনে হিজরত করা। যেমন রাসূল (ছাঃ) দাওয়াতের প্রথম দিকে যখন মক্কার মুসলিমদের উপর কাফেররা চরম নির্যাতন করছিল, তখন তিনি তাদেরকে পার্শ্ববর্তী ন্যায়নিষ্ঠ খ্রিষ্টান রাজা নাজাশীর হাবশা রাজ্যে তাদেরকে হিজরত করার নির্দেশ দেন *(বায়হাক্বী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩১৯০)*। (৭) আর মুসলিম সরকারের সুস্পষ্ট কুফরী প্রমাণিত হ'লে, শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা কল্যাণকর হবে কি-না, সে বিষয়ে অবশ্যই দেশের নির্ভরযোগ্য বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম পরামর্শ করে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং মুসলিম নাগরিকগণ তাদের অনুসরণ করবেন। বিদ্রোহ করায় কল্যাণের চেয়ে যদি অকল্যাণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে, তাহ'লে বিদ্রোহ করা যাবে না। বরং ধৈর্যধারণ করতে হবে, যতক্ষণ না আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন ফায়ছালা নাযিল হয় *(বাক্বারাহ ১০৯, তওবা ২৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, শাসকের নিকট থেকে কেউ অপসন্দনীয় কিছু দেখলে যেন সে ধৈর্যধারণ করে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬৭)*। তিনি বলেন, এমতাবস্থায় তাদের হক তাদের দাও এবং তোমাদের হক আল্লাহ্র কাছে চাও' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৭২)*। 'কেননা তাদের পাপ তাদের উপর এবং তোমাদের পাপ তোমাদের উপর বর্তাবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭৩)*। তিনি বলেন, তোমরা তাদের হক দিয়ে দাও। কেননা আল্লাহ শাসকদেরকেই জিজ্ঞেস করবেন তাদের শাসন সম্পর্কে *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৭৫)*।

প্রশ্ন (১২/২১২) : নওমুসলিম সন্তান অমুসলিম পিতার সম্পদের অংশীদার হ'তে পারবে না। এক্ষণে পিতার মৃত্যুর পর স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত সকল সম্পদ দান করে দিতে হবে কি?

-তাওসীফুর রহমান, ঢাকা।

উত্তর : মুসলিম সন্তান কাফের পিতার সম্পদের অংশীদার হবে না *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৩০৪৩)*। তবে বিনা কামনায়

Contents

প্রাপ্ত সম্পদ পুনরায় ফেরত দেওয়ার বা দান করে দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন (১৩/২১৩) : রাসূল (ছাঃ) কি কখনো আযান দিয়েছেন? না দিলে তার কারণ কি?

-এস.কে. আযহার, কলিকাতা, ভারত।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর আযান দেওয়ার ব্যাপারে কোন ছহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। একবার সফরে তিনি আযান দিয়েছিলেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(তিরমিযী হা/৪১১; আহমাদ হা/১৭৬০৯; যঈফাহ হা/৬৪৩৪)*। রাসূল (ছাঃ) এমনকি খোলাফায়ে রাশেদীন আযান না দেওয়ার বহু কারণ রয়েছে। যেমন (১) রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইমাম যিম্মাদার আর মুওয়াযযিন আমানতদার *(আবুদাঊদ হা/৫১৭; মিশকাত হা/৬৬৩)*। তাই রাসূল (ছাঃ) নিয়মিতভাবে আমানত আদায়ে সক্ষম এরূপ ব্যক্তির নিকটে আযান দেওয়ার আমানত অর্পণ করেছিলেন। (২) আযানের মূল উদ্দেশ্য লোকদের কাছে ছালাতের আহ্বান পৌঁছানো। এজন্য রাসূল বড় বড় ছাহাবীদের বাদ দিয়ে এমনকি যিনি আযানের শব্দগুলো স্বপ্নে দেখেছিলেন তাকে বাদ দিয়ে কণ্ঠস্বর উঁচু হওয়ায় বেলাল (রাঃ)-কে আযানের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন *(আবুদাঊদ হা/৪৯৯; ইবনু মাজাহ হা/৭০৬; মিশকাত হা/৬৫০, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১৪/২১৪) : আমি বিভিন্ন সমস্যার কারণে নবম-দশম শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের একত্রে প্রাইভেট পড়াই। মেয়েরা ওড়না পরে আসে। এভাবে প্রাইভেট পড়ানো আমার জন্য জায়েয হবে কি?

-আনীস খান, দিনাজপুর।

উত্তর : প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের একসাথে পড়াশুনা করা সম্পূর্ণরূপে শরী'আতবিরোধী কাজ *(আহযাব ২৪/৫৩)*। এছাড়াও এটি মানুষের স্বভাব ধর্মের বিরোধী এবং পারস্পরিক নীতিবোধের জন্য চরম ক্ষতিকর। আধুনিক বংশধরগণের মধ্যে অশ্লীলতা প্রসারের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হ'ল প্রচলিত সহশিক্ষা। অতএব ছেলে-মেয়েদের পৃথক পৃথকভাবে পড়াতে হবে। মেয়েদের পড়ানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই পর্দার অন্তরাল থেকে পড়াতে হবে যেন তাদের অবয়ব দেখা না যায়। তবে কোনক্রমেই একাকী কোন প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে পড়ানো যাবে না। বরং মাহরাম সহ অথবা কয়েকজনকে একসাথে পড়াতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন পরপুরুষ যদি কোন পরনারীর সঙ্গে নির্জনে মিলিত হয়, তাহ'লে সেখানে তৃতীয়জন উপস্থিত হয়, যার নাম শয়তান' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১১৮)*।

প্রশ্ন (১৫/২১৫) : আমাদের মসজিদের ইমাম ছাহেব প্রত্যেক জুম'আর দিন ফজরের ছালাতের ২য় রাক'আতে হাত তুলে দো'আ করেন। এটা শরী'আতসম্মত কি?

-ইউসুফ আলী, কান্তনগর পূর্বপাড়া, নাটোর।

উত্তর : বিশেষ কারণবশতঃ কুনূতে নাযেলাহ যে কোন ওয়াক্তেই পাঠ করা যায় *(বুখারী হা/৭৯৭; মুসলিম হা/৬৭৮; নাসাঈ হা/১০৭৬)*। রাসূল (ছাঃ) দীর্ঘ এক মাস যাবৎ এ দো'আ পাঠ করেছিলেন *(বুখারী হা/১০০২,৪০৯৪; মুসলিম হা/৬৭৭; মিশকাত হা/১২৮৯-৯০)*। কিন্তু কোন দিন নির্ধারণ করেননি। অতএব জুম'আর দিন ফজরের ছালাতে নিয়মিতভাবে এটি পাঠ করা বিদ'আত। ইমাম নাখঈ, তাঊস, মাকহূল প্রমুখ বিদ্বানগণ জুম'আর দিনকে কুনূতে নাযেলাহ পাঠের জন্য নির্দিষ্ট করাকে বিদ'আত বলেছেন *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৫৪৫৫-৫৭)*। সুতরাং এভাবে নির্দিষ্ট না করে প্রয়োজনমত যেকোন দিন যেকোন ওয়াক্তে এটা পাঠ করা যাবে।

প্রশ্ন (১৬/২১৬) : নারীদের কসমেটিকস সামগ্রীর ব্যবহার করায় কোন বাধা আছে কি?

-ছাকিব, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তর : নারীরা গৃহাভ্যন্তরে পর্দার মধ্যে নিজেকে সুসজ্জিত করার লক্ষ্যে কসমেটিকস ব্যবহার করতে পারে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৪৪৩)*। আয়েশা (রাঃ)-কে বাসর রাতের জন্য সাজানো হয়েছিল *(ইবনু মাজাহ, হা/১৮৭৬; আলবানী, আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ১৯)*। তবে পবিত্রতা ও শালীনতার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আর শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পানি প্রবেশে বাধা সৃষ্টিকারী কোন বস্তু যেমন পুরু নেইল পালিশ ব্যবহার করা যাবে না। কেননা ওযূ-গোসলের ক্ষেত্রে দেহের সামান্য কোন স্থান শুকনা থাকলেও পবিত্রতা অর্জিত হয় না *(মুসলিম হা/২৪৩, সুবুলুস সালাম হা/৫০)*। এছাড়া সুগন্ধিযুক্ত সামগ্রী ব্যবহার করে নারীদের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ *(নাসাঈ হা/৫১২৬; সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (১৭/২১৭) : জনৈক আলেম বলেন, সিজদা দু'প্রকার। সম্মানের সিজদা ও ইবাদতের সিজদা। মানুষ মানুষকে সম্মান দেখিয়ে সিজদা করতে পারে। যেমন ফেরেশতাগণ আদম (আঃ)-কে সিজদা করেছিলেন। এর কোন সত্যতা আছে কি?

-ডা. আব্দুল্লাহ রোমান, ফুলতলা, বগুড়া।

উত্তর : কথাটি সম্পূর্ণ শরী'আত বিরোধী। মুহাম্মাদী শরী'আতে এটি সম্পূর্ণ হারাম করা হয়েছে। এভাবে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের প্রতি সিজদা করার দূরতম সম্ভাবনাকেও মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। একবার মু'আয (রাঃ) খ্রিষ্টানদের দেখাদেখি রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি সম্মানের সিজদা করতে চাইলে তিনি বলেন, তোমরা এটা করো না। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে যদি সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহ'লে স্ত্রীকে তার স্বামীর প্রতি সিজদা করার নির্দেশ দিতাম।... *(আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৩; ছহীহাহ হা/১২০৩)*। সুতরাং সম্মান ও ইবাদতের সিজদাকে পৃথক করে দেখানোর কোন সুযোগ নেই।

প্রশ্ন (১৮/২১৮) : একই ঘরে পৃথক বিছানায় পিতা ও প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে অথবা ভাই ও বোন থাকতে পারবে কি?

-মাহমুদুল হাসান, ঈশ্বরদী, পাবনা।

উত্তর : পিতা ও পুত্র পারবে। হাদীছে বিছানা পৃথক করতে বলা হয়েছে, ঘর নয় *(আহমাদ হা/৬৭৫৬, ৬৬৮৯; মিশকাত হা/৫৭২ 'ছালাত' অধ্যায়)*। কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক নারী ও পুরুষকে পৃথক পৃথক ঘরে অবস্থান করাই কর্তব্য।

প্রশ্ন (১৯/২১৯) : নববী যুগের ন্যায় ছাদে না দাঁড়িয়ে মাইকের মাধ্যমে আযান দেওয়া যদি বিদ'আত না হয়, তবে তাসবীহ গণনার ক্ষেত্রে কোন যন্ত্র বা তাসবীহ দানা ব্যবহার

Contents

করা নিষেধ হওয়ার কারণ কি?

-আহসানুল্লাহ, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : আযানের মূল উদ্দেশ্য লোকদের কাছে ছালাতের আহ্বান পৌঁছানো। সেকারণ রাসূল (ছাঃ) উঁচু কণ্ঠস্বরের অধিকারী হওয়ায় বেলাল (রাঃ)-কে আযানের দায়িত্ব দিয়েছিলেন *(আবুদাঊদ হা/৪৯৯; ইবনু মাজাহ হা/৭০৬; মিশকাত হা/৬৫০, সনদ ছহীহ)*। একই উদ্দেশ্যে সেসময় মসজিদের বাইরে কোন উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া হ'ত *(আবুদাঊদ হা/৫১৯; ইরওয়া হা/২২৯)*। অতএব আযানের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য মাইক ব্যবহার বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

অন্যদিকে আঙ্গুলের মাধ্যমে তাসবীহ গণনার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ এবং তাসবীহ দানা দ্বারা গণনার ব্যাপারে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যেমন তিনি বলেন, 'তোমরা আঙ্গুলের মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ কর। কেননা আঙ্গুল সমূহ জিজ্ঞাসিত হবে এবং তারা কথা বলবে' *(তিরমিযী হা/৩৫৮৩; আবুদাঊদ হা/১৫০১-০২; মিশকাত হা/২৩১৬)*। একদা ইবনু মাসঊদ (রাঃ) জনৈক মহিলাকে তাসবীহ দানা দ্বারা গণনা করতে দেখে তা নিয়ে ছিঁড়ে দূরে নিক্ষেপ করেন। অতঃপর নুড়ি-পাথর দিয়ে তাসবীহ গণনাকারী জনৈক ব্যক্তিকে পা দিয়ে মৃদু আঘাত করে ধমক দিয়ে বললেন, অগ্রগামী হয়ে পড়েছ, এক অন্ধকারচ্ছন্ন বিদ'আতে লিপ্ত হয়ে পড়েছ, না-কি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের চেয়ে বেশী জ্ঞানী হয়ে গেছ'? *(ইবনু ওয়াযযাহ, আল-বিদ'উ হা/২১; সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৩-এর আলোচনা দ্রঃ)*। অতএব মাইকে আযান দেওয়ার সাথে তাসবীহ গণনার তুলনা করার কোন সুযোগ নেই।

প্রশ্ন (২০/২২০) : পাঁচবছর পূর্বে স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে রাজ'আত করেছিল। কিছুদিন পূর্বে উক্ত স্ত্রীকে গর্ভবতী অবস্থায় দুই তালাক দিয়েছে। এক্ষণে পুনরায় ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে স্বামীর করণীয় কি?

-রফীকুল ইসলাম মোল্লা, শ্রীপুর, গাযীপুর।

উত্তর : পূর্বে প্রদত্ত তালাকটি ধর্তব্য হবে এবং দ্বিতীয় বারের দু'তালাক যদি একই বৈঠকে সংঘটিত হয়ে থাকে, তাহ'লে এটা এক তালাক হিসাবে গণ্য হবে *(মুসলিম হা/১৪৭২-৭৩; আবুদাঊদ হা/২১৯৬)*। অতএব মোট দু'তালাক হওয়ায় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ায় বাধা নেই *(বাক্বারাহ ২/২২৯)*। তবে যদি ইদ্দতকাল তথা তালাক প্রদানের দিন থেকে তিন মাস অতিক্রান্ত হয় অথবা গর্ভবতী অবস্থায় তালাক দেওয়ার পর গর্ভ খালাস হয়ে যায়, তাহ'লে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে হবে *(বাক্বারাহ ২৩২; তালাক ১; বুখারী হা/৫১৩০)*।

প্রশ্ন (২১/২২১) : পিতা দ্বিতীয় বিবাহ করে ১৫ বছর পূর্বে আমাদের ছেড়ে চলে যান। এর মধ্যে আমাদের কখনো খোঁজ নেননি বা কোন প্রকার খরচও বহন করেননি। বর্তমানে তার সন্ধান পাওয়া গেছে। এক্ষণে আমরা কি তাকে গ্রহণ করব, না বাড়ী থেকে বের করে দিব?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, মাটিয়ানী, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : পিতাকে আশ্রয় দিতে হবে। পিতা-মাতা সর্বাবস্থায় সদ্ব্যবহার পাওয়ার হকদার *(ইসরা ১৪/২৩,২৪)*। এমনকি তারা শিরক করার জন্য চাপ দিলে তাদের আনুগত্য করা যাবে না, কিন্তু তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে *(লোক্বমান ৩১/১৪-১৫)*। আর পিতা তাঁর দায়িত্বে অবহেলার কারণে গোনাহগার হবেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫)*।

প্রশ্ন (২২/২২২) : পেশাব বা পায়খানা করার পর ওযূ করা যরূরী কি?

-আব্দুল হাই, ভারুয়াখালী, জামালপুর।

উত্তর : ওযূ করা যরূরী নয়। তবে সর্বদা ওযূ অবস্থায় থাকা নিঃসন্দেহে উত্তম কাজ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক' *(মুসলিম হা/২২৩; মিশকাত হা/২৮১)*। তিনি আরো বলেন, ওযূ করার মাধ্যমে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে ছগীরা গুনাহ ঝরে যায় *(মুসলিম হা/২৪৫; মিশকাত হা/২৮৪)*।

একদিন ফজরের পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেলালকে ডেকে বললেন, কোন কাজ তোমাকে আমার আগে আগে জান্নাতে নিয়ে যাচ্ছে? কেননা যখনই আমি জান্নাতে প্রবেশ করি, তখনই আমার আগে আগে তোমার গমনের আওয়ায শুনি। জবাবে বেলাল বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আযান দিলেই তার পরে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করি এবং যখনই ওযূ নষ্ট হয় তখনই ওযূ করি এবং মনে করি যেন আমার উপরে আল্লাহ্‌র জন্য দু'রাক'আত ছালাত আবশ্যিক হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ, এজন্যই হ'তে পারে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩২৬; কাছাকাছি একই মর্মের হাদীছ মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩২২ নফল 'ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

এমনকি রাতে শোয়ার সময়ও যে ব্যক্তি ওযূ করে শয়ন করে, তাঁর সাথে একজন ফেরেশতা থাকে এবং সে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত দো'আ করতে থাকে যে, হে আল্লাহ! তোমার অমুক বান্দাকে তুমি ক্ষমা কর। কেননা সে ওযূ অবস্থাতেই শয়ন করেছে *(ইবনু হিব্বান হা/১০৫১, ছহীহাহ হা/২৫৩৯)*।

প্রশ্ন (২৩/২২৩) : রাবে'আ বছরী সম্পর্কে জানতে চাই।

-ফাহীমা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : তার নাম উম্মে খায়ের রাবে'আ বিনতে ইসমাঈল আল-'আদাবী। তিনি আনুমানিক ১০০ হিঃ/৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের বছরা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে মাতা-পিতা মারা যাওয়ায় তাকে দাসত্ববরণ করতে হয়। তিনি সংসার বিরাগী ইবাদতগুযার মহিলা ছিলেন। তার সাথে সুফিয়ান ছাওরী, শো'বা ও হাসান বছরীর মত প্রখ্যাত তাবেঈদের সাক্ষাৎ ঘটেছিল। কথিত আছে যে, তিনি সারা রাত নফল ছালাত আদায় করে কাটিয়ে দিতেন। তবে তার প্রতি ছূফীবাদের যে সম্পর্ক করা হয়, তা পরবর্তীতে সুবিধাবাদী ছূফীবাদীদের অপপ্রচার মাত্র। তিনি ১৮৫ হিঃ/৮০১ খ্রিষ্টাব্দে ৮০ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। তবে আবুদাউদ সিজিস্তানী তাকে অগ্নিপূজক বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, হয়ত তার ব্যাপারে তার নিকট এমন সংবাদ পৌঁছেছিল, যার কারণে এমন মন্তব্য করেছিলেন। তবে তিনি ছিয়াম পালন ও রাতে নফল ছালাত আদায় করতেন। হাফেয যাহাবী সিজিস্তানীর মন্তব্যের

Contents

প্রতিবাদ করে তার ব্যাপারে এটা বাড়াবাড়ি এবং অজ্ঞতা বলে আখ্যায়িত করেছেন *(যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৮/২৪১-২৪৩; তারীখুল ইসলাম ১১/১১৭-১১৮; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ১০/১৮৬; ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া ৪/২৭-৩২)*।

প্রশ্ন (২৪/২২৪) : পুরুষ ইমামের পিছনে মহিলারা কিভাবে ছালাতে দাঁড়াবে? এছাড়া কেবল দু'জন পুরুষ ও একজন নারী হ'লে কিভাবে জামা'আত করবে?

-বুলবুল ইসলাম, জয়পুরহাট।*
** [নাম ঠিক করুন (স.স.]*

উত্তর : মহিলারা একাকী হৌক বা একাধিক হৌক, পুরুষ ইমামের পিছনে পৃথক কাতারে দাঁড়াবে। আনাস (রাঃ) বলেন, 'আমি ও একজন ইয়াতীম ছেলে আমাদের বাড়ীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করেছিলাম। আর আমার মা আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করেছিলেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১০৮)*।

প্রশ্ন (২৫/২২৫) : পিতা-মাতার বিচ্ছেদের পর কোন সন্তান পিতা বা মাতা যেকোন একজনের তত্ত্বাবধানে বড় হওয়ার পর উভয়ের সম্পদেই কি সে অংশীদার হবে?

-নাঈম, সোনাতলা, বগুড়া।

উত্তর: বিবাহের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া সন্তান পিতা-মাতা উভয়ের সম্পত্তির অংশীদার হবে *(নিসা ৪/১১)*। কার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হয়েছে সম্পদের অংশ পাওয়ার ক্ষেত্রে সেটি ধর্তব্য নয়।

প্রশ্ন (২৬/২২৬) : কৃপণ পিতার সম্পদ থেকে তাকে না জানিয়ে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় খরচ যেমন পড়াশুনা, পোষাক ইত্যাদি চাহিদা পূরণের জন্য কিছু নেওয়া যাবে কি?

-মতীউর রহমান
কুওয়াতুল ইসলাম মাদ্রাসা, কুষ্টিয়া।

উত্তর : স্ত্রী-সন্তানের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা স্বামী বা পিতার কর্তব্য। সে হিসাবে কৃপণ পিতার সম্পদ থেকে ন্যায়সঙ্গতভাবে কিছু গ্রহণ করা সন্তানের জন্য জায়েয। হিন্দা বিনতে উতবা বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আবু সুফিয়ান একজন অতি কৃপণ ব্যক্তি। আমি তাকে না জানিয়ে তার সম্পদ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়ে আমার ও আমার সন্তানদের জন্য খরচ করতে পারি কি? উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যথেষ্ট হয়, এ পরিমাণ সম্পদ ন্যায়সঙ্গতভাবে নিতে পার *(বুখারী হা/২২১১; মুসলিম হা/১৭১৪; মিশকাত হা/৩৩৪২)*।

প্রশ্ন (২৭/২২৭) : 'আখেরী চাহার সোম্বা' কাকে বলে। শরী'আতে এরূপ কোন দিবসের অনুমোদন আছে কি?

-নাঈমুর রহমান নাঈম।

উত্তর : 'আখেরী চাহার সোম্বা' কথাটি ফার্সী। এর অর্থ ছফর মাসের শেষ বুধবার। ইরান, ইরাক, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে এটি দিবস হিসাবে পালিত হয়ে থাকে। এর ভিত্তি হ'ল- মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে বুধবার রাসূল (ছাঃ)-এর দেহের উত্তাপ ও মাথাব্যথা খুব বৃদ্ধি পায়। তাতে তিনি বারবার বেহুঁশ হয়ে পড়তে থাকেন। অতঃপর তাঁর মাথার উপরে পানি ঢালা হ'লে তিনি একটু হালকা বোধ করলে মসজিদে গিয়ে যোহরের ছালাত আদায় করেন এবং মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন' *(বুখারী হা/৪৪৪২; ইবনু হিশাম ২/৬৪৯)*। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উক্ত দিবস ঘটা করে পালন করা হয় এবং সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়। অথচ এটি সম্পূর্ণরূপে বিদ'আতী প্রথা। ছাহাবায়ে কেরামের যামানায় এরূপ প্রথার কোন অস্তিত্ব ছিল না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কেউ যদি এমন কোন আমল করে, যার প্রতি আমাদের নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮; মিশকাত হা/১৪০)*।

প্রশ্ন (২৮/২২৮) : পরীক্ষার পূর্বরাতে বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে স্পেশাল সাজেশন পাওয়া যায়, যা থেকে সর্বাধিক সংখ্যক কমন পাওয়া যায়। এসব সাজেশন নেওয়া জায়েয হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বরিশাল।

উত্তর : প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে এরূপ সাজেশন দেওয়া হয় বলে নিশ্চিত ধারণা হ'লে, তা গ্রহণ করা জায়েয নয়। কারণ শরী'আতে অন্যায় কাজে সাহায্য করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (২৯/২২৯) : মানুষের নেক আমলের ক্ষেত্রে বলা হয় যে শেষ ভালো যার, সব ভালো তার। এটি কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত? ছহীহ হ'লে সকল ফাঁসির আসামী কি জান্নাতবাসী হবে বলে আশা করা যায়?

-রফীকুল ইসলাম, ভালুকা, ময়মনসিংহ।

উত্তর : এটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সর্বশেষ কর্মের উপর সকল আমল নির্ভরশীল' *(বুখারী হা/৬৪৯৩; মিশকাত হা/৮৩)*। আর ফাঁসির আসামী হ'লেই যে তিনি জান্নাতী হবেন তা বলার কোন সুযোগ নেই। বান্দার মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পর কৃত তওবা আল্লাহ কবুল করেন না। আল্লাহ বলেন, আর ঐসব লোকদের তওবা কবুল হবে না, যারা মন্দ কর্ম করতেই থাকে, যতক্ষণ না তাদের কারু মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং বলে, আমি এখন তওবা করছি *(নিসা ৪/১৮)*। তবে যদি সত্যিকারের মুসলিম হন এবং খাঁটি হৃদয়ে তওবা করেন এবং আল্লাহ তা কবুল করেন, তাহ'লে তিনি জান্নাতী হবেন ইনশাআল্লাহ। বনু ইসরাঈলদের জনৈক ব্যক্তি একশ' ব্যক্তিকে হত্যা করে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন *(বুখারী হা/৩৪৭০; মুসলিম হা/২৭৬৬; মিশকাত হা/২৩২৭)*।

প্রশ্ন (৩০/২৩০) : জনৈক পিতা ৪ মেয়েকে বাদ দিয়ে ছেলের নামে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও জমি-জমা লিখে দিয়ে মারা গেছেন। এক্ষণে এর পরিণতি কি এবং তাকে শাস্তি ভোগ থেকে বাঁচানোর উপায় কি?

-ফাহিম মুনতাছির, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টনে কমবেশী করায় উক্ত পিতা কঠিন গুনাহগার হবেন। ক্বিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক পরিমাণ যমীন বেড়ি রূপে পরিয়ে দেওয়া হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৯৩৮)*। জেনেশুনে উক্ত সম্পদ ভোগ করলে সন্তানরাও গুনাহগার হবে। এক্ষণে নিজেদের বাঁচা ও

Contents

পিতাকে বাঁচানোর জন্য সন্তানদের অবশ্য কর্তব্য হ'ল, শরী'আত সম্মতভাবে পুরো সম্পদ হকদারদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া এবং পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। এর ফলে পিতার উক্ত গোনাহ ক্ষমা হবে ইনশাআল্লাহ *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫৯৮; মিশকাত হা/২৩৫৪)*।

প্রশ্ন (৩১/২৩১) : সূরা তীন পড়া শেষে 'বালা ওয়া 'আলা আনা যালিকা মিনাশ শাহিদীন' পড়তে হবে কি?

-দাবীরুল ইসলাম, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আহমাদ হা/১৪২১; আবুদাঊদ হা/৮৮৭; মিশকাত হা/৮৬০, আলবানী, আরনাউত্ব, সনদ যঈফ)*।

প্রশ্ন (৩২/২৩২) : দুই জন মুছল্লী জামা'আত শুরু করার পর আরেকজন যোগ দিলে ইমাম সামনে চলে যাবে, না মুক্তাদীরা পিছনে চলে আসবে?

-আব্দুল ওয়াকীল, মালদহ, ভারত।

উত্তর : ইমাম সম্ভবপর পিছনে জায়গা রেখে ছালাত শুরু করবেন, যাতে পরবর্তীতে যোগদানকারী মুছল্লী পিছনে কাতার দিতে পারে। অতঃপর মাসবূক মুছল্লী ইমামের সাথে ছালাতরত মুক্তাদীকে পিছনে টেনে নিয়ে কাতার দিবেন। আর সে যদি অজ্ঞতার কারণে ইমামের পাশেই দাঁড়িয়ে যায়, তবে ইমাম উভয়কে পিছনে ঠেলে দিবেন। জাবের (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতে দাঁড়ালেন, আর আমি এসে তাঁর বাম দিকে দাঁড়ালাম। তিনি আমার হাত ধরে ঘুরিয়ে তাঁর ডান দিকে দাঁড় করালেন। অতঃপর জাব্বার ইবনু সাখর এসে রাসূল (ছাঃ)-এর বাম দিকে দাঁড়াল। এসময় তিনি আমাদের উভয়ের হাত ধরলেন এবং ঠেলে আমাদেরকে তাঁর পিছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন *(মুসলিম হা/৩০১০, মিশকাত হা/১১০৭)*। আর এসময় ইমাম সামনে যাওয়ার কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে ওযরবশতঃ সামনে যাওয়ায় কোন বাধা নেই *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৮/২২)*।

প্রশ্ন (৩৩/২৩৩) : কারণবশতঃ এলাকার মসজিদে ছালাত আদায় না করে দূরের কোন মসজিদে আদায় করলে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-এস.কে. আযহার, কলিকাতা, ভারত।

উত্তর : কোন বাধা নেই। বিশেষতঃ অধিক পদচারণা এবং বড় জামা'আতে ছালাত আদায়ের মাধ্যমে অধিক নেকী লাভের আশায় এরূপ করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ছালাতের নেকী অর্জনের ব্যাপারে ঐ ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা নেকীর ভাগিদার, যে অধিক দূর থেকে আগমনকারী *(বুখারী হা/৬৫১, মিশকাত হা/৬৯৯)*। তিনি বলেন, একাকী পড়ার চেয়ে দু'জনে, দু'জনের চেয়ে তিন জনে ছালাত আদায় করা উত্তম। এভাবে যত মুছল্লী বেশী হবে, ততই তা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রিয়তর হবে *(আবুদাঊদ হা/৫৫৪, মিশকাত হা/১০৬৬)*। মু'আয (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মসজিদে নববীতে এশার ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর নিজ এলাকায় এসে পুনরায় উক্ত ছালাতের ইমামতি করতেন *(বুখারী হা/৭০১, মিশকাত হা/১১৫০)*। অতএব যত্রতত্র মসজিদ নির্মাণ না করে বড় বড় জামা'আতগুলোকে সম্ভবপর টিকিয়ে রাখা কর্তব্য। তবে আক্বীদাগত কারণে পৃথক মসজিদ নির্মাণে ও দূরে হ'লেও সেখানে যাওয়ায় কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (৩৪/২৩৪) : কোন কোন ক্ষেত্রে গীবত করা যায়?

-ইহসানুল হক, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : গীবত করা হারাম *(হুজুরাত ৪৯/১২)*। এর ক্ষতিকর প্রভাবে ব্যক্তি থেকে সমাজের সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে স্রেফ ইছলাহের উদ্দেশ্যে ও নেকীর আশায় জনকল্যাণার্থে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমালোচনা করা যায়। যেটা আসলে গীবত নয়। বরং সত্য তুলে ধরা। যেমন (১) অত্যাচারীর অত্যাচার প্রকাশ করার জন্য (২) সমাজ থেকে অন্যায় দূর করা এবং পাপীকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য (৩) হাদীছের সনদ যাচাইয়ের জন্য (৪) মুসলিমদেরকে মন্দ থেকে সতর্ক করার জন্য (৫) পাপাচার ও বিদ'আত থেকে সাবধান করার জন্য (৬) প্রসিদ্ধ নাম বলে তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য *(নববী, রিয়াযুছ ছালেহীন, ২৫৬ অনুচ্ছেদ, পৃঃ ৫৭৫; মুসলিম হা/২৫৮৯ 'গীবত হারাম হওয়া' অনুচ্ছেদ, নববীর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (৩৫/২৩৫) : পরপর দু'বার গর্ভে সন্তান নষ্ট হয়ে গেছে। তৃতীয়বার যেন এরূপ না হয় সেজন্য শ্বাশুড়ী তাবীয দিয়েছেন। এক্ষণে আমার করণীয় কি? আর সন্তান হারানোর কারণে কি আমার পরকালীন কোন পুরস্কার আছে?

-খোকন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : তাবীয ব্যবহার করা সর্বাবস্থায় শিরক *(আহমাদ হা/১৬৯৬৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯২; মিশকাত হা/৪৫৫৬)*। আর আল্লাহ তা'আলা শিরকের গুনাহ মাফ করেন না *(নিসা ৪/৪৮)*। অতএব তাবীয ফেলে দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে। সাথে সাথে সন্তান লাভের জন্য যাকারিয়া (আঃ) কর্তৃক পঠিত দো'আ নিয়মিতভাবে পাঠ করতে হবে। (১) রব্বি লা তাযারনী ফারদাওঁ ওয়া আনতা খায়রুল ওয়ারিছীন (হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে (সন্তানহীনভাবে) একাকী ছেড়ে দিয়ো না। আর তুমিই তো সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী- *আম্বিয়া ২১/৮৯*) (২) রব্বি হাবলী মিল্লাদুনকা যুররিইয়াতান ত্বাইয়েবা (হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তোমার পক্ষ হ'তে একটি পূত-চরিত্র সন্তান দান কর- *আলে ইমরান ৩/৩৮*)।

সন্তান হারানোর পর আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট থাকলে প্রভূত নেকীর হকদার হবেন। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায় আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ফেরেশতাদের বলেন, তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানকে উঠিয়ে নিলে? তারা উত্তর করবে, হ্যাঁ প্রভু। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি তার অন্তরের ধনকে কেড়ে নিলে? তারা বলবেন, হ্যাঁ প্রভু। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, এতে আমার বান্দা কি বলল? তারা বললেন, তখন সে আপনার প্রশংসা করল এবং ইন্নালিল্লাহ বলল। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী কর এবং তার নাম

Contents

দাও 'বায়তুল হাম্দ' *(তিরমিযী হা/১০২১, মিশকাত হা/১৭৩৬, ছহীহাহ হা/১৪০৮)*।

প্রশ্ন (৩৬/২৩৬) : ছহীহ বুখারীতে 'যাব' নামক প্রাণী খাওয়া হালাল বলা হয়েছে। এর দ্বারা কোন প্রাণী বুঝায়?

-আব্দুর রঊফ, নওগাঁ।

উত্তর : 'যাব' (الضَّبُّ) সরীসৃপ জাতীয় বুকে ভর দিয়ে চলা একটি প্রাণী। যার শরীরের চামড়া পুরু ও অমসৃণ। লেজ চওড়া, খসখসে ও অধিক গিটবিশিষ্ট। আরব মরু অঞ্চলে এটি অধিকহারে পাওয়া যায় *(আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব)*। এটি দেখতে গুই সাপের ন্যায়, তবে গুইসাপ নয়। গুই সাপ আরবী 'ওয়ারাল' (الـوَرَلُ) নামক প্রাণীর সাথে হুবহু মিলে যায়। যা পানিতে ও স্থলে উভয় স্থানে বসবাস করে এবং বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ, সাপ ইত্যাদি ভক্ষণ করে। আরবরা এটি খায় না *(আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব)*। তবে যাব-এর সাথে সাদৃশ্যের কারণে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম যাব-এর ন্যায় ওয়ারাল বা গুইসাপ খাওয়াও জায়েয বলেছেন। সাঈদ বিন মুসাইয়িব (রহঃ)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি একে হালাল বলেন *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৮৭৪৭)*। এছাড়া ইবনু হাযম (রহঃ) এটিকে হালাল প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন *(মুহাল্লা ৫/২৫০)*। এসব প্রাণী রুচি হ'লে খাবে, না হ'লে খাবে না। কেননা রাসূল (ছাঃ) খাননি *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১১০-১১)*। যদিও তিনি প্রথমে নিষেধ করেছিলেন *(আবুদাঊদ হা/৩৭৯৬; ঐ, আওনুল মা'বূদ)*।

প্রশ্ন (৩৭/২৩৭) : জনৈক মৃত ব্যক্তির পরিবার তার রেখে যাওয়া ইসলামী ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ দিয়ে অতিকষ্টে জীবনযাপন করে। তারা নিজেরাই যাকাত পাওয়ার হকদার। এক্ষণে তাদের ডিপোজিটকৃত মূল টাকা থেকে যাকাত বের করতে হবে কি?

-সেতাউর রহমান, ইয়াম্বু, সঊদী আরব।

উত্তর : প্রথমতঃ কোন ব্যাংকেই টাকা রেখে লভ্যাংশ ভোগ করা যাবে না। কারণ উক্ত লভ্যাংশ সূদের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়তঃ জমাকৃত সম্পদ নিছাব পরিমাণ হ'লে যাকাত বের করা আবশ্যক। দরিদ্রতা এর জন্য বাঁধা নয়। অতএব আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ভরসা রেখে উক্ত টাকা ব্যাংক থেকে উঠিয়ে কোন হালাল ব্যবসা সম্ভব হ'লে নিজে করবে অথবা সেখানে বিনিয়োগ করবে।

প্রশ্ন (৩৮/২৩৮) : সূরা বাক্বারাহ ১৪৮ আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-নূরুল ইসলাম, নীলফামারী।

উত্তর : আয়াতটির অর্থ হ'ল, আর প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে পৃথক ক্বিবলা, যেদিকে তারা উপাসনাকালে মুখ করে থাকে। কাজেই দ্রুত সৎকর্ম সমূহের দিকে এগিয়ে যাও (অর্থাৎ কা'বামুখী হও)। যেখানেই তোমরা থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সকলকে সমবেত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে ১৬/১৭ মাস বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে ফিরে ছালাত আদায়ের পর বাক্বারাহ ১৪৪ ও ১৫০ আয়াতের মাধ্যমে তাঁকে পুনরায় কা'বা গৃহের দিকে মুখ করে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়। এতে ইহূদীরা বাহানা খুঁজে পায় এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুসলমানদের উদ্দেশ্যে নানাবিধ উপহাসমূলক কথাবার্তা বলতে থাকে। এর প্রতিবাদে অত্র আয়াত নাযিল হয়। যেখানে বলা হয়েছে যে, সকল দিকই আল্লাহ্র। তিনি স্বীয় বান্দাদের যেদিকে খুশী সেদিকে ফিরে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিতে পারেন। এতে ইহূদী বা অন্য কারো খুশী বা নাখুশীর কিছু নেই। কিন্তু ইহূদীরা অপপ্রচার করছিল যে, এই মানুষটি তার ধর্মের ব্যাপারে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। তাঁর ক্বিবলার কোন ঠিক নেই। তিনি ইবরাহীমী দ্বীনের অনুসারী বলে দাবী করেন। যদি বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে ক্বিবলা ইবরাহীমের দ্বীন হয়, তাহ'লে আবার কা'বার দিকে ক্বিবলা করা হ'ল কেন? মুনাফিকরাও একই কথা বলতে থাকে। অন্যদিকে কুরায়েশরা, যাদেরকে অত্র আয়াতে 'যালেম' বলা হয়েছে, তারা বলতে লাগল, মুহাম্মাদ আমাদের ক্বিবলার দিকে মুখ ফিরিয়েছে। এবার সে আমাদের দ্বীনে (?) ফিরে আসবে *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। অথচ তাদের এইসব কথার জওয়াব একটাই যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র হুকুমের তাবেদারী করেছেন। তাঁর হুকুমেই তিনি মদীনায় গিয়ে প্রথমে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে ছালাত আদায় করেছেন। অতঃপর তাঁর হুকুমেই তিনি কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। এখানে আল্লাহ্র আনুগত্যই মুখ্য। যা প্রকৃত ঈমানদারগণের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অত্র আয়াতে 'আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করে দেই' অর্থ ক্বিয়ামত পর্যন্ত কা'বা গৃহকে মুমিনদের জন্য ক্বিবলা নির্ধারণ করা। যাতে বান্দাকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারেন *(কুরতুবী, ঐ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (৩৯/২৩৯) : ইরানের বর্তমান সরকার সহ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ কোন্ দলভুক্ত শী'আ। তাদের আক্বীদা কি? তাদেরকে মুসলিম বলা যাবে কি?

-শরী'আতুল্লাহ, নড়াইল।

উত্তর : ইরানের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী সহ দেশটির সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বারো ইমামে বিশ্বাসী ইছনা 'আশারিয়া ইমামিয়া শী'আ। নিম্নে তাদের মৌলিক কিছু আক্বীদা তাদের কিতাবসমূহ থেকে বর্ণিত হ'ল।-

(১) তাদের ইমামগণ অতীত এবং ভবিষ্যতের যাবতীয় গায়েবের জ্ঞান রাখে *(কুলাইনী, আল-কাফী, হুজ্জাহ অধ্যায় ১/২০৩)*। (২) ইমামদেরকে চেনা ও মানা ফরয। ইমামদেরকে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফের। তাদের প্রতি রাসূলের আনুগত্যের ন্যায় আনুগত্য পোষণ করতে হবে *(আল-কাফী ১/১১০)*। এছাড়া ইমামগণ নবীগণের ন্যায় নিষ্পাপ ও তারা যে কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করার ক্ষমতা রাখেন *(ঐ, ২২১, ২৭৮ পৃঃ)*। তাদের নিকটে ফেরেশতা যাওয়া-আসা করেন *(ঐ, ১৩৫)*। (৩) আলী (রাঃ) সহ মাত্র কয়েকজন ছাহাবী ব্যতীত প্রথম তিন খলীফা সহ সকল

Contents

ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর কাফের হয়ে গেছেন *(ঐ, ৮/২৪৫)*। (৪) জিবরীল যে কুরআন নিয়ে এসেছিলেন তাতে ১৭ হাযার আয়াত ছিল *(ঐ, ২/৬৩৪)*। (৫) তাদের নিকটে 'মুছহাফে ফাতেমী' রয়েছে, যা কুরআনের চাইতে তিনগুণ বড় এবং তাতে কুরআনের একটি হরফও নেই *(ঐ, ১/২৩৯)*। (৬) সুন্নীরা জাহান্নামী, তারা কাফের, নাপাক, তাদের জানাযার ছালাত আদায় করা নাজায়েয, তাদের যবেহ করা পশু খাওয়া অবৈধ, তারা ব্যভিচারের সন্তান, তারা বানর এবং শূকর, তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব *(বিহারুল আনওয়ার ৮/৩৬৮-৩৭০, আল-কাফী ১/২৩৯, ৮/১৩৫)* (৭) ইমাম ও অলীদের মাযার যিয়ারত করা ফরয। যিয়ারত পরিত্যাগকারী কাফের *(কিতাবু কামালিয যিয়ারাহ ১৮৩ পৃঃ)*। (৮) হুসায়েন (রাঃ)-এর কবর যিয়ারত করা বিশ বার হজ্জ এবং ওমরাহ করার চেয়েও অধিক উত্তম *(ফুরূঊল কাফী ১/৩২৪)*। (৯) ইমাম মাহদী দাঊদ (আঃ)-এর পরিবারের বিধান অনুযায়ী পৃথিবী শাসন করবেন *(আল-কাফী ১/৩৯৭)* (১০) বর্তমান ইছনা 'আশারিয়া শী'আদের ইমাম ও ইরানী বিপ্লবের নেতা ইমাম খোমেনী বলেন, আমাদের ইমামদের মর্যাদা এত উচ্চস্তরের যে, আল্লাহ্র কোন নিকটবর্তী ফেরেশতা বা প্রেরিত নবী উক্ত মর্যাদায় পৌঁছতে পারেনি' *(আল-হুকূমাতুল ইসলামিয়াহ ৭৫ পৃঃ)*। এছাড়া তাঁর অদ্বৈতবাদী কুফরী দর্শনের পক্ষে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, আমাদের সাথে আল্লাহ্র বিশেষ অবস্থাসমূহ রয়েছে। তিনি আমরা এবং আমরা তিনি' *(শারহু দু'আইস সাহার ১০৩ পৃঃ)* ইত্যাদি।

আহলে সুন্নাত বিদ্বানগণ উপরোক্ত আক্বীদা পোষণকারীদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে একমত। যেমন-

(১) ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ছাহাবায়ে কেরামকে গালি দেয়, ইসলামে তার কোন অংশ নেই *(আবুবকর খাল্লাল, আস-সুন্নাহ ৩/৪৯৩)* **(২)** ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ) বলেন, আমি প্রবৃত্তিপূজারীদের মধ্যে এদের চাইতে মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী কাউকে দেখিনি' *(আবু হাতেম রাযী, আদাবুশ শাফেঈ ১৪৪ পৃঃ)* **(৩)** ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিঃ) বলেন, যারা আবুবকর, ওমর, আয়েশা (রাঃ) ও অন্যান্য ছাহাবীগণকে গালি দেয়, তারা ইসলামের উপর আছে বলে আমি মনে করি না *(আবুবকর খাল্লাল, আস-সুন্নাহ ৩/৪৯৩)* **(৪)** ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিঃ) বলেন, আমি জাহমী ও রাফেযী অথবা ইহূদী ও নাছারাদের পিছনে ছালাত আদায় করাকে পরোয়া করি না। তাদেরকে সালাম দেওয়া যাবে না, তাদের রোগীদের সেবা করা যাবে না, তাদের সাথে বিবাহ করা যাবে না, তাদের জানাযায় অংশগ্রহণ করা যাবে এবং তাদের যবেহকৃত পশু খাওয়া যাবে না *(খালকু আফ'আলিল ইবাদ ১২৫ পৃঃ)*। **(৫)** ৫ম শতকের স্পেনীয় মুজাদ্দিদ ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী (৩৮৪-৪৫৬ হিঃ) বলেন, কুরআন পরিবর্তনের দাবীদার রাফেযীরা মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়। মিথ্যা ও কুফরীর দিক দিয়ে এরা ইহূদী-নাছারাদের স্থলাভিষিক্ত *(কিতাবুল ফিছাল ২/২১৩)*। **(৬)** ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ) বলেন, যারা ধারণা করে কুরআনের মধ্যে কিছু আয়াতের কমতি রয়েছে বা গোপন করা হয়েছে... তাদের কুফরীর ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। যারা ধারণা করে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর কয়েকজন ব্যতীত সকল ছাহাবী মুরতাদ হয়ে গেছেন... তাদের কুফরীতেও কোন সন্দেহ নেই। বরং তাদের কুফরীর ব্যাপারে যারা সন্দেহ করে তারাও কাফের *(আছ-ছারেমুল মাসলূল ৫৮৬ পৃঃ)*। **(৭)** যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হিঃ) বলেন, যারা ছাহাবীগণকে নিন্দা করে এবং গালি দেয়, তারা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যায় এবং মুসলিম মিল্লাত থেকে খারিজ হয় *(কিতাবুল কাবায়ের ২৩৭ পৃঃ)*। **(৮)** মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (১১১৫-১২০৬ হিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ছাহাবীগণের সবাইকে 'ফাসেক' ও অধিকাংশকে 'মুরতাদ' হওয়ার আক্বীদা পোষণ করে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করে *(আর-রিসালাহ ফির রাদ্দি 'আলার রাফেযাহ ১৮ পৃঃ)*। **(৯)** আব্দুল আযীয দেহলভী (১১৫৯-১২৩৯ হিঃ) বলেন, আমি ইছনা 'আশারিয়াদের গ্রন্থসমূহ পাঠ করে নিশ্চিত হ'লাম যে, ইসলামে তাদের কোন অংশ নেই এবং তাদের কুফরী নিশ্চিত *(মুখতাছারুত তুহফাহ ইছনা 'আশারিয়া ৩০০ পৃঃ)*। **(১০)** আলবানী (১৩৩৩-১৪২০ হিঃ) বলেন, কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মতের বিরোধী হওয়ার কারণে খোমেনীর বক্তব্যসমূহ প্রকাশ্য কুফরী ও প্রকাশ্য শিরক। যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সাথে সেগুলি বা তার কিছু অংশ বর্ণনা করবে, সে ব্যক্তি মুশরিক ও কাফের। যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে সে একজন মুসলিম' *(বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ ড. নাছের বিন আব্দুল্লাহ, উছূলু মাযহাবিশ শী'আতিল ইছনা 'আশারিয়াহ)*।

প্রশ্ন (৪০/২৪০) : জনৈক ব্যক্তি জীবনে অনেক মানুষের টাকা বা অন্য কিছু চুরি করেছে। এখন সে অনুতপ্ত। কিন্তু এখন যদি সে যাদের জিনিস চুরি করেছে তাদের কাছে ক্ষমা চায়, তবে সমাজে বড় ফেৎনা দেখা দিবে। করা না করা অনেক চুরির অপবাদ তার উপর এসে পড়বে। এক্ষণে তার করণীয় কি?

-হাবীবুর রহমান, ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তর : এক্ষেত্রে করণীয় হ'ল, তাদের নিকটে ক্ষমা চাওয়া এবং সম্ভবপর চুরিকৃত জিনিস ফেরত দেওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি তার কোন ভাইয়ের সম্মান বা অন্য কোন বিষয়ে যুলুম করে থাকে, তাহ'লে সে যেন আজই তার সমাধা করে নেয়। সেদিন আসার আগে যেদিন তার কাছে কোন দীনার ও দিরহাম থাকবে না। সেদিন তার কোন সৎকর্ম থাকলে তা থেকে যুলুম পরিমাণ নিয়ে নেয়া হবে। আর সৎকর্ম না থাকলে মযলূমের পাপসমূহ থেকে নিয়ে উক্ত যালেমের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে' *(বুখারী হা/২৪৪৯, মিশকাত হা/৫১২৬)*। এর সাথে সাথে ফেৎনায় না পড়ার জন্য আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করবে। আল্লাহ তার মর্যাদা রক্ষা করবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ বলেন, 'যারা আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাদেরকে একটি পথ বের করে দেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হন' *(তালাক ২-৩)*।